বঙ্গবন্ধু

প্রজ্ঞা ॥ সততা ॥ দারিদ্র্য বিমোচন ভাবনা

মো. শওকত আকবর



বঙ্গবন্ধু : প্রজ্ঞা ॥ সততা ॥ দারিদ্র্য বিমোচন ভাবনা ■ মো. শওকত আকবর

Bangabandhu : Progga
Since 1987
4397301
Tk. 300.00

Northern University
NUB
Library
Bangladesh

ব ঙ্গ ব ন্ধু

প্রজ্ঞা ॥ সততা ॥ দারিদ্র্য বিমোচন ভাবনা

মো. শওকত আকবর

জাগৃতি প্রকাশনী

88-02-9669555
পাঠক সমাবেশ কেন্দ্র
Dhaka Bangladesh
Establish 2014
pathak@bol-online.com

জাতির জনককে জানুন
পাঠক সমাবেশ কেন্দ্র

NUB LIBRARY
ACCESSION NO. 98786
ACCESSION DATE
PROGRAM, CAMPUS

বঙ্গবন্ধু : প্রজ্ঞা ॥ সততা ॥ দারিদ্র্য বিমোচন ভাবনা
মো. শওকত আকবর

প্রথম প্রকাশ : ১৫ আগস্ট ২০১৩

প্রকাশক : ফয়সল আরেফিন দীপন
জাগৃতি প্রকাশনী
৩৩ আজিজ সুপার মার্কেট
নিচতলা, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০
আলাপন : ৮৬২৩২৩০

কার্যালয় : ৪২/এ আজিজ সুপার মার্কেট
২য় তলা, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০
আলাপন : ৮৬২৪২১৮

প্রচ্ছদ : তৌহিন হাসান

মুদ্রণ : দি ঢাকা প্রিন্টার্স
পান্থপথ, গ্রীনরোড, ঢাকা

মূল্য : **তিনশত টাকা**

ISBN : 978 984 8416 55 6

উ ৎ স র্গ

নির্ভীক আত্মত্যাগের মহিমায় মহিমান্বিত
সেই মহিয়সী বঙ্গমাতা
বেগম শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব-কে

প্র স ঙ্গ ক থা

বাঙালি জাতির পিতা ও স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি। বিবিসির জরিপে ঐতিহাসিক স্বীকৃতিই শুধু নয়, মহাকালের অভিধায় তুলনাহীন তাঁর স্থান। বাঙালি জাতিসত্তা বিনির্মানে, অধিকার আদায়ের সংগ্রামে, জাতি গঠনে, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় তিনি ছিলেন আপোষহীন; নিরবিচ্ছিন্ন সংগ্রামের ধারায় তাঁর অসাধারণ ভূমিকা সর্বজনবিদিত। তিনি বাঙালি জাতিকে প্রস্তুত করেছেন সার্বিকভাবে। বঙ্গবন্ধুর সারাজীবনের সাধনা ও সংগ্রামের লক্ষ্য ছিল বাংলাভাষাভাষীর অসাম্প্রদায়িক শ্রেণীবৈষম্যহীন একটি রাষ্ট্র গঠন করা; যে রাষ্ট্রে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব লোকেরই বাস করার শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় থাকবে। থাকবে না জোতদার, জমিদার, নিঃস্ব ভূমিহীন কৃষক, ধনী-দরিদ্রের ব্যাপক ব্যাবধান। দারিদ্র্যহীন সুখী সমৃদ্ধশালী সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে তিনি বাঙালি জাতিকে প্রস্তুত করেছেন দীর্ঘ সংগ্রামের সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে। ১৯৭০-এর নির্বাচনে সারাজীবন হৃদয়ে ধারণ করা স্বপ্ন ও রাজনৈতিক দর্শনের পক্ষে নিরংকুশ জনসমর্থন নিয়ে তিনি স্পষ্ট করেছেন তাঁর অবস্থান। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শন সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির রক্ত-মাংসে, অস্থি-মজ্জায় মিশে গেছে। ইস্পাত কঠিন মনোবল নিয়ে বাঙালি জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে। দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত রাজনৈতিক দর্শন বুকে ধারণ করে বাঙালি জাতি ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে প্রতিপক্ষ একটি সুশৃঙ্খল দক্ষ সেনাবাহিনীকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছে।

এই দীর্ঘদিনের সংগ্রামের পথচলায় নেতৃত্বদানে তাঁকে অনেক প্রতিযোগীতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। অনেক প্রবীন, উচ্চশিক্ষিত, বিত্তশালী নেতৃত্বের সাথে প্রতিযোগীতায় অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা এবং প্রজ্ঞার মাধ্যমে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সাফল্যের শীর্ষে আরোহণ করেছেন। এদেশের লেখক-গবেষকগণ বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের আলেখ্য নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন। আলোচনা করেছেন বঙ্গবন্ধু জীবনে প্রজ্ঞার মাধ্যমে

নিজেকে উপস্থাপন করে জনগনের মাঝে গ্রহণযোগ্য হওয়ার কৌশলগুলি। স্বাধীনতার পর দায়িত্ব গ্রহণ করে অত্যন্ত সততার সাথে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া শত বছরের দারিদ্র্য দূর করে সুখী সমৃদ্ধশীল সোনার বাংলা গঠন করার পদক্ষেপ নিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। বঙ্গবন্ধুর চিন্তা, চেতনা, প্রচেষ্টা এবং দারিদ্রবিমোচনের বিভিন্ন কর্মসূচী এবং পদক্ষেপগুলি স্বতন্ত্রভাবে বিশ্লেষণ করে নব প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা হয়েছে এই গ্রন্থে। লেখার শুরুতে কিছু বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে যা উক্ত বিষয়ের সাথে অনেকাংশেই সম্পর্কিত। তবে এ লেখার উপাদান মূলত দীর্ঘদিনের পুষে রাখা মনের কথার বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

গ্রন্থের শিরোনামটি নির্ধারণ করে দিয়েছেন শ্রদ্ধেয় গীতিকার ও গায়ক সিভিল সার্ভিসের মেধাবী কর্মকর্তা কমলেশ কুমার দাস। লেখাটি দ্রুত সম্পন্ন করার জন্যে বারবার তাগিদ দিয়ে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন ১৯৯০-এর গণআন্দোলনের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রনেতা শাহাবুদ্দিন ফরাজী। কম্পিউটার কম্পোজের বানান ত্রুটি সংশোধনে সহায়তা করেছেন স্নেহধন্য ছোটভাই তরুন ঔপন্যাসিক শরীফ উদ্দিন। প্রজ্ঞা, সততা এবং দারিদ্র্য বিমোচন ভাবনা বঙ্গবন্ধুর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ এ গুণ বিশ্লেষণ করে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উপাত্তের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে বইটিতে। অসাবধানতাবশত তথ্যবিভ্রাট বা ভুলত্রুটি হলে পরবর্তী সংস্করণে অবশ্যই সংশোধন করা হবে।

মো. শওকত আকবর
১.৮.২০১৩

সূ চি প ত্র

প্রজ্ঞা	১১
সততা	৯২
দারিদ্র্য বিমোচন ভাবনা	১০০

প্রজ্ঞা

গাহে গাহে বাজ খাঁ ইন কেস সায়ে-পারি না রা
জেন্দা খাহি দাস্তান গার দাগ হায়ে সিনারা

(অন্তরে জ্বালাকে যদি জাগিয়ে রাখতে চাও,
এই পুরাতন কাহিনী কখনও কখনও তাহলে পড়ো।)

কেবল কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য নয়, দ্বীন দুনিয়ার মঙ্গলের জন্য অতীত কালের কাহিনী শোনা এবং পড়ার আবশ্যকতা যেমন রয়েছে তেমনি অতীত কালের বিভিন্ন কাহিনী সৃষ্টির পেছনে যারা মেধা শ্রম প্রয়োগ করে অমর হয়ে আছেন, সেসকল মহানায়ক ও মহাপুরুষদের জীবনকাহিনী পড়া, শোনা, আলোচনা ও চর্চা করা আমাদের জন্য একান্ত প্রয়োজন। যাদের সৃষ্টি কালজয়ী হয়ে ইতিহাসের পাতায় গাঁথা হয়ে আছে তাদের ইতিহাস, তাদের কথা জানবার আগ্রহ সৃষ্টি হয় বেশি।

সমুদ্রের বাতিঘর (Light house) যেমন জাহাজিকে পথ দেখায়, তেমনি মহাপুরুষদের জীবনকাহিনীও মানুষকে তরঙ্গসঙ্কুল জীবন সমুদ্রে পথ দেখায়।" কথাগুলো লিখেছেন– বাংলা সাহিত্যের খ্যাতিমান লেখক, দার্শনিক, ব্যারিস্টার এস. ওয়াজেদ আলী।

তাঁর এ লেখা থেকে জ্ঞান-অন্বেষকদের অনেক কিছুই শেখার আছে, তা পাঠ করলে কেবল ভুক্তভোগীরাই অনুধাবন করতে পারবেন। এরকম সুখপাঠ্য বইকে অবহেলা করা কোনো সুপাঠকের জন্য মোটেই উচিত নয়।

এই ধরনের মহামনীষী তাদের কর্মকাণ্ড, শ্রম, মেধা, সাহস, জ্ঞান দিয়ে দান, অবদানের জন্য জনগণের মাঝে গ্রহণযোগ্য হয়ে আছেন। তাঁদের জীবনের কোনো অংশ নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নিরূপণ করে লেখা যেন-তেন লোকের জন্য খুবই দুরূহ কাজ, রীতিমতো দুঃসাধ্য। বিশেষ করে আজকের দিনে সমালোচকদের যে বৈশিষ্ট্য তাতে করে সাবধানে কলম ধরতে হয়। এইসব লেখার যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য

তথ্যউপাত্ত সংগ্রহে থাকতে হয়। তাদের এই দীর্ঘ জীবনে বহুমুখী জ্ঞানচর্চা ও সাধনার মাধ্যমে তারা অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। বিশিষ্টজনদের সাথে মেলামেশা করতে গিয়ে তাদের স্মৃতির ভাণ্ডারে অনেক ঘটনা, সফলতা-বিফলতার উপাদান সঞ্চিত হয়ে থাকে।

যদি তিনি নিজের জীবন সম্বন্ধে আত্মজীবনী লেখেন সেই ঢের ভালো। তাতে প্রকৃত তথ্য-উপাত্ত থাকে যা তিনি নিজে লিখেছেন ও বলেছেন। সেখানে দিন, তারিখ ও ঘটনাবলীর আপন বর্ণনা থাকে। সেখানে হয়তো কারও উপস্থিতি বা সাক্ষী থাকে। ঘটনা রঞ্জিত বা অতিরঞ্জিত করার জন্য যাবতীয় দায়-দায়িত্ব নিজের উপর পড়ে।

এ ধরনের লেখালেখি এদেশে হর-হামেশাই হচ্ছে। এমন অনেক লেখাই পাঠ করার সৌভাগ্য হয়েছে। এগুলো নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে, পর্যালোচনা হয়েছে, অলোচনা হয়েছে আবার সমালোচনাও যথেষ্ট হয়েছে। রীতিমতো সেগুলো বিতর্কিতও হয়েছে। দেখা যায়, বিশেষ করে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের জীবনী নিয়ে অনেক সমালোচনায় পড়তে হয়। রাজনীতিতে মতবাদগত অনেক পার্থক্য থাকে। সেই কারণে বিরোধী পক্ষ তাঁর অনেক ঘটনা, অবদান বা নিবেদনের অনেক কথা মেনে নিতে চায় না। বরং তাদের কাছ থেকে বিরূপ মন্তব্য শুনতে হয়। নেতিবাচক সমালোচনা শুরু হয় যা কোনভাবেই কাম্য নয়। কারণ সত্য কথা লিখতে খুব কম লোকেরই সাহস আছে, কিন্তু পরিবর্তনশীল সমাজে সহজে কেউ লিখে উদ্বিগ্ন ও চাপের মধ্যে থাকতে চান না। কারণ, কোনো মতবাদ, মতাদর্শ একসময় জনগণের কাছে অধিকতর গ্রহণযোগ্য হলেও সময়ের বিবর্তনে তার চাহিদা হ্রাস পেতে পারে। কারণ, কালের বিবর্তনে যুবক বা পাঠকদের কাছে তাদের অবদানের কথা ও বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের কথা ধীরে ধীরে বিবর্ণ হতে থাকে।

এমন লেখাই সুপাঠ্য ও সুখপাঠ্য যার আবেদন সর্বকালেই থাকে। যেমন– 'আনা ফ্রাঙ্কের ডায়েরী', দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের উপর একজন বালিকার স্মৃতি ও অভিজ্ঞতার কথা নিয়ে লেখা। অনেক মহৎ মনীষী, লেখক, রাজনৈতিক ব্যক্তির আত্মচরিত, আত্মজীবনী বিভিন্ন পর্যায়ে লিখে গেছেন। অনেক লেখা আজও সুপাঠ্য বলে পরিগণিত। এসব লেখা থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-উপাত্ত ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলী জানা যায়। অনেক লেখক আছেন নিজেকে ঠিক মতো তুলে ধরেন না বা ধরতে পারেন না। বরং সচেতনভাবে অনেককিছু এড়িয়ে যান। লেখেন অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে। মহান এক কবি লিখে গেছেন, "কবিরে পাবে না তাঁর জীবন চরিতে।"

বিষয়টা বেশ মুশকিলের! তাহলে কোথায় পাওয়া যাবে জীবনী বা জীবনের সফল বর্ণাঢ্যময় কথা? অগত্যা তাঁর সবকিছু অজানাই রয়ে যায়। উত্তর প্রজন্মের

কাছে অজ্ঞাতই থেকে যায়। তাহলে মনীষীদের জীবন পাঠে গঠনমূলক শিক্ষা পাবার আশায় গুড়েবালি। এমনিতেই নবপ্রজন্ম সাহিত্য, জীবনীগ্রন্থে খুব একটা আগ্রহবোধ করে না। এ ধরনের লেখা পাঠের ব্যাপারে তাদের বেশ অনীহা। কতিপয় অভিভাবকের বদৌলতে এবং ইংরেজী মাধ্যমে লেখাপড়ার জোয়ারে বাংলা ভাষা ও মাতৃভূমির আপন সংস্কৃতি ভেসে যাবার উপক্রম হয়েছে। ইংরেজি মাধ্যমের করালগ্রাসে পড়ে তারা মা-মাটি-মানুষের গন্ধ শুঁকতে ভুলে গেছে। তারা নিজের দেশ, কাল, মানুষ নিয়ে তেমন মাথা ঘামায় না এবং এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বুঝতেও চায় না। তাদের বাবা-মা ও পরিবারের অপরাপর সদস্য তাদেরকে এব্যাপারে তেমন উৎসাহও দেয় না। আর একারণেই হয়তো এব্যাপারে তাদের নাক সিটকানো মনোভাবই চোখে পড়ে। এ ব্যাপারে ব্যক্তির বিভিন্ন ভাবনা-চিন্তা থাকে। তবে ভারতীয় জাতীয় নেতা ব্যারিস্টার মহাত্মা গান্ধি লিখেছিলেন যে, "আমার জীবনীই আমার বাণী।"

তাঁর সমস্ত জীবনী পড়ে হয়তো বাণী পাওয়া যাবে। যা আজ দুষ্প্রাপ্য। কারণ, ইংরেজি মাধ্যমে পড়ুয়া নতুন প্রজন্ম শিক্ষনীয় গ্রন্থ পড়তে অনীহা প্রকাশ করে।

ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বদের মধ্যে যারা দেশ-কাল-পাত্রকে জয় করে রাষ্ট্রীয় ও রাষ্ট্রের গণ্ডি পেরিয়ে পৃথিবীর মহৎ ব্যক্তিদের ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছেন, তাদের কেউ হয়তো আত্মজীবনীতে জীবনের সফলতার দিকগুলিই লেখেন। শব্দের গাঁথুনির মাধুর্যময় ব্যঞ্জনা দিয়ে লেখনিকে সুখপাঠ্য করতে চান। জীবন কাহিনীকে বাংলা ভাষার রসময় প্রত্যয় দিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে লেখেন। তবুও সে রকম আনন্দ বা তৃপ্তি সকল প্রজন্মের পাঠকেরা পায় না। অন্যদিকে, বিশেষ করে যে রাজনৈতিক ব্যক্তি লেখালেখি করেন না তিনি নিজের ঘটনাবহুল জীবনকে এড়িয়ে যান যা আড়ালেই থেকে যায়। তাঁর ব্যর্থতা ও অপকর্মের কথা প্রকাশ না করে যতদিন পর্যন্ত ক্ষমতা, সম্মান, ভোগ-বিলাস, রাষ্ট্রের কাছ থেকে আদায় করা যায় ততদিনই তিনি মানুষের কাছে ভালো। যদি কখনও বা স্মৃতিচারণ করেনও তথাপি সত্যের চেয়ে অসত্যই সম্ভবত বলাবলি করেন বেশি।

নির্জলা মিথ্যা কখনো নাকি উদ্দেশ্যের কারণেই মহৎ হয়। তেমনি অনেক সময় সত্য কথাও উদ্দেশ্যের কারণে নীচ, হীন হয়ে যায়। এস. ওয়াজেদ আলীর 'জীবনের শিল্প' প্রবন্ধে তিনি এক বাদশাহ ও বন্দী এবং উজিরদের আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে লিখেছেন–

> "এক বাদশাহ নির্দোষ এক বন্দী ব্যক্তিকে হত্যা করার আদেশ দিলেন। বন্দী তার জীবন শেষ মনে করে রাজাকে গালি দিতে লাগল। বাদশাহ বন্দীর ভাষা বুঝেন না। তাই অনুচরদের জিজ্ঞেস করলেন, বন্দীর চিৎকারের কারণ কী? এক

মহামান্য উজির বাদশাহর প্রশ্ন শুনে বললেন, 'ও বেচারা বলছে, যারা ক্রোধকে দমন করেন তারাই মহামানব।' উজিরের কথা শুনে বাদশাহের মনে দয়ার উদয় হলো। তিনি লোকটাকে ক্ষমা করে দিলেন। বাদশাহের আর এক দুষ্ট উজির ছিলেন। তিনি আবার চুপ থাকতে না পেরে বললেন, 'হুজুর আমাদের মতো লোকদের বাদশাহর সামনে মিথ্যা বলা উচিৎ নয়। বন্দী হুজুরকে গালাগালি দিচ্ছে, নিন্দাবাদ করছে।' বাদশাহ বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তোমার সত্য কথার চেয়েও ওর মিথ্যা আমার কাছে প্রিয়। কারণ, ওর মিথ্যায় মহৎ উদ্দেশ্য আছে। আর তোমার সত্যের উদ্দেশ্য হলো নীচ, হীন।"

সবাই যে অসত্যের আশ্রয় নেয় ঠিক তা নয়। সত্য কথা বলার সাহসী আত্মজীবনীকার যে একেবারেই নেই, তা নয়। ব্যক্তি যখন খ্যাতির শীর্ষে আরোহন করেন, তখন তার জীবনের অনেক কিছুই পাঠকের কাছে আকর্ষণীয়, শিক্ষণীয়, এবং গ্রহণীয় হয়। আজকাল আকাশ সংস্কৃতির যুগে অনেক কিছুই আমরা দেখতে পারছি!

যে যুগে বাঙালি মুসলমানরা লেখাপড়ার সাথে পরিচিত খুব একটা ছিল না সে যুগে ব্যারিস্টার হয়েছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে প্রথম স্নাতক ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সে যুগে একজন বাঙালি মুসলমান লেখক মীর মোশারফ হোসেন প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে জীবিকার জন্য দেশময় ঘুরে বেড়িয়েছেন। কত বড় প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব মীর মোশারফ হোসেন যিনি সাহস করে কলম ধরেছিলেন, তাঁরই রচিত ধ্রুপদী সাহিত্য যা গদ্যে রচিত মহাকাব্য বলে পরিগণিত সেই 'বিষাদ সিন্ধু' একসময় অবিভক্ত বাংলায় বাঙালি মুসলমানদের কাছে পবিত্র কোরআন হাদিসের পরই ছিল গ্রহণযোগ্য ও অতি সম্মানের। তিনিও লিখে গেছেন খণ্ডিত আত্মচরিত। ঠিক আত্মচরিত নয়– অনেকটা দিনলিপি। ব্যক্তিগত জীবনের গোপন কথা হলেও সত্য বলতে পিছপা হননি। তিনি এভাবেই লিখেছেন–

"ঈশ্বর, আমি কোন কারণে অপারাধী নহি। আমার মনে কোন পাপ নাই। কোনরূপ কাহাকেও কিছু বলি নাই। সতীর মাতা আজ ছয় মাস যেরূপ ব্যবহার করিতেছে, মানুষের রক্ত-মাংসের শরীরে ওইরূপ কথার গঞ্জনা সহ্য করিতে পারে না। প্রতি কথায় আমার মনে কষ্ট দিয়া– যাহা মুখে আসে তাহাই বলিতেছে, গালাগালি দিতেছে। কলকাতায় আমাকে খরম জুতা দিয়া মারিতে উঠিয়াছিল। পত্রে কত গালাগাল দিয়াছে, তাহার শেষ নাই।"

চোখ বুঁজে কাল বা সময়ের কথা চিন্তা করলে বোধগম্য হবার কথা– কত কাল আগের লেখা! তখন মিডিয়ার এত উন্নতি ছিল না। তথাপি তিনি সত্য কথা লিখতে

পিছপা হননি। এত বড় একজন প্রতিভাবান লেখকের একান্ত পারিবারিক গোপন কথা যা সংসারে ঘটে থাকে, সে-সব খুঁটিনাটি বিষয় তুলে ধরে তিনি অত্যন্ত সাহসী সত্য বলার অগ্রপথিক হিসেবে পরিগণিত হয়েছেন। একশ' বছর আগেই ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন সেই বঙ্কিম-মধুসূদনের যুগে। একজন বাঙালি মুসলমানের বাংলা ভাষায় ইসলামের গৌরব গাঁথা ইতিহাস রচনা করেছেন। শুদ্ধ বাংলায় কাব্য আকারে তিনিই লিখেছেন– 'মদিনার গৌরব', 'মোসলেম বিরত্ব', 'ইসলামের জয়'।

এরকম অনেক গল্পই– মুসলমানদের গৌরবের, বিরত্ব গাঁথা ইতিহাস বাংলা ভাষায় লিখেছিলেন তিনি। অসমর্থিত সূত্রে জানা যায়, গোপনে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রও ওনার লেখা পড়েছিলেন এবং ইসলামের ইতিহাস সম্বন্ধে জানার চেষ্ট করেছিলেন। ইসলামের গৌরবগাঁথা ইতিহাস সম্বন্ধে এই অসাম্প্রদায়িক ধ্রুপদি লেখকের তেমন কোনো মর্যাদা আমরা দেই না। প্রতিভাহীন, অকর্মণ্য রাজনীতিকদের নিয়ে প্রচার মাধ্যমে অনেক বাড়াবাড়ি দেখা যায়। মাঝে মাঝে কিছু ব্যক্তির অজানা, অস্পষ্ট গুণের কথা হরহামেশাই বিভিন্ন মাধ্যম থেকে প্রচার করা হয়; তাদের জন্ম ও মৃত্যুদিবস পালন করা হয়।

মীর মোশারফ হোসেন বাংলা ভাষায় একজন সার্থক লেখক ছিলেন। তিনি বাংলা ভাষার শুদ্ধ সমর্থক ছিলেন। তিনি সাহসিকতার সাথে জমিদার, নবাব, আশরাফ মুসলমানদের চরিত্র তুলে ধরেছেন তাঁর লেখা 'জমিদার দর্পন' ও 'গাজীমিয়ার বস্তানি' গ্রন্থে।

মীর মোশারফ হোসেন তাঁর লেখনীর মাধ্যমে স্বীয় মেধা ও দক্ষতার স্বাক্ষর রাখেন। ব্যবহারিক শিক্ষা কম থাকা সত্ত্বেও মীর মোশারফ হোসেনের লেখনী শক্তি, শব্দের গাঁথুনি, শব্দচয়ন, ভাষাশৈলী, পাঠযোগ্য লেখা সেকেলে মুসলমানদের ভেতর একমাত্র তিনিই লিখেছেন। মুসলমানদের বিরত্বগাঁথা ইতিহাস বাংলায় লিখে ভারতবর্ষে বাংলা ভাষাকে চেনার সুযোগ করে দিয়েছেন। তাঁর মতো এরকম সত্য কথা বলার লেখকও খুঁজে পাওয়া ভার। বর্তমানে লেখকদের এজাতীয় লেখালেখির মধ্যে সুবিধাবাদিতার গন্ধ পাওয়া যায়।

আমাদের সামাজিক জীবনে, চালচলনে বিশেষ করে রাজনীতি, প্রশাসন ও দাপ্তরিক কাজ-কর্মে তিক্ত অভিজ্ঞতার প্রতিফলন হচ্ছে। তোষামোদী যেন একটা যোগ্যতার মাপকাঠি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তোষামোদ, তৈলমর্দন এখন বাঙালির স্বভাব, বৈশিষ্ট্য হয়ে গেছে। ব্যবসায়, রাজনীতি, অফিস-আদালতে, পারিবারিক জীবনে যাই হোক ব্যাপারটি শুধু আজকালকার নয়। বহু আগেই বাংলা সাহিত্যের খ্যাতনামা গদ্য লেখক, প্রাবন্ধিক, ব্যারিস্টার প্রমথনাথ চৌধুরী খুব ভেবেই 'মগজ ধোলাই' প্রবন্ধে লিখেছেন–

"অতি নিন্দা, অতি প্রশংসা উভয়ই জঘন্য। কারণ অতি ভক্তি শুধু সুরুচি এবং অভদ্রতাই নয় সত্যের সীমালংঘন করে যায়। এক কথায়– মিথ্যা উক্তি, অতি প্রশংসা, মিথ্যা কথা মানুষ এমনিই করে না। হয় ভয়ে না হয় স্বার্থ সিদ্ধির জন্য লোকে সত্যের অপলাপ করে। মিথ্যা কথা বলা বা চর্চা করলে উদ্দেশ্যবিহীন চর্চায় পরিণত হয় বা অভ্যাসে পরিণত হয়।"

তাহলে এপ্রজন্মের দোষ দিয়ে লাভ নেই। তবে ব্যাপারটি নিয়ে যতই রসনা সম্পৃক্ত আলোচনা করি না কেন আসলে এব্যাপারটি সম্পূর্ণ পঁচা, ক্ষতিকর সর্বোচ্চ নিন্দনীয় ব্যাপার। একে বর্জন করা একরকম বীরত্ব।

এভাবেই যদি আমরা বাঙালিরা কিছু জানতে চাই, শিখতে চাই, বুঝতে চাই, তাহলে কী করব? কী যে করব– সেটা আসলে বলা কঠিন। তবে ভদ্রোচিত শিক্ষিত জ্ঞানপিপাসুদের জন্য বা কিছু ভূক্তভোগীর জন্য লেখাপড়া চর্চা করা উচিত। সেটা আর যাই হোক তা বড় বড় মনীষীদের জীবনী থেকেই সম্ভব।

বিশেষ করে ব্যারিস্টার এস. ওয়াজেদ আলীর জ্ঞান নির্ভর তথ্যভিত্তিক লেখা খুবই সুখপাঠ্য বলে আমার কাছে মনে হয়। এ যুগে মহামানবদের জীবনী জানা অনেকটাই দুষ্প্রাপ্য। তবে নিজের চিন্তা-ভাবনা ও মনের তাগিদ থেকে বিদ্যাভ্যাসের মাধ্যমে মানসিক শক্তির ওপর ভর করে মহামানবদের সন্ধান পেতে পারি। এজন্য কাউকে-না-কাউকে এগিয়ে আসতে তো হবেই।

প্রকৃতপক্ষে যদি গুণবান হন তাহলেই তো কদর দেখাতেই হবে। গুণবান ব্যক্তির গুণের কদর না করলে, কাজকর্মে পটু কারিগরের শ্রম ও মেধার ফসল মেলে না ধরলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গঠনমূলক কাজ করতে উৎসাহিত হবে না। গুণের কদর না করলে গুণী লোকের সম্মান জানানো হয় না। একজন মানুষ একটি জাতি বা গোষ্ঠীর জন্য বিশেষ অবদানের ছাপ রাখেন। অবহেলিত জাতির জন্য দীর্ঘ লড়াই, আন্দোলন ও সংগ্রামের মাধ্যমে জাতিকে সংগঠিত করে একটি বিশেষ স্থানে নিয়ে যান।

বিশেষ ব্যক্তির বেলায় স্বীয় দৃষ্টিকোণ থেকে যা ভাবা হয়, লেখার ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়, ইতিবাচক দৃষ্টিতে, যা সত্য তাই প্রাধান্য দিয়ে লেখা যায়। এই দৃষ্টিভঙ্গি আমার বেলায় ভিন্ন হতে পারে। যেখানে মানুষের শিক্ষা, রুচি, যোগ্যতা, শারীরিক মাপকাঠি, রূপ ও আকৃতি, রং, ক্ষমতা এবং সর্বোপারি নিজেকে জানার ভিন্নতা রয়েছে সেখানে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য থাকতেই পারে। স্বাভাবিকভাবে বিধাতা ষোলো আনা পূর্ণতা দিয়ে গঠন করে কাউকেই পৃথিবীতে পাঠাননি। সেটা হলো মেধা, মনন ও চিন্তা করার ক্ষমতা। তা সবার সমান না। এজন্য একেকজনের চিন্তা-চেতনা, ভাবনা ভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক।

বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন অবশ্য এব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করেননি। যদিও তিনি শুধুমাত্র বিজ্ঞান গবেষণা করেই বিখ্যাত হয়েছেন, শেষ বয়সে সামাজিক শান্তি ও বিশ্বশান্তি নিয়ে কাজ করেছেন। তিনি নির্লোভ মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। তাকে নবগঠিত ইসরাঈল রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হওয়ার অনুরোধ করা হয়েছিল। তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। বলেছিলেন, "আমি এর উপযুক্ত নই।"

তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ বৈজ্ঞানিক অন্তর্দৃষ্টি ও মানুষজনের দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্নমুখীতা দিয়ে এভাবে বিশ্লেষণ করেছেন–

"একেকরূপে কল্পিত কয়টি ঘটনা যখন দু'জন পর্যবেক্ষক অনুভব করেন তখন তাদের অনুভূতির কিছু মিল থাকে। আবার কিছু অমিলও থাকে। দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনে এ পার্থক্য ঢাকা যায়। কারণ বাস্তব দৃষ্টিতে সর্বক্ষেত্রেই এ পার্থক্য গুরুত্বহীন, কিন্তু পদার্থ বিদ্যা এবং মনস্তত্ব তাদের নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গির থেকে একটি ঘটনা সম্পর্কে একের অনুভূতির সঙ্গে অপরের অনুভূতির পার্থক্যের উপর জোর দিতে বাধ্য করে। কারণ, পর্যবেক্ষকদের মস্তিষ্কের পার্থক্য, খানিকটা যৌক্তিক পরিস্থিতির পার্থক্য।"

একজন বিজ্ঞানীর গভীর তথ্যানুসন্ধান, পরীক্ষিত বাণী, যাদের গবেষণা বা আবিষ্কারের আজও কোনো কূল-কিনারা করা যায়নি, তাঁরা মেধা ও জ্ঞানের বিশালত্বের জন্যে ইতিহাসে স্মরণীয় বরণীয় হয়ে আছেন। এরাই তো আদর্শের মূর্ত প্রতীক। সেজন্যই তো এইসব জ্ঞানী মনীষীর বাণী ও তত্ত্ব নিয়ে চিন্তা করে এগুতে হবে। ওনাদের চিন্তা-ভাবনায় যা-ই ধরা পড়ে তাই আমাদের পাঠ ও জ্ঞান আহরণের খোরাক। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো একটি ঘটনা বা একজন মানুষের জীবনের কর্মকাণ্ড পর্যালোচনায় যখন দু'জন বা ততোধিক পর্যবেক্ষক থাকেন তখন সেখানে মিল ও অমিল উভয়ই থাকা স্বাভাবিক।

এ জন্যই বিশেষ করে ব্যক্তির বেলায় ব্যক্তির জীবন এবং তার কর্মকাণ্ড মানুষের মনে লেখকের ইতিবাচক বা নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করে।

দেশে অহরহ আত্মজীবনী লেখা হচ্ছে। কেউ বিখ্যাত হোক বা অখ্যাত হোক, অর্থের জোরে হোক কিংবা কলমের জোরে হোক, যেনতেন লোকের জীবনী বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন অবদানের ভাগ ভাগ কৃতিত্ব বর্ণনা করে কয়েক খণ্ডে লেখা হচ্ছে। সে সমস্ত লেখা অনেকটা মুক্তিযুদ্ধকে সমালোচনা করে বা স্বাধীনতা যুদ্ধে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে। কিভাবে কাল্পনিক তথ্য দিয়ে কল্পকাহিনী লিখে বাজারে প্রাধান্য বিস্তার করা যায় তারই অপচেষ্টা চলছে। বিভিন্ন পেশার লোক প্রকাশক, প্রকাশনা,

সংবাদপত্র ও মিডিয়ার বদৌলতে নিজেকে তুলে ধরতে চান, লেখক সাজতে চান, সর্বোপরি বুদ্ধিজীবী সাজতে চান। তবে অরাজনৈতিক ব্যক্তির মধ্যে আকাঙ্ক্ষা থাকলেও তাতে কারও দৃষ্টি পড়ে না। কারণ সেখানে তেমন কোনো প্রতিপক্ষ নেই।

বিশেষ করে রাজনৈতিক ব্যক্তির বেলায় তো কথাই নেই। লেখক, অভিনেতা, খেলোয়ারড় গায়ক, চিত্রকর, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী অথবা সমাজকর্মী, মানব কল্যাণী, দরদি, দানবীর, এই ধরনের ব্যক্তিদের বেলায় অত অমিল থাকে না। অমিল থাকে রাজনৈতিক নেতাদের জীবনীর ক্ষেত্রে।

কারণ, রাজনীতিবিদদের জীবন বড় নদীর গতির মতো। একেকবার একেক দিকে মোড় নেয়। এটা কোনো সোজা সরল পথ নয়। রাজনীতিতে সোজা কোন রাজপথ নেই। আজকাল জানা যায়, অর্থনীতির রাজপথ নেই, অংকের রাজপথ নেই। নোবেল বিজয়ী ড. অমর্ত্য সেনের 'উন্নয়ন ও সক্ষমতা' গ্রন্থের ৯০ পৃষ্ঠায় দেখতে পাই–

> "কথিত আছে ইউক্লিড, টলেমিকে বলেছিলেন, 'জ্যামিতির কোন রাজপথ নেই।' তেমনই অর্থনৈতিক বা সামাজিক কর্মপন্থার মূল্যায়নের কোন রাজপথ নেই। নানা রকমভাবে বিভিন্ন বিষয়ে মনোনিবেশ করার দরকার বোধ হয় এবং ঐসবের সম্বন্ধে সচেতন থেকেই মূল্যায়ন করতে হবে। মূল্যায়ন সম্পর্কে বিভিন্ন উপায় নিয়ে যে বিতর্ক উত্থাপিত হয় সেগুলো আমাদের চিন্তার মর্মস্থলে কিরূপে অগ্রাধিকার পাবে তার সিদ্ধান্তে আসতে সাহায্য করে।"

তিনি হয়তো রাজনীতির ব্যাখ্যা দেননি। আমার দৃষ্টিতে জ্যামিতি বলি বা অর্থনীতিই বলি, সামাজিক বিজ্ঞানের কথাই এদের চেয়ে এখন বেশি সত্য হয়ে আমাদের সামনে উদ্ভাসিত। আমাদের সবকিছুর মতো রাজনীতিরও কোনো রাজপথ নেই। এমনকি আলোচনা-সমালোচনার কোনো রাজপথ নেই। বিভিন্নজন বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে কলম ধরেছেন। সুতরাং বিশেষ কোনো পথ দিয়ে এসব লেখার রস সংগ্রহ করার কোনো তথ্য নেই। রাজপথ নেই, আছে বাঁকা সরু পথ– যা দিয়ে সবাই পাড়ি দিতে পারে না। রাজনীতির পথ সর্বদাই কণ্টকাকীর্ণ। রাজনীতির ব্যাপারে একটা প্রবাদ আছে– "রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু নেই।"

রাজনীতির পথ সোজা-সরল নয়। খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। কাব্যের ভাষায়, "রাজনীতির পথ খুবই কণ্টকাকীর্ণ; কুসুমাস্তীর্ণ নয়।" তেমনি রাজনীতির কথা লিখতে গেলেও সতর্কতার সাথে লিখতে হয়। রাজনীতিবিদদের কর্মকাণ্ড এবং জীবনের কথা লিখতে গেলেও মনে হবে এ রাস্তা আরও কঠিন। যার জন্য নিজের জীবনের কথা নিজে লিখলেই বোধ হয় ভালো। অনেকে নিজের আত্মকথা লিখতে

গিয়ে এমন লেখার অবতারণা করেন যা তার অনুসারীদের বা সমর্থকদের প্রশংসার শ্লোগান সৃষ্টি করে আত্মপ্রশংসা বেশি হয়ে যায়। হয়তো কৌশলে লেখাগুলো অতি প্রশংসার খোরাক হয়ে যায় যা পরবর্তীতে শুধুমাত্র অনুসারীদের পাঠযোগ্য হয়ে থাকে। এর বেশি বেশি প্রয়োগের ফলে নতুন প্রজন্ম কিছু গঠনমূলক তথ্য থেকে বঞ্চিত হয়। এটা অনেকটাই অশোভনীয়। এব্যাপারটি অনেক আগেই বুঝেছিলেন পারস্যের কবি শেখ সাদী। সংক্ষিপ্ত কবিতায় বিশাল ভাব ফুটিয়ে তুলেছিলেন–

সানা-এ- সুদ, বুদ গুফতাম
না-জেবাদ-মর্দ-এ-দান্নারা
চুন জান- পিস্তান-এ-খুদ-মালাদ-
কুজা-লাজ্জাত শাভাদ-বা-কী?

(জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য কিছুই শোভনীয় নয়
যদি তিনি নিজ মুখে নিজের প্রশংসা করেন।)

বহু বছর পূর্বের এই স্বর্ণবাণী যেন মনে হয় বাঙালিদের জন্যই লেখা হয়েছিল। না হলে এমন যুৎসই কথাখানি তিনি এত স্পষ্ট করে কিভাবে কবিতায় উল্লেখ করেছিলেন? বাঙালিদের চরিত্রে যে এমনটি হবে তা যেন তিনি জানতেন। যাই হোক, জ্ঞানী মনীষীদের জ্ঞান বহুমাত্রিক হতে পারে। তবে এদেশের লেখক ও রাজনীতিকদের ক'জনইবা এত তাত্ত্বিক কাব্যকথার ধার ধারে? ক'জনইবা নিজেকে অধম ভেবে তত্ত্ব ও তথ্যকে উত্তম ভাবতে পারে?

আমাদের এই জগৎসংসারে কত রকমের, কত বৈশিষ্ট্যের মানুষ বিধাতা সৃষ্টি করেছেন। সবকিছুর মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য– সবাই আমাকে মান্য করুক, সম্মান করুক, সালাম করুক, ভয় করুক। মানুষের অদ্ভুত সব চাওয়া! আমার কর্মকাণ্ড ও সিদ্ধান্তকে সবাই সমর্থন করুক। সালাম এবং ভয় উভয়ই যেন মানুষের কাছে প্রচার করা হয়। এর মাধ্যমে নিজেকে যেন আরও গৌরবান্বিত করা হয়। এ এক মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধি আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে ইদানিং প্রবেশ করছে।

আমিত্ব থেকেই আসে নিজের সম্বন্ধে অন্ধত্ব ও অপরকে গৌণ ভাবার মানসিকতা। এই আমিত্বের বিস্তৃতি বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে যায়। নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করার জন্য যে কৌশল বা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়– তাও অনেক সময় অমানবিক। নিজেকে নায়ক ভাবার, গডফাদার হওয়ার মনোবৃত্তিই সকল অপকর্মের মূল উৎস। বিভিন্ন সরকারের আমলে ক্ষমতাবান নেতৃবৃন্দদের মধ্যে এমন অপকর্ম করতে বেশি দেখা যায়। এ দিকটা খেয়াল রেখে, মাথায় রেখে বলা যায় বাংলা

সাহিত্যের কালজয়ী লেখক মীর মোশারফ হোসেনের মতো এত সাহসী ব্যক্তি আর যাই হোক, রাজনীতিবিদদের মধ্যে নেই। একসময় হয়তো ছিল। তখন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রতি সম্মান দেখাতো সবাই। কারণ তাদের মধ্যে ছিল সততা, মানবিকতা, মেধা ও দক্ষতার এক অপূর্ব সংমিশ্রণ। এসব কিছুর সমন্বয়ে একজন প্রকৃত মানুষ জনগণের নেতায় পরিণত হন।

সময়ের প্রবাহে সমাজে পরিবর্তনের সাথে সাথে ক্ষমতার মসনদে বসার সাধ অনেকেরই হতে লাগলো। ধনাঢ্য শিল্পপতি, অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মকর্তা তথা পেশাদার সন্ত্রাসীও এখন রাজনৈতিক দলে ঢুকে পড়েছে। এই কারণে দলের ভেতর চাটুকার তোষামোদকারীদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই দিক থেকে বুদ্ধিজীবী লেখকরাও সে দোষে দোষী। অর্থলিপ্সা যার জন্য অনর্থ হয়ে দেখা দেয়, অর্থের বিনিময়ে প্রশংসা করে লেখার মান ছোট করা ছাড়া সে আর কিছুই করতে পারে না।

মানুষ মাত্রই ভুল হতে পারে। তবে সে ভুল যেন সমাজ তথা দেশের জন্য ক্ষতির কারণ না হয়। বিশেষ করে দায়িত্বশীল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের ভুলের কারণে একটি জাতি ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। সে জাতিকে আবার মাথা তুলে দাঁড়াবার জন্য অন্তত একটি শতাব্দী অপেক্ষা করতে হয়। হয়তো তারচেয়েও বেশি।

পৃথিবীতে অনেক বড় বড় জাতি আছে। এই জাতি বা গোষ্ঠীর হাজার বছরের ঐতিহ্য ও ইতিহাস আছে। ফরাসীদের জন্য ফ্রান্স, রুশদের জন্য রাশিয়া, স্পেনিশদের জন্য স্পেন, ইংরেজ জাতির জন্য ইংল্যান্ড। এই হচ্ছে ইউরোপের কথা। তাছাড়া এশীয়, জাপানিজ, চৈনিক, আরব জাতি, তেমনি উপমহাদেশে মারাঠি, পাঞ্জাবী, বিহারী, সিন্ধি, বালুচ এবং বাঙালি। এ বাঙালি জাতির জন্য একটি বিশাল সমতল ভূমি, নদীমাতৃক বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত সবই আছে। ছিল না ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্র। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ভারতবর্ষের ভৌগলিক আয়তনের মধ্যে হাজার হাজার বছর ধরে বিভিন্ন ভাষার সংস্কৃতির জাতি বাস করছে। তামিল, মারাঠী, পাঞ্জাবী, তেলেগু, উড়িয়া সহ বহু জাতি।

এখন বাংলাদেশের বাঙালিরা প্রকৃত বাঙালি জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। বাঙালি জাতীয়তার স্বকীয়তা বজায় রাখছে বাংলাদেশের জনগণ। বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব প্রয়াত কবির চৌধুরীর মতে, "আমরা তর্কাতীত বাঙালি। এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে, ভারতবর্ষের পশ্চিম বাংলার লোকও বাঙালি। তারাও বাঙালি, তবে ভারত বর্ষের বাঙালি। আমরা বাংলাদেশের বাঙালি। আমাদের বাঙালিত্বের সংগে তাদের বাঙালিত্বের একটা পার্থক্য আছে।"

স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠন করে বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশকে প্রকৃত বাঙালিদের জন্মভূমি হিসেবে চিহ্নিত করা হলো। হাজার বছরের সমৃদ্ধ বাঙালি জাতি বিশ্বের বুকে বিভিন্ন কারণে পরিচিত ছিল। মোঘলদের শাসন এবং খাজনা আদায়ের সুবিধার্থে বাংলা অঞ্চলের জন্য বাংলা সন আবিষ্কার করে প্রচলন করতে বাধ্য হলো। বাংলা সন প্রবর্তন করে বাঙালি জাতির অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন মোঘল সম্রাট আকবর।

পৃথিবীর মানচিত্রে ঐতিহ্যবাহী অনেক জাতির ইতিহাস রয়েছে, সেই সঙ্গে রয়েছে স্বাধীন দেশ। যেমন– ফরাসি, ইংরেজ, জার্মান, রুশ, চৈনিক, আরব। তেমনি ভারতের বাঙালি জাতির ইতিহাস-ঐতিহ্য থাকলেও ছিল না স্বতন্ত্র মানচিত্র। এই বাঙালি জাতির জন্য একটি বাংলা ভাষাভাষী একটি অসাম্প্রদায়িক, আধুনিক, সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্র গঠন করার ধ্যান-ধারনা হৃদয়ে পুষেছিলেন একজন মহামানব। ইতিহাসের গতিপথ ধরে লেখক ও গবেষক ব্যারিস্টার এস. ওয়াজেদ আলি ১৯৪৩ সনে 'ভবিষ্যতের বাঙালি' প্রবন্ধেই ভবিষ্যতে একজন মহামানবের আগমন এবং বাঙালিদের ভেতর থেকেই জাতিকে সংগঠিত করে বিশ্বে খ্যাতিমান ও গৌরবের অধিকারী হবার ইঙ্গিত দিয়ে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। গঙ্গাবিধৌত প্রমত্ত পদ্মা, মেঘনা এবং যমুনার মতো মধুমতি নদীর কোল ঘেঁষে এক অজো পাড়াগাঁয়ে এক শিশু জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শৈশব, কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে যিনি এস. ওয়াজেদ আলির মহাবাণী বাস্তবায়নে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন, যার কণ্ঠে প্রমত্ত পদ্মার বুকে অশান্ত তরঙ্গ সৃষ্টি হয়েছিল, বিশ্বের নিপীড়িত-নির্যাতিত মানুষের আর্তনাদ ফুটে উঠেছিল তিনি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। যৌবনকাল থেকে বিভিন্ন দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কারণে স্পষ্টতই একটি সিদ্ধান্তে এসেছিলেন একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করার– বাঙালিদের জন্য দেশ হবে 'বাংলাদেশ'। লেখার প্রথমেই যে, বড় মানুষদের জীবনী পড়া, জানা বা গবেষণা করার শিক্ষা পেয়েছিলাম তারই অবতারণা করার চেষ্টা করছি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা, জ্ঞান-প্রজ্ঞার মাধ্যমে তৎকালীন পাকিস্তানের পূর্ব ভূখণ্ডের সারা বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সেই সাথে বাঙালিদের জন্য সম্ভব করেছিলেন 'বাংলাদেশ' নামক একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম, অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র গঠন করার। তাঁর নেতৃত্বে বাঙালি মুসলমানরা বাংলাদেশ গঠন করলেন। তাদের সাথে ছিল বাংলাদেশের হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর কিছু অংশের দৃঢ় সমর্থন ও প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ। অর্থাৎ, সকল ধর্মের সকল সম্প্রদায় মিলে একটি ভাষাভিত্তিক জাতি

হিসাবে নতুনভাবে নতুন চেতনা নিয়ে আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন রাষ্ট্র জন্ম দিতে সক্ষম হলো।

অতীতে যাই হোক, যে যাই করুক, যত অবদানই থাকুক– কালের বিচারে এখন বাঙালি জাতিকে পূর্ণাঙ্গ জাতিতে পরিণত করার জন্য যা যা প্রয়োজন, বাঙালি মুসলমানরা কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি, এবং শিক্ষা ও মেধা দিয়ে সে সব প্রয়োজন মিটিয়েছেন।

এই বাঙালি জাতির গৌরবের অধিকারী বাংলাদেশের মুসলমান বাঙালি। এরাই সারা বিশ্বে বাঙালিদের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার চেষ্টা করে। আর তা করার সুযোগ হয়েছে একজন অবিসংবাদিত নেতার বহুবছর সংগ্রামের ফসল হিসেবে। এই বাংলায় যদি যাদুকরের হাতের যাদুর কাঠির ছোঁয়ায় কোনো ছবি ইতিহাস পটে ভেসে আসে তা হলো হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, সমাজ সংস্কারক, বাংলাদেশ নামের বাংলা ভাষার রাষ্ট্রের স্থপতি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

তিনি বাংলা ভাষাভাষী সংস্কৃতির একটি অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছেন এবং বাঙালিদের দেখাতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি অনেক লড়াই সংগ্রামের মাধ্যমে জাতিকে প্রস্তুত করেছেন। পর্যায়ক্রমে জীবনের ধাপে ধাপে দীর্ঘ লড়াই আন্দোলন সংগ্রামের পথ ধরে নির্বাচনে বিপুল বিজয় অর্জন করেন এবং জনপ্রিয়তার শীর্ষে আরোহন করেন। অনেক বাধা-বিপত্তি, জেল-জুলুম-নির্যাতন অতিক্রম করে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে বাঙালিরা, তাঁর আদর্শের সৈনিকরা রক্ত দিয়ে যুদ্ধ করে দেশকে স্বাধীন করেছে তথাকথিত পাকিস্তানের দক্ষ-সুশৃঙ্খল একটি সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে। শুধু ভারতবর্ষের দুই বাঙালিই নয় সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এমন একজন বিপ্লবী নেতা না হলে আমাদের স্বাধীনতার পথ স্বল্প সময়ে সুন্দরভাবে পাড়ি দেওয়া সম্ভব হতো না। এ পথ পাড়ি দিতে গিয়ে হয়তো হতাশ হয়ে যেত, মনোবল হারিয়ে ফেলত এবং একসময় হয়তো সংগ্রামের পথ ছেড়ে দিতেন। কিন্তু শুধুমাত্র এক মুজিবের যাদুকরী ভাষণ শুনে এ জাতি মোহাবিষ্ট হয়ে পড়ে। তারা সবাই একযোগে জেগে উঠে, সম্মিলিতভাবে উজ্জীবিত হয়ে প্রলয়ঙ্করী ঝড়ের বিপরীতে যুদ্ধ করে স্বাধীনতাকে ছিনিয়ে আনে অসংখ্য তাজা প্রাণের রক্তের বিনিময়ে।

নির্যাতিত হয়েও শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক, মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বাঙালি জাতির আকাঙ্ক্ষার যে স্থাপনা সৃষ্টি করতে পারেননি, এগিয়ে যাবার যে পথ দেখাতে পারেননি, সে পথ দেখিয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সে পথ কন্টকাকীর্ণ হলেও তিনিই

একমাত্র বাঙালি যিনি এই দুর্গম পথকে কুসুমাস্তীর্ণ করে দিয়েছেন নিজ মেধা, প্রজ্ঞা, বুদ্ধিমত্তা, সাহস ও শক্তির দ্বারা।

যাই হোক, প্রজ্ঞার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে বেশিদূর যাওয়ার আবশ্যকতা বোধহয় আর নেই। কারণ প্রজ্ঞার মাধ্যমে জ্ঞানের সন্ধান পাওয়া যায়। মানবাত্মায় দেহের গতির কারণ, মানব প্রজ্ঞার বসতি। ভাব, ইন্দ্রিয় উভয় জগতের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ। মানবাত্মাকে দুই অংশে বিভক্ত করা হয়। এর এক অংশকে দু'ভাগে পূর্ণ বিভক্ত করা হয়। (আত্মার সর্বোচ্চ অংশ প্রজ্ঞা– ভাবকে উপলব্ধি করে প্রজ্ঞা সরল ও অবিভাজ্য, অক্ষয় ও অবিনশ্বর। গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর সমগ্র ভাব দর্শন থেকে শুধু একটি কথাই প্রতীয়মান হয় যে, মানব অভিজ্ঞতার দুটি দিক রয়েছে। এর একটি ইন্দ্রিয় অনুভূতি এবং অপরটি প্রজ্ঞা। ইন্দ্রিয় অনুভূতির জন্য ইন্দ্রিয় জগৎ এবং প্রজ্ঞার জন্য ভাব জগৎ।) প্রজ্ঞা ও বোধ, বুদ্ধিগ্রাহ্য জগতের দুইটি অংশ। এদের মধ্যে প্রজ্ঞা উচ্চ মানের। এর লক্ষ্যবস্তু বিশুদ্ধ প্রত্যয় বা আকর। প্রজ্ঞার মাধ্যমে প্রত্যয় ও আকর বিষয়ক যে জ্ঞান পাওয়া যায় তাই যথার্থ জ্ঞান। প্লেটোর মতে, প্রজ্ঞাই যথার্থ ও সুনিশ্চিত জ্ঞানের উৎস ও আকর। প্রজ্ঞার এই সংক্ষিপ্ত তাত্ত্বিক বিশ্লেষণেই বোধগম্য হয় যে, প্রজ্ঞা এবং জ্ঞানের অবস্থান সাংঘর্ষিক নয়।

জ্ঞানের আধার বুদ্ধির চর্চা ও প্রকৃতির প্রতিফলন ঘটিয়ে একজন ব্যক্তি প্রকৃত প্রতিভাবান মহামানবে পরিণত হন। তেমনি একজন নেতা পরিপূর্ণতা পান ও পূর্ণতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন প্রজ্ঞার মাধ্যমে। আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি বা পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক প্রজ্ঞাকেই যথার্থভাবে তুলে ধরেছেন।

১৯৭১ সালের ৭ জুলাই লন্ডনের ডেইলি টেলিগ্রাফ পত্রিকায় 'পাকিস্তানের একমাত্র উপায়' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে লেখা হয়–

> "পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর অত্যাচারের কোন ভবিষ্যৎ নেই। মুক্তিযোদ্ধারা ক্রমশই বাড়ছে। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি জানাতে বিলেতের প্রেস ক্রমশই পাকিস্তানের সামরিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সমালোচনা মুখর হয়ে উঠছে। ইয়াহিয়ার ভুল-ত্রুটি এবং পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতাদের অন্ধত্ব পাকিস্তানকে গভীর খাদের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তা থেকে রক্ষা করতে পারেন একমাত্র শেখ মুজিবুর রাহমান। তাকে বন্দীশালা থেকে মুক্তি এবং তাকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করতে দিলে তিনিই কেবল শান্তিপূর্ণ অবস্থা সৃষ্টি করতে পারেন। ঐ নেতার প্রজ্ঞা তাঁর রাজনৈতিক বিরোধীদের পথ দেখাতে পারে।"

আন্তর্জাতিক একটি সংবাদ সংস্থা '৭১-এর বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের জন্য সমাধানের পথ দেখিয়ে দিলেন। একমাত্র শেখ মুজিবুর রহমানকে দেশে

প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে রাজনৈতিক সংকটের সমাধান সম্ভব বলে তারা বিচার করলেন। রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, সাহস, অমিত বিক্রম ও তেজ যে বাঙালির তিনি হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। স্বাধীনতাকামী, নির্যাতিত-নিপীড়িত, শোষিত, বঞ্চিত মানুষের একমাত্র নেতা এবং বিশ্বের বুকে আলোচিত ব্যক্তিত্ব হিসেবে তখন বিশ্বের সচেতন মানুষ মাত্রই ওনাকে স্বীকার করে নিলেন। সংবাদপত্র, সাংবাদিকতা– এদের বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ থাকে গভীর দৃষ্টিসম্পন্ন এবং খুবই নির্ভরযোগ্য। সে আলোকেই তারা সূক্ষ্মভাবে বঙ্গবন্ধুকে সঠিকভাবে পরিমাপ করতে সক্ষম হলেন।

দীর্ঘ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে ধাপে ধাপে তিনি এগিয়ে গেছেন। প্রতি মুহূর্তে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে দলকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। সর্বোপরি নিজেকে জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য করে নেতার অবস্থান সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন।

আন্তর্জাতিক মানের সংবাদ মাধ্যম– পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাস, ক্ষমতার পরিবর্তন, বিশেষ করে ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত রাজনৈতিক উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে সময় অতিক্রান্ত হয়েছে তা খুবই সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। ব্যক্তির কর্মকাণ্ড সফলতা-বিফলতা, যোগ্যতা সর্বোপরি অনেক ব্যক্তিও সময় বিশ্লেষণ করে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন সংগ্রাম, জেল-জুলুম, নির্বাচন, মন্ত্রিত্ব, ধাপে ধাপে বিচার করে একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে মন্তব্য প্রদান করেছেন।

সুতরাং বক্তব্যটিও বিশ্লেষণ করার মতো ভাবনায় বেশ খোরাক যুগিয়েছে। তিনি কতটুকু প্রজ্ঞার পরিচয় দিতে পেরেছেন তা দিবালোকের মতোই সুস্পষ্টভাবে আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থার সাংবাদিকদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে।

মিজান রহমান সম্পাদিত 'বঙ্গবন্ধু' গ্রন্থের ১৭০ নং পৃষ্ঠায় এক প্রবন্ধে লেখক, গবেষক, কূটনীতিক কামরুদ্দিন আহমদ স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লেখেন–

> "শেখ মুজিবের সাথে আমার পরিচয় ছিল দীর্ঘ দিনের। ১৯৪৩ সাল থেকে '৬৩ সাল পর্যন্ত। দুঃখের বিষয়– রাজনীতির ক্ষেত্রে আমার সাথে তাঁর মতের মিল হয়নি কোনদিন। কিন্তু আমি রাজনীতি ছেড়ে দেবার পর ১৯৬৬ সাল থেকে '৭১ সাল পর্যন্ত শেখ মুজিবের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও সাহস আমার মনের উপর গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। ঐ সময় মুজিবের পরিবর্তন আশ্চর্যজনক বলে মনে হয়েছিল।"

কূটনীতিবিদ, লেখক-গবেষক কামরুদ্দিন আহমদ খুবই মেধাবী অধ্যাপক ছিলেন। একসময় রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন তিনি। ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করে

সমাজ, সংস্কৃতি, বাঙালি মুসলমানের শ্রেণীগত অবস্থান নির্ণয় এবং রাজনীতি নিয়ে গবেষণাধর্মী গ্রন্থ রচনা করে তিনি সুনাম কুড়িয়েছেন।

কামরুদ্দিনের সাথে মতাদর্শগত অমিল থাকা সত্ত্বেও চিন্তাশীল লেখার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সম্পর্কে গবেষণার দৃষ্টিতে কামরুদ্দিন ওনার প্রজ্ঞাকে যথার্থভাবে প্রাধান্য দিয়েছেন। ওনার সাথে বঙ্গবন্ধুর ১৯৪৩ সাল থেকে চেনা-জানা শুরু। সেই থেকে মৃত্যু অবধি গবেষণায় বঙ্গবন্ধুর রাজনীতির প্রতিফলনে– ছয় দফার আন্দোলন থেকে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত ওনার প্রজ্ঞার পরিচয় পেয়েছেন।

প্রধান বিচারপতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট আবু সাঈদ চৌধুরীর পুত্র লন্ডনে অধ্যয়নরত অবস্থায় বাঙালি ছাত্রদের আন্দোলনের নেতা 'বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি' প্রবন্ধে আবুল হাসান চৌধুরী লেখেন–

> "তাই আমরা দেখতে পাই বাংলাদেশ জাতিসংঘের আনুষ্ঠানিক সদস্যপদ লাভের পূর্বেই জেনেভা, ভিয়েনা, লন্ডন, রোম, নিউইয়র্ক এবং ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থাসমুহের সদস্যপদ লাভ করে। এ ঘটনা বিশ্বইতিহাসে অভূতপূর্ব, যা জাতির জনকের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও কূটনৈতিক কুশলতার সাক্ষ্য গ্রহণ করে।"

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশ্বের বড় বড় ঝানু রাজনৈতিক ব্যক্তির সাথে কথা বলেছেন খুব সতর্কতার সাথে। অনেক প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন সুকৌশলে। বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য সফরের সময় বিভিন্ন প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিয়েছিলেন বিধায় ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষে আরব দেশগুলো সাহায্যের হাত বড়িয়ে দিয়েছিলেন।

আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিই পারে সত্যতা নিরূপণের জন্য একটি সহজ সরল রচনা। এদেশে তা কতটুকু সম্ভব তা আমার জানা নেই। তবে একটি কথা অকপটে আমি বলতে পারি, অতীতকে যেহেতু অতিক্রম করতে পারি সেহেতু অতীতের নেতিবাচক দিকটিকেও নতুন ধ্যান-ধারণার মাধ্যমে নবপ্রজন্মকে অতিক্রম করতে হবে, দেখতে হবে সংকীর্ণতামুক্ত চিন্তা থেকে।

আজকের বাংলাদেশের বিভিন্ন দলের কতিপয় নেতৃবৃন্দ ও বুদ্ধিজীবীগণ ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচক যে আলোচনা-সমালোচনামুখর তার বেশিরভাগই স্ববিরোধী।

বিশ্বনেতৃবৃন্দদের জীবনী পড়ে একটি কথা বেশি অনুভব করা যায়– অতি কাছে, অতি নিকটে বেড়ে ওঠা যে মানুষটি, তাকে বড় করে দেখার মতো উদার

দৃষ্টিভঙ্গি অনেকেরই হয় না। এটা তাদের হীনমন্যতাবোধ ও ইর্ষাপরায়ন মনোবৃত্তির হীন বহিঃপ্রকাশ মাত্র। তাঁকে ছোট করতে গিয়ে, তাঁর অযৌক্তিক সমালোচনা করতে গিয়ে বরং তারাই হেয় হয়, আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়। জনগণ তাদেরকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে। ফলে তাদের রোষ আরও বেড়ে যায়। তারা নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তাঁরা ভুলে যায় দেশের মঙ্গলের কথা, বরং তারা ভাবে নিজের উদরপূর্তির কথা।

আমরা বিদেশী নেতা, মনীষীর জীবনী মুখস্থ করে গল্প রচনা করি। তাদের বিশ্বাসের উদাহরণ দেই। সংগ্রামী জীবনের প্রবন্ধ-নিবন্ধ লেখা হয়। অথচ বঙ্গবন্ধুর সম্পর্কে কিছু লিখতেই কার্পণ্যতা দেখা যায়। বিশ্ববরেণ্য পণ্ডিত লেখক এডাম স্মিথের 'হিস্টরি অব অ্যাস্ট্রনমি' গ্রন্থে এর জবাব বোধ হয় আমরা কিছুটা পাই। তিনি লিখেছেন–

> "আমরা যে বস্তুর সঙ্গে সুপরিচিত এবং যাকে প্রতিদিন দেখি– যতই বৃহদাকার ও সুন্দর হোক না কেন তা আমাদের মনে স্বল্প প্রভাব আনে। কারণ আমাদের গুণমুগ্ধতার পিছনে কোন আজব বা আশ্চর্য বিষয় নেই।"

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে কিভাবে একটি স্বাধীন দেশ পেলাম– তা নিয়ে কারও মাথাব্যথা নেই বরং নিজেদের সুযোগ-সুবিধার কথা মাথায় রেখে মতাদর্শ পরিবর্তন করতেও দ্বিধা করে না। অতি সহজে স্বল্প সময়ে কেউ বুঝতে না বুঝতেই দেশ স্বাধীন হয়ে গেল এবং এই সব নেতৃবৃন্দের মধ্যে অনেকেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁর পাহাড়সম জনপ্রিয়তাই অনেকের গাত্রদাহের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অনেকেই প্রতিহিংসাবশত বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা এবং প্রজ্ঞার গুরুত্ব দিতে চায়নি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উদার মানসিকতায় সবাইকে কাছে ডেকে একত্রে কাজ করার নির্দেশ দিতেন। প্রকৃতপক্ষে দেশকে সমৃদ্ধশালী করার লক্ষ্যে সবাইকে নিয়ে কাজ করার পক্ষপাতী ছিলেন তিনি।

আমাদের দেশ বলে আজকে এ অবস্থা। অবাক বিস্ময়ে ও বেদনাভরা হৃদয়ে দেখি, লেনিন, মাওসেতুং, গান্ধি, জিন্নাহ, জন.এফ.কেনেডি, চার্চিল, সুভাস বসু, চে গুয়েবারা, হোচিমিন, নেলসন মেন্ডেলার মতো নেতৃবৃন্দের গুণগান গেয়ে কবিতা, গান, পত্রিকার কলামে, গল্পে, টকশোতে বচনে-বাচনে সর্বদাই এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরা তাদের জ্ঞান জাহির করে।

বাম-ডান সবাই মিলে বিদেশী নেতৃবৃন্দের জন্য গান রচনা করে কোরাস গায়। তারা ঘরের মানুষটিকে মূল্য দিতে কুণ্ঠাবোধ করে। কিন্তু বহির্বিশ্ব ঠিকই তাঁকে সম্মান দিতে এগিয়ে আসে। আমার দেশের সংগ্রামী পুরুষ, সম্মানের সর্বোচ্চ চূড়ায়

যিনি আরোহন করেছেন, সেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সম্বন্ধে আন্তর্জাতিক পত্র-পত্রিকা, বিশ্বনেতৃবৃন্দসহ, বিবিসি জরিপের মাধ্যমে তাঁকে বিশ্ব নেতা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। একদিকে বিবিসি জরিপ অন্যদিকে আন্তর্জাতিক জুলিও কুড়ি পদক প্রদান, জাতিসংঘের প্রথম বাংলা ভাষায় ভাষণ দেবার সুযোগ দানের মাধ্যমে তাকে যথাযথ সম্মান দেখিয়ে বাংলাদেশকে বিশ্বের বুকে পরিচিত করেছিলেন। বিশ্বের সেসব মানুষ সত্যিকার অর্থে একজন আদর্শবান দৃঢ়চেতা নেতাকে চিনতে পেরেছিলেন। আসলে এটা এই মহামানবের জীবনী নয়, ওনার প্রজ্ঞা, যা ওনার সংগ্রামী জীবনের খণ্ডিত অংশ মাত্র।

বঙ্গবন্ধু রাজনীতির দীর্ঘ লড়াই, সংগ্রাম ও আন্দোলনে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছেন। তিনি নিজে পরিপক্ব হওয়ার জন্যে সময় নিয়েছেন। তিনি সময় পেয়েছেনও। তার সমসাময়িক অনেক নেতৃবৃন্দই শুধুমাত্র রাজনীতিটাকে টেবিল সংলাপ, জনসভা, ভাষণ, নির্বাচন এবং ক্ষমতা– এই ধরনের রাজনীতিতেই অভ্যস্ত ছিলেন।

আন্দোলন, সংগ্রাম করা মানেই জীবনকে ঝুঁকিপূর্ণ করা। এসব চিন্তা করার মতো অবস্থা ছিল না তাদের মধ্যে। পরবর্তীতে লড়াই-সংগ্রামে দীর্ঘ কারাজীবন, জেল-জুলুম, অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করতে হবে– তা ভাবাই ছিল তাদের জন্য দুরূহ। এর মধ্যে ব্যতিক্রম ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি জীবনে কঠিন ব্রত নিয়েছিলেন যে, যত জেলজুলম নির্যাতন আসুক না কেন, তবুও অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে হবেই।

১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের ছাত্র থাকা অবস্থায়ই বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ন্যায্য দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়ে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে কারাবরণ শুরু হয়। কারাগারে থাকতেই ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন 'আওয়ামী মুসলিম লীগে'-এর প্রতিষ্ঠাতা যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। সংগঠনটির প্রতিষ্ঠা থেকেই শুরু হয় পাকিস্তানের মুসলিম লীগ সরকার বিরোধী আন্দোলন। আন্দোলনে জেল-জুলুমের মতো নির্যাতন শুরু হয়। ফলে আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠিত কমিটির অনেক নেতাই পঞ্চাশের দশকে জেল-জুলুমের ভয়ে রাজনীতি ছেড়ে দিয়েছিলেন।

এদের বেশির ভাগই সৌখিন তথাকথিত আশরাফ শ্রেণীর অভিজাত মুসলমান। কিন্তু এর মধ্যে ব্যতিক্রম ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি জীবনের প্রথম থেকেই জেল-জুলুম, নির্যাতন সহ্য করে এগিয়ে গেছেন দলের সাংগঠনিক কাজে, জনগণের মৌলিক অধিকার আদায়ের সংগ্রামে। তিনি যেন ইচ্ছা করে বেছে নিলেন এই কঠিন পথ। কঠোর কঠিনতম পথ পাড়ি দিয়েই তিনি এগুবার চিন্তা

করলেন। কণ্টকাকীর্ণ পথেই তিনি ব্যয় করবেন তাঁর অফুরন্ত শক্তি। কর্মপ্রিয় এই মহামানব বিশেষ একটি স্বপ্ন বুকে নিয়ে বিজয়ের আশায় জেল-জুলুম হুলিয়াকে বরণ করে এগিয়ে যাবার অঙ্গীকারাবদ্ধ হলেন।

তিনি যে পথ অবলম্বন করলেন সে পথ বড়ই কঠিন। এপথ অন্য কেউ মাড়াবার সাহস পায়নি। এই জগৎ-সংসারে মানবজীবনে এই ধরনের কর্মবীরদের প্রশস্তি গেয়েছেন কবি ও দার্শনিকরা। কবি আল্লামা ইকবালের 'আসারারে খুদি' কাব্যে বাংলা অনুবাদের এক জায়গায় এভাবে পাওয়া যায়–

"কর্ম প্রিয় মানুষের শক্তি
প্রকাশ লাভ করে
যা কিছু কঠোর তাকে গ্রহণের ভেতর দিয়ে।
নিজ আত্মার নেই কোন অস্ত্র
আর্ত বিলাপ ছাড়া
জীবনের আছে একটি মাত্র নিয়ম
জীবন শক্তির প্রকাশ
আর তার মূল উৎস বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা"

যা কিছু কঠোর তাই তিনি বেছে নিলেন। তিনি কঠোর কঠিন কর্মটিকে আদর্শ হিসেবে বেছে নিলেন। সত্যিই সে বিজয়ের আকাঙ্ক্ষায়ই তাকে সকল বাধা-বিপত্তিকে অতিক্রম করতে সহায়তা করেছে। যা কিছু কঠোর বাঙালির অধিকার আদায়ে সে কঠিন কাজটি বুক পেতে নিয়েছিলেন এবং স্বাধীনতার মন্ত্রেই জীবনী শক্তির প্রকাশ। ফাঁসিতে ঝোলানোর ষড়যন্ত্রেও তিনি নির্ভীক ছিলেন। অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে মোকাবেলা করেছেন প্রতিকূল সময়টাকে। তিনি সর্বদাই বলেছেন, আমি হাসতে হাসতে জীবন দিয়ে বাঙালির রক্তের ঋণ শোধ করে দেবো।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে কিছুসংখ্যক তথাকথিত জ্ঞানপাপী বুদ্ধিজীবী শুধুমাত্র নয় মাসের যুদ্ধে সীমাবদ্ধ রাখতে চায়। আজকাল গবেষক, বুদ্ধিজীবীর অভাব নেই। চারদিকে অনেক কৃতিত্বপূর্ণ কাজের অধিকারী, প্রবীণ, মেধাবী, সাহসী, সংগ্রামী মানুষের ভিড় দেখা যায়। ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার টক শোগুলোতে বিভিন্ন দিবসে আলোচনা-সামালোচনায় তাদের মুখে খৈ ফোটে।

কবির চৌধুরী সম্পাদিত রামেন্দ্র চৌধুরীর লেখা প্রবন্ধের ২০৫ পৃষ্ঠায় লেখেন–

"ষাটের দশকে বাঙালির ছয়দফা আন্দোলন, '৬৯-এর গণআন্দোলন কিংবা '৭০-এর নির্বাচন কোথায় তারা "বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে" হঠাৎ পাওয়া ধন বলে অবমূল্যায়ন না করলে মানতেই হবে 'বঙ্গবন্ধু' মুজিব আপন রাজনৈতিক

প্রজ্ঞা ও প্রতিজ্ঞায় সতত আপোষহীন সংগ্রামে সমগ্র জাতিকে একটি সুস্থির রাজনৈতিক লক্ষ্যে সংগঠিত এবং সক্রিয় করতে পেরেছিলেন। নিঃসংশয় লক্ষ্যটি ছিল বাঙালি জাতির পরিচয় অর্জনের স্বাধীন স্বদেশ– একটি আধুনিক জাতি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার।"

সেই ষাটের দশকে আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা আর আজকের উন্নত তথ্যপ্রযুক্তি এবং ব্যাপক প্রসারমান মিডিয়ার যুগ– ব্যবধান যে অনেক তা সহজেই অনুমেয়। নতুন প্রজন্ম এটাকে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিতে দেখতে পারেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠকেরা একটু ভেবে-চিন্তে তা গ্রহণ করেন। কারণ, বর্তমান অবস্থা এবং ষাটের দশকে এদেশের মানুষের অবস্থা একরকম ছিল না। শিক্ষার হার, রাজনৈতিক চেতনা, ধর্মবোধ, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ও সাহস সবকিছু মিলিয়ে তখনকার পরিস্থিতির প্রেক্ষাপট আমাদের অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে উপলব্ধি করে মানস পটে প্রকৃত ছবি এঁকে তা বিশ্লেষণ করা উচিত। তখনকার অগোছালো ও অসচেতন মানুষকে সংগঠিত করে যুদ্ধের সৈনিক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা খুবই দুরূহ ব্যাপার ছিল। আজকের মতো উন্নত তথ্যপ্রযুক্তি ও মিডিয়ার যুগের আন্দোলন-সংগ্রাম দিয়ে তৎকালীন প্রেক্ষাপটকে বিচার করা নিতান্তই অপরিপক্বতার পরিচয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশী-বিদেশী বহু সাংবাদিকের সাথে কথা বলেছেন। অনেক অভিজ্ঞ, দক্ষ ও ঝানু বিদেশী সংবাদ সংস্থার মুখোমুখি হয়েছেন। কোনো সাক্ষাৎকারে তাঁর কথার ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরতে পারেনি তারা। অতি সতর্কতার সাথে তিনি উত্তর দিয়েছেন। সাংবাদিকরা তাঁর মুখ থেকে এমন কোনো মন্তব্য বা জবাব বের করতে পারেনি, যা দিয়ে তখনকার আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে পারে। বিশেষ করে ১৯৭০-৭১ সালে এমন সাবধানে সতর্কতার সাথে সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে বা এমনভাবে বিদেশী সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন যাতে কেউ জনগণকে বিভ্রান্ত করতে না পারেন।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ভাষণের পর 'সানডে টাইমস্' পত্রিকার সম্পাদক মেকেল সে সময়ের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধুর চল্লিশ মিনিটের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। সাক্ষাৎকারের প্রশ্নগুলো ছিল খুবই কৌশলী এবং কূটনৈতিক ধাঁচের। সাক্ষাৎকারের একটি প্রশ্ন ছিল–

"আপনি পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নির্বাচিত নেতা। আপনার মেধা, প্রজ্ঞার মাধ্যমে আপনি জনগণকে সংগঠিত করেছেন, একটি পতাকা সৃষ্টি করেছেন, একটি জাতীয় সঙ্গীত সৃষ্টি করেছেন। তাহলে আপনি যুদ্ধ ঘোষণা

করছেন না কেন?' জবাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, 'সংখ্যাগরিষ্ঠরা কখনো সংখ্যালঘিষ্ঠদের আক্রমণ করে না। বরং সংখ্যালঘিষ্ঠরা আক্রমণ করে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠরা তা প্রতিরোধ করে।"

এমন অকাট্য যুক্তিসংগত কূটনৈতিক জবাব দিতে পেরেছিলেন বলেই সানডে টাইমস্ পত্রিকার বিজ্ঞ সম্পাদকের বদৌলতে বিশ্বনেতৃবৃন্দ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্বন্ধে উঁচু ধারণা পোষণ করতেন। বঙ্গবন্ধুর প্রজ্ঞা সম্বন্ধে যথাযথ ধারণা ছিল বলেই সাংবাদিক মেকেল এমন মন্তব্য করেছেন। আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা থেকে শুরু করে দেশী-বিদেশী গবেষক, লেখকগণ অনেক গুণের মধ্যে প্রজ্ঞাবান গুণটি দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে বিচার করেছেন। প্রজ্ঞা, প্রত্যয় ব্যবহার করে বঙ্গবন্ধুকে সম্বোধন করেছেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক ও সংগ্রামী জীবনে ধাপে ধাপে এগিয়ে গিয়েছেন সফলতার দিকে। চূড়ান্ত পর্বে তিনি জনপ্রিয়তার শীর্ষে আরোহন করেছেন। প্রতিটি পদক্ষেপে জনগণের চাহিদা অনুযায়ী, গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যতগুলি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সেগুলোতে তিনি অতি সূক্ষ্ম কৌশলের আশ্রয় নিয়েছেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সফল হয়েছেন। কিছু যে বিফল হয়নি তা কিন্তু নয়। কোনো কৌশল বা সিদ্ধান্ত বিফল হলেও তা চলার পথে বাঁধা সৃষ্টি করতে পারেনি। ধরে নিতে পারি, ব্যর্থতা থেকে তিনি শিক্ষা নিয়েছেন। এব্যাপারে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সাংবাদিক মাসুদা ভাট্টি ১৯৭১ সালে ২৫শে মার্চ মধ্যারাতে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হওয়া নিয়ে 'বাঙালির মুক্তিযুদ্ধে-বৃটিশ দলিল পত্র' গ্রন্থের ১৮নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন–

"তিনি শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর হাতে গ্রেফতার বরণ করেছিলেন। কারণ, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন বিশ্বের গণতান্ত্রিক মুক্তিকামী বিবেকের কাছে কারাবন্দীর মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ানো শেখ মুজিবের অবস্থান, পালিয়ে ভারতে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী মুজিবের তুলনায় অনেক সুদূর গ্রহণযোগ্য এবং সহানুভূতিপূর্ণ হবে। এখানেই মহান নেতা হিসাবে শেখ মুজিবের দূরদর্শিতা, প্রজ্ঞার পরিচয়। এখানেই জাতির পিতা হিসাবে তার বিজয়।"

এভাবে দেশী-বিদেশী জ্ঞানী-গুণীদের দৃষ্টিতে বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনকে সুবিন্যস্তভাবে বিশ্লেষণ করে মূল্যায়ন করেছেন। তাঁর প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা ও রাজনৈতিক জীবনের প্রথম থেকেই তাঁর কৌশলী পদক্ষেপের ব্যাপারে তারা যথাযথ ইতিবাচক মূল্যায়ন করেছেন।

১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনের পরে জেল থেকে বের হয়েই ১৯৫৩ সালে দলের সাধারণ সম্পাদক হন। তৎকালীন আওয়ামী মুসলিম লীগে সোহরাওয়ার্দী পন্থী মুসলিম লীগের প্রগতিশীল অনেক উচ্চশিক্ষিত প্রবীণ দক্ষ, এমনকি বিত্তশালী অভিজাত নেতৃবৃন্দ ছিলেন। রাজনৈতিকভাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বয়সে অনেকের চাইতে কনিষ্ঠতম হওয়ায় সেক্রেটারি হিসাবে অনেকেই ওনাকে মেনে নিতে পারেনি। সেই সময়েই বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে অনেকেই পরশ্রীকাতরতায় ভুগতেন, হিংসা করতেন। নিজ দলেই তিনি ছিলেন অনেকের প্রতিদ্বন্দ্বী। তখন অনেকেই সাধারণ সম্পাদক হতে চেয়েছিলেন।

রাজনীতিতে প্রতিযোগিতা থাকবে, থাকাটাই স্বাভাবিক। এটি রাজনীতির একটি বৈশিষ্ট্য। এমনকি হিংসাও থাকে। কারণে-অকারণে ভুল ধরে অনেকে। প্রতিবাদ করা, কুৎসা রটানো, বিভিন্নভাবে প্রতিপক্ষকে বিতর্কিত করে ছোট করার অপচেষ্টা থাকে। সেদিক থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও বাদ যাননি।

আওয়ামী মুসলিম লীগে দক্ষ এবং অনেক প্রবীণ নেতৃবৃন্দ ছিলেন, যেমন– আতাউর রহমান খান, সালাম খান, আবুল মনসুর আহমদ, খয়রাত হোসেন সহ আরও অন্যান্যরা। এদের মধ্যে দলকে সুসংগঠিত এবং এগিয়ে নেওয়ার বিষয়ে একটি প্রতিযোগিতা ছিল। এভাবেই ১৯৫৩ সাল থেকে ৭১ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময় সুষ্ঠুভাবে কুশলী পদক্ষেপ নেওয়ার ব্যাপারে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত।

তিনি খুব সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করে বুঝেশুনে একটি আত্মবিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে গিয়েছেন। সত্যি কথা বলতে তিনি দ্বিধা করেননি, এমনকি নিজের চিন্তা-চেতনাকে এগিয়ে নিতেও। তাঁর রাজনৈতিক বিরোধীপক্ষ, প্রতিপক্ষরা ওনার সিদ্ধান্তের কঠোর সমালোচনা করেছেন, নানাভাবে বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু নিজ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে তিনি ছিলেন অটল।

তবে সত্যানুসন্ধানী ব্যক্তিরা সত্য কথাই বলে গিয়েছেন। শেষ জীবনে তাদের অনেকেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রশংসা করতে দ্বিধা করেননি। বর্ষিয়ান জননেতা যুক্তফ্রন্ট সরকারের সাবেক মন্ত্রী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ আবুল মনসুর আহমদ যিনি মতাদর্শগত দিক থেকে বঙ্গবন্ধুর বিরোধী ছিলেন তিনিও বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শিতা ও প্রজ্ঞার প্রশংসা করেছেন। তাঁর লেখা 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' গ্রন্থে তিনি সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচিত আওয়ামী লীগের টিকেটে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক উভয় পরিষদের ৪১৮ জন সদস্যকে নিয়ে ৬ দফা বাস্তবায়নের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের কথা লিখতে গিয়ে তিনি বলেন–

"অনুষ্ঠানটি ভাবগাম্ভীর্যের সাথে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত করে। এই ৪১৮ জন নির্বাচিত সদস্যের সবার অবদান একরকম ছিল না এবং সবাইও

বঙ্গবন্ধুর কাছে পরীক্ষিত ছিলেন না। '৬৯-এর গণআন্দোলনের পর '৭০-এর নির্বাচনে অনেক নতুন লোক দলে জোয়ারের মতো আসে। তাদের মধ্য হতে সবাই পরীক্ষিত, অনুগত, পুরাতন ও নির্ভরযোগ্য ছিলেন এমন নয়। রাজনৈতিকভাবে অনেক অজানা-অচেনা প্রার্থীও নমিনেশন পেয়েছিলেন। উপরন্তু আওয়ামীলীগের প্রতিপক্ষ পশ্চিম পাকিস্তানীরা শুধু রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী ছিলেন না, বিপুল ধনসম্পদ, বিত্ত-বৈভবেরও মালিক ছিলেন। পার্লামেন্টারি রাজনীতি চর্চায় তাদের ঐতিহ্য ও গৌরব ছিল না। ফলে নির্বাচিত গণপরিষদ সদস্যদের একটি অংশকে হাত করে নেওয়ার সম্ভাবনা ছিল। অনুরূপ ক্ষেত্রে পূর্বপাকিস্তানী মেজরিটিকে বিভক্ত করা অনেকটা সহজ ছিল। সেদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাই রেসকোর্স ময়দানে বিশ লক্ষাধিক লোকের সামনে সমাবেশে ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে সদস্যদের দিয়ে হলফ করিয়েছিলেন। এতে একদিকে যেমন দলীয় নির্বাচিত সদস্যদের অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানী ধনকুবেরদের প্রতিও হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছিল। এছাড়া বঙ্গবন্ধুর স্বীয় প্রজ্ঞাবলে অসহযোগ আন্দোলনে উপযুক্ত কর্মসূচি দিয়ে পশ্চিমাদের শাসন ব্যবস্থাকে অচল করে দিয়ে বিশ্বকে নিজের জনপ্রিয়তাকে প্রমাণ করে দেন।"

যুগে যুগে জাতির প্রয়োজনে বিপ্লবী সন্তানদের আগমন ঘটে। যাদের কারণে যুগোপযোগী সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। এমনই সমস্যা ছিল বাঙালি জাতির। বাঙালিদের সঠিক নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য, ঘুমন্ত বাঙালি জাতিকে সংগঠিত করার লক্ষ্যে শ্রম ও মেধার সমন্বয় ঘটিয়ে বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এরকম সফল সংগ্রামী নেতৃত্বের অপেক্ষায় বাঙালি যেন প্রহর গুনছিল হাজার বছর ধরে।

১৯৪৩ সালে বাংলা সাহিত্যের খ্যাতনামা প্রবন্ধকার ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক ব্যারিস্টার এস.ওয়াজেদ আলী ভবিষ্যদ্বানী করে গেছেন যে, "এই বাংলা ভাষাভাষীর এই ভূখণ্ডের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের মানুষ বাঙালি। বাঙালিদের জন্য একটি সমাজব্যবস্থা বা একটি রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন হবে। সে আন্দোলনে এক মহামানবের আবির্ভাব হবে। যার নেতৃত্বে বাঙালিরা জেগে উঠবে।"

এভাবেই তিনি 'ভবিষ্যতের বাঙালি' প্রবন্ধে লেখেন–

"ঘুমন্ত রাজকুমারীর নিদ্রা ভঙ্গের মতই ভারতবর্ষে এই ভাগ্য নির্দিষ্ট যুগ মানবরূপ রাজকুমারের স্নেহ পরশে আবার জেগে উঠবে বাংলার শ্যামল বুকে যারা লালিত-পালিত। এখানকার সুনির্মল হাওয়ায় পুষ্ট, এখানকার মাটির রসে

যাদের প্রাণসঞ্জীবিত, পৃথিবীর ক্ষুদ্র সংস্করণ আমাদের এই স্বর্ণপ্রসু এই মহামিলনের পটভূমি যে বাংলাদেশে রচিত হচ্ছে, এ আমি অন্তরচক্ষে দেখতে পাচ্ছি আর লক্ষ্য করছি সেই অনাগত কালোপযোগী যুগ মানবের আবির্ভাব।"

দেশী ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বিশ্লেষণে বারবার উঠে এসেছে একটি শব্দ, তা হলো 'প্রজ্ঞা।' এই প্রজ্ঞা শব্দটি দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে বিশেষায়িত করা হয়েছে। যেহেতু এই প্রজ্ঞার অধিকারী হলেন 'বঙ্গবন্ধু', সেহেতু প্রজ্ঞার কতটুকু নিদর্শন রেখেছেন, কোন কোন ক্ষেত্রে এ প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন, তা অবশ্যই উপলব্ধি করা দরকার। যেহেতু দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে অনেক লড়াই সংগ্রামের পথ পাড়ি দিয়ে ধাপে ধাপে অনেক প্রবীণ, শিক্ষিত, ধনাঢ্য, অভিজাত নেতার জনপ্রিয়তাকে ম্লান করে এগিয়ে গিয়েছেন। জনপ্রিয়তার চূড়ান্ত শীর্ষে আরোহন করতে পেরেছেন, সেখানে নিশ্চয়ই রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের গভীর পর্যবেক্ষণ এবং সূক্ষ্ম গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে অনেক বিশেষণ ব্যবহার করেছেন, তন্মধ্যে 'প্রজ্ঞা' শব্দটিই আকর্ষণীয় ব্যঞ্জনাপূর্ণ। তাই বিদগ্ধজনদের দেওয়া প্রজ্ঞার প্রতিফলন ঘটিয়ে সর্বোচ্চ শীর্ষে আরোহন করতে পেরেছিলেন।

সোজা সরল একজন মানুষ মাত্রই ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে। রাজনীতিতে ষোলোআনা সঠিক সফল নেতা কেউ ছিলেন কিনা অন্তত আমার জানা নেই। অবশ্যই এই সফল সঠিক শব্দ দুটির যথার্থ মূল্যায়ন– ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করে। দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যত সমস্যা। আজকাল যারা লেখেন তাদের চরিত্র, বৈশিষ্ট্য, শিক্ষা-মেধা, সবকিছুই আত্মসমর্পণ করে রাজনৈতিক মতাদর্শে ও গোঁড়ামিতে। যার জন্য সঠিক যুক্তিপূর্ণ মূল্যায়নধর্মী লেখা লেখকদের নিকট হতে পাওয়া দুষ্কর। তবে সবাই যে এক রকম তাও নয়। তবে অনেক কিছু পরিবর্তনের সাথে সাথে মানব জীবনের এই দৃষ্টিভঙ্গির দিকটিও পরিবর্তন হতে পারে। আমার ক্ষুদ্র চিন্তা-শক্তি দিয়ে খুঁজে বের করা এবং তা বিশ্লেষণের চেষ্টা প্রতিনিয়ত আমাকে তাড়া করে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর দীর্ঘ জীবনে বেড়ে ওঠার কয়েকটা ধাপ অতিক্রম করেছেন খুবই সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করে এবং সেখানে সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিয়ে কর্মসূচি দিয়েছেন। বক্তৃতা, বিবৃতি দিয়েছেন। কৌশলে জনগণের মনের কথা বলে এগিয়ে গিয়েছেন। প্রতিযোগিতার এই রাজনীতির মাঠে নিজেকে নায়ক গঠনের কৌশলী ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং সেই সাথে সফল হয়েছেন। এমন কতগুলো সিদ্ধান্ত ইতিহাসে আজও চিহ্নিত হয়ে আছে যেগুলো ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অনুসরণীয়।

সফল রাজনীতিবিদ হতে হলে, জনপ্রিয় ও জননন্দিত নেতা হবার জন্য একজন ব্যক্তিকে বিভিন্ন গুণের অধিকারী হতে হয়। তাকে অনেক বাধা-বিপত্তি, অনুকূল ও প্রতিকূল পরিবেশকে মোকাবেলা করে এগিয়ে যেতে হয়। সর্বোপরি তার মধ্যে একটি গুণ থাকতে হয়– সেটি হলো, সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের জন্য কৌশল প্রণয়ন করে জনগণকে নিয়ে সফল হওয়া। এভাবে কাজ সুসম্পন্ন করতে পারে সে-ই যার বুদ্ধিমত্তা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অসাধারণ। প্রজ্ঞার দ্বারাই একজন মানুষ তার অবস্থানকে পাকাপোক্ত করতে পারেন, বিশেষ করে রাজনীতির ক্ষেত্রে।

মানুষের সামাজিক ক্ষেত্রে তৃণমূল পর্যায় থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ পর্যায়ে মানবজীবনে সফলতা, ব্যর্থতা সবকিছুই নির্ভর করে প্রজ্ঞার উপর। একজন ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে আসীন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে একই পথ অবলম্বন করতে হয়। এটাই হলো একজন সফল রাজনীতিবিদের সবচেয়ে বড় সম্পদ, যা ব্যবহার করে তাকে লক্ষ্যে পৌঁছাতে হয়।

এদেশে বিচিত্র রকমের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষ রয়েছে। তাদের চাহিদার ভিন্নতা রয়েছে। এসবকিছু উপলব্ধি করে একটি স্বপ্ন নিয়ে এগুতে হলে একটি জিনিসের খুবই প্রয়োজন। তা হচ্ছে প্রজ্ঞার দ্বারা সমস্যা মোকাবেলা করে জনপ্রিয়তার শীর্ষে আরোহন করে সফল হওয়া।

প্রজ্ঞা বলি, জ্ঞানই বলি আর বুদ্ধিই বলি– তা হলো যুগোপযোগী সমস্যা চিহ্নিত করে জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য সমাধানের জন্য কৌশল অবলম্বন করে যেকোনো সমস্যার সমাধান করা।

একজন রাজনীতিবিদ হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনগণকে নিয়ে একটি সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা করেন। দেশ ও জনগণকে নিয়ে তিনি সামনে অগ্রসর হতে থাকেন। জনগণের সাথে মিশে, তাদের সাথে কথা বলে দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান অনেক সমস্যাকে একত্রিত করে সুন্দর একটি ছকে সাজান। জনগণের বিশাল সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম ও প্রধান ছিল পরাধীনতা ও শৃঙ্খলিত বাকস্বাধীনতাহীনতা ও অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা।

একটি জাতি বিনির্মাণে একজন নেতাকে অবশ্যই সুন্দর স্বপ্ন নিয়ে এগুতে হয়। স্বপ্ন ছাড়া লক্ষ্যে পৌঁছানো কঠিন হয়ে পড়ে। জীবনের এই লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে এগিয়ে সবাই যাবে। স্বপ্ন ছাড়া, অগোছালো চিন্তা করে সামনে এগুনো যায় না। তিনি সুদূরপ্রসারী একটি স্বপ্ন মনে ধারণ করেছিলেন এবং জনগণকে সে স্বপ্নে বিভোর করতে সক্ষম হয়েছিলেন। স্বপ্ন ছাড়া চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়।

ভারতের সাবেক প্রেসিডেন্ট, বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী, পদার্থবিদ, মিসাইলম্যান

খ্যাত, লেখক ও কবি, ভারত রত্ন ড. এ,পি,জে আবুল কালাম আজাদের সুচিন্তিত বাণী তাঁর লেখা 'ইগনাইটেড মাইন্ড' নামক গ্রন্থে স্বপ্ন সম্পর্কে লেখেন–

Dream, dream, dream
Dream transform into thoughts
Thoughts result in action.

তিনি বলেন–

> "বন্ধুরা, যেখানে কোন স্বপ্নই নেই সেখানে কোন ভাল কাজ সংগঠিত হতে পারে না, সেখানে কোন বৈপ্লবিক চেতনা নেই। স্বপ্নের দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়েই সাফল্য আসে। যদিও সেই পথে রয়েছে নানা বাধা-বিপত্তি আর সীমাহীন প্রতিবন্ধকতা।"

মানবজীবনের এই জগৎ সংসারে মানুষ তার নিজ নিজ ক্ষেত্র থেকে স্বপ্ন দেখে কিভাবে গঠনমূলক কাজ করা যাবে, কিভাবে নিজেকে বা নিজ সংসারকে গড়ে তুলবেন। সমাজকর্মী হয়তো স্বপ্ন দেখেন কিভাবে সমাজকে সাজাবেন, তেমনি একজন নেতা স্বপ্ন দেখেন দেশকে কিভাবে সাজাবেন, গড়বেন, পরিবর্তন করবেন। রাজনীতিবিদ হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছাত্রজীবন থেকে স্বপ্ন দেখেছেন। একসময় মনের গভীরে লালন করলেও তা সময়মতো ঠিকই প্রকাশ করেছেন সেই স্বপ্নের কথা।

যৌবনের প্রারম্ভে স্বপ্ন দেখে বার্ধক্যের প্রথম ধাপে সফলতার মুখ দেখেছেন। গবেষকদের মতে, এমনকি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাক্ষাতেও বলেছেন, ১৯৪৭ সালে পূর্ব-পশ্চিম বাংলাকে একত্রিত করার আন্দোলন শুরু করেন শরৎ বসু, সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম– পরে তা প্রত্যাখ্যাত হয় জিন্নাহ ও গান্ধিজীর অনিহা থেকে। তখন থেকেই বাঙালিদের জন্য একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন দেখতেন। সে সমাজে ধনী-গরিবের এত বৈষম্য, সাম্প্রদায়িকতা ও নিরক্ষরতা থাকবে না।

এদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসই নয়, দেশের বাহিরে সকল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সফলতার কৌশলের ইতিহাস অনেকটাই ভিন্ন ও ব্যতিক্রমধর্মী। চীনের মাও সেতুং, রুশ বিপ্লবের নায়ক লেনিন, ভিয়েতনামের হোচি মিন, বলিভিয়ার চে গুয়েভারা, ফিলিস্তিনের ইয়াসির আরাফাত, দক্ষিণ আফ্রিকার নেলসন মেন্ডেলা– এসব নেতৃবৃন্দের মধ্যে বেশির ভাগই স্বশস্ত্র বিপ্লব করেছেন। রক্তপাতের মাধ্যমে সমাজের কিছু অংশের মানুষকে তাদের নিজস্ব দলীয় মতাদর্শে অন্তর্ভুক্ত করতে পেরেছেন। জনগণের বিশাল অংশ তাদের কর্মসূচি থেকে দূরে ছিল।

এই উপমহাদেশের রাজনীতি ছিল পৃথিবীর একটি সভ্য চতুর জাতি ইংরেজদের নিকট থেকে স্বাধীনতা লাভ করার। এখানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সফলতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি একটি দলের নেতা হলেও চূড়ান্ত সময়ে সর্বস্তরের জনগণের সমর্থনে নিরঙ্কুশ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে জনতার ম্যান্ডেট নিয়ে একজন পূর্ণ সফল নেতার সনদ অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই নিরঙ্কুশ জনগণকে তিনি একটি স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, যা আর কোনো দল বা কোনো নেতা দেখাতে পারেনি। এব্যাপারে তাকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কৌশল অবলম্বন করতে হয়েছে। ধাপে ধাপে সেই সব কৌশলের বেশির ভাগই গঠনমূলক ফল দিয়েছে। শেষে এমন অবস্থা হয়েছে যে, জনগণ সম্পূর্ণই তাঁর নিজের হয়ে যায়। ব্যাপারটা অনেকটা রূপকথার গল্পের মতোই বলি বা নাটকীয়ভাবেই বলি, এ সফলতা বা এমনকি দেশ স্বাধীন হওয়ার পিছনেও মৌলিক কারণই ছিল। জনগণের মনের গভীরে প্রোথিত যে চাহিদা, আকুতি-মিনতি, তথা সময়োপযোগী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সূক্ষ্মভাবে উপলব্ধি করে কর্মসূচি দিয়ে এগিয়ে গিয়েছেন।

সেই চল্লিশের দশকে ছাত্র থাকাকালীন অবস্থায় বঙ্গীয় মুসলিম লীগ নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর অনুসারী হয়ে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। তিনি গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করেন একদিকে ব্রিটিশ রাজ, স্থানীয় জমিদার, জোতদার অন্যদিকে গ্রাম বাংলার বাংলা ভাষাভাষী নির্যাতিত দরিদ্র কৃষক, নিরক্ষর সহজ-সরল ধর্মভীরু মানুষ।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট বদলাতে থাকে। যে আশায় পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছে, বাঙালির প্রত্যাশিত সেই আকাঙ্ক্ষা ধুলিসাৎ হতে শুরু করে। পূর্ব বাংলার বঞ্চিত মানুষের অনুভূতিগুলিকে উপলব্ধি করার মাধ্যমে বিরোধী রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হয়। নিজেদের অধিকার আদায়ের চিন্তা-ভাবনা থেকেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৪৮ সালে এদেশে প্রথমে ছাত্রলীগ গঠিত হয়। পরবর্তীতে তিনি কারাগারে অন্তরীণ থাকা অবস্থায় মাওলানা ভাসানী ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগ নামে পূর্ণ একটি রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। তিনি কারাগারে থাকা অবস্থায়ই 'আওয়ামী মুসলিম লীগ'-এর যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনে পাকিস্তানের মুসলিম লীগ সরকার বাঙালির বাংলা ভাষার দাবি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপর অমানবিকভাবে গুলির নির্দেশ দেন। পুলিশের গুলিতে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার ও আরও নাম না জানা অনেকেই শহীদ হয়। ফলে পূর্ববাংলার জনগণ তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়ে।

হাজার বছরের পুরনো এবং প্রতিষ্ঠিত ভাষা-সংস্কৃতির উপর এই আঘাত পূর্ব

বাংলার মানুষের মনে নতুন ভাবনার সৃষ্টি করে। পাকিস্তানের মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে ছাত্রদের সংগঠিত আন্দোলনই বাংলার মানুষকে জাগ্রত করে। সে ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কারাবরণ করেন। কারাগার থেকে মুক্তি লাভের পর নিজ রাজনৈতিক দল আওয়ামী মুসলিম লীগকে পাকিস্তান সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে সংগঠিত করতে থাকেন। ১৯৫৩ সালে সাধারণ সম্পাদক হওয়ার পর দলকে সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি ও কৌশল প্রণয়ন করতে থাকেন। প্রথম কৌশলই ছিল সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে বিশেষ করে জেগে ওঠা তরুণ ছাত্রসমাজ এবং গ্রামবাংলার দরিদ্র কৃষকের মাঝে নিজেকে গ্রহণযোগ্য করা।

এজন্যই তিনি সর্বস্তরের জনগণের সাথে মিশেছেন। ঘন ঘন সাধারণ জনগণের সাথে কথা বলেছেন, সভা করেছেন। বিশেষ করে মানুষের প্রতিক্রিয়া জানার জন্য বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে ঘন ঘন সভা-সমাবেশ করেছেন, বক্তৃতা করেছেন। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া জেনে কথা বলার ধরন ও ভঙ্গি পরিবর্তন করেছেন। বিষয়ও পরিবর্তন করেছেন। কোন শ্রেণীর মানুষের কোন ধরনের চাহিদা, কি তাদের চাওয়া-পাওয়া, এ সবই ছিল জনগণকে জানবার, বুঝবার এবং বুঝে অগ্রসর হওয়ার কুশলী পদক্ষেপ। সেই সাথে সহজ ভাষায় নিজের অনুভূতিকে জানানো। জেল থেকে বের হবার পর ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলার জনগণের মাঝে মুসলিম লীগ সরকার বিরোধী মনোভাব ছিল চাঙ্গা; বিশেষ করে তরুণ সমাজের মাঝে। মধ্যবিত্তদের মনেও ক্ষোভ ছিল। সামাজিক জীবন-যাপনে মুসলিম লীগের অনুসারীরা বৈষম্যমূলক আচরণ করতো। গ্রাম বাংলার নিরক্ষর কৃষক শ্রেণীদের নিজেদের প্রজাতুল্য গণ্য করতো। নবাব জমিদারদের উত্তরসুরি ও ধনাঢ্য জোতদার শ্রেণীর নেতৃত্বে চলতো মুসলিম লীগ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তথাকথিত পাকিস্তানপন্থী মুসলিম লীগ সমর্থক এই শ্রেণীটির বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধেই নিম্ন মধ্যবিত্ত ও কৃষক শ্রেণীর সন্তানদের সংগঠিত করতে থাকেন। তিনি সারা পূর্ব বাংলায় ঘন ঘন সভা-সমাবেশ করে সাধারণ জনগণকে আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতি আকৃষ্ট করার প্রয়াসে লিপ্ত থাকেন। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক কবির চৌধুরী সম্পাদিত– 'জননায়ক থেকে রাষ্ট্রনায়ক' গ্রন্থের ১৬৬ নং পৃষ্ঠায় তথ্য দিয়েছেন যে, "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৩ সালের আগস্ট থেকে নভেম্বর মাসের মধ্যে ঢাকা-নারায়নগঞ্জ এলাকায় প্রায় দেড়শ' জনসভা করেন।"

এভাবে ঘন ঘন জনসভা এর আগে কখনও কোনো নেতৃবৃন্দ করেননি, জনগণও প্রত্যক্ষ করেনি। এমনকি অন্যান্য রাজনৈতিক দলের জনসভাও এত ঘন ঘন কখনও হয়নি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই এভাবে জনসভা করা প্রথম শুরু

করেন। ঘন ঘন জনসভা করে মানুষের কাছে যাওয়া, সুখ-দুঃখের কথা শোনার মাধ্যমে তিনি একটি নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতি চালু করলেন। এটিই ছিল তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে বড় কৌশল। সাধারণ মানুষের মনের কথা জানা বা তাদের ভেতরে প্রবেশ করা, যা এর আগে কোনো নেতাই এভাবে জনগণকে কাছে টানেননি। সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য নায়ক হবার এই কৌশলটিই ওনার প্রথম প্রজ্ঞার পরিচয়।

বিশেষ করে উদ্দেশ্য একটিই– মানুষের ভেতরের খবর নিতে হবে সহজ ভাষায়। বাউল, আধ্যাত্মিক সাধকদের ভাষায় মানুষের মনের ভেতরে কি খেলা খেলে তা উপলব্ধি করা। এই উপলব্ধি অনুভূতির মধ্যে দিয়ে মনের রোগ ধরা যায়। তেমনি বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর এই মুহূর্তে কি ক্ষুধা, কি চাওয়া-পাওয়া তা হয়তো কম-বেশি অনেকেই বুঝেছেন।

এদেশের সহজ সরল মানুষের মনের ভেতরে ঢুকতে চেয়েছেন তিনি। কী ধরনের স্বভাব, বৈশিষ্ট্য, ধ্যান-ধারণা, দুর্বলতা, সবলতা, সাংস্কৃতিক জীবন যাপনের পালাবদল কি করে হয় তা জানতে চেয়েছেন তিনি। এ সমস্ত মানুষের এ অবস্থাকে সরাসরি প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছেন। কারণ, তিনি ভালোভাবেই উপলব্ধি করেছেন, এদেশে রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি মানুষের বিশেষ করে মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত জনগণের ভয় আছে, শ্রদ্ধাভক্তিও আছে, তবে সেটা অন্য কারণে। কারণ, অতীতে নির্বাচিত সংসদ সদস্যই হোক কিংবা মন্ত্রিই হোক– এর বেশির ভাগই ছিল নবাব, জমিদার, জোতদার পরিবার থেকে। অথবা এরা প্রকৃত জমিদার না হয়েও জমিদারি মন-মাসকিতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্য থেকে নেতা হতেন। এরা নির্বাচনের সময় নির্বাচনী এলাকায় যেতেন ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে, সাথে থাকতো পাইক-পেয়াদা। দামি শেরওয়ানি, জিন্না টুপি মাথায় দিয়ে, দামি পোশাক-পরিচ্ছদে সবসময় নিজেকে আবৃত করে রাখতেন। আভিজাত্য ফলাতে উর্দুভাষায় কথা বলতেন। গ্রামের বাংলা ভাষাভাষী সাধারণ কৃষক, শ্রমিকরা তাদের কাছে ঘেঁষতে সাহস পেত না।

তাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ব্যক্তিগত অন্তর্দৃষ্টি ও উপলব্ধির মাধ্যমে সময়োপযোগী পদক্ষেপ নিতেন। তিনি মানুষের সমস্যা সংকট, চাহিদা, রুচি, বৈশিষ্ট্য, আবেদন-নিবেদন নির্ণয় করা এবং তা সমাধানের যুতসই পদ্ধতি সৃষ্টি করার মাধ্যমে জীবনকে সংগ্রামের কাছে সঁপে দিয়েছিলেন। এ যেন নিজেকে স্বতন্ত্রভাবে উপস্থাপন করে স্বতন্ত্রভাবে নিজেকে প্রকাশ করার কৌশল। মনে হচ্ছে সুপ্ত একটি প্রতিভা ঘুমন্ত অবস্থায় আছে। সে প্রতিভাকে বিকশিত করার জন্য কঠোর সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তিনি।

এ ভূখণ্ডের জনগণের প্রকৃত মনের কথা বুঝতে, উপলব্ধি করতে অনেকেই ব্যর্থ হয়েছিলেন। তখনও পর্যন্ত রাজনীতি ছিল অভিজাত, ধনাঢ্য ব্যক্তিদের নিয়ন্ত্রণে। ব্রিটিশ শাসনের নাগপাশ কাটিয়ে ১৯৪৭ সালে শুধু দেশ ভাগ হয়েছে। শুধু মানচিত্র, পতাকা ও দেশের নাম পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু তখনও খাজা নাজিমুদ্দিন, নুরুল আমিন, মাওলানা আকরাম খাঁদের জীবন-যাপনের সংস্কৃতি রয়ে গেছে। কারণ তখন পত্র-পত্রিকা, মিডিয়া ও তথ্যপ্রযুক্তি উন্নত ছিল না। যাতে করে মানুষের চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন হবে। নির্বাচন এলে প্রিন্স কোট অথবা দামি শেরওয়ানি, জিন্না টুপি মাথায় দিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে বের হতেন। রাস্তা দিয়ে এই নবাব, জমিদারদের বহনকারী গাড়ি চলার সময় গ্রামের জনগণ অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতেন। গ্রামের সাধারণ মানুষ কৃষক, শ্রমিকেরা হাত জোড় করে কুর্নিশের ভঙ্গিতে রাস্তা ছেড়ে দাঁড়াতেন। নির্যাতনের ভয়ে তাদের ছায়া পর্যন্ত মাড়াতেন না। সামাজিক এই সংস্কৃতি কিছুটা বদলে গেলেও পুরোপুরি বদলায়নি তখনও। পাকিস্তান হলেও সেই আলীগড়ি আশরাফ শ্রেণীর মনোভাবাপন্ন খানদানি মুসলমানদের হাতে ছিল সমাজব্যবস্থা। এদের মধ্যে শিক্ষিত, অভিজাত ব্যবসায়ীরা শহরে বসবাসকারী ছিলেন। তারা সর্বদাই নিজেদেরকে স্বতন্ত্র মানুষ মনে করতেন। এদের মধ্যে অনেকেই বিভিন্ন পেশায় সময় ব্যয় করতেন। বিশেষ করে কয়েকজন ছিলেন পেশাদার আইনজীবী। তাই সাধারণ জনগণের জন্য সময় ব্যায় করতেন কম। আবার অনেক ধনাঢ্য অভিজাত পরিবারের সন্তান শহরে থাকতেন। জনগণ তাদের বাসস্থানের ঠিকানাও জানত না। অজোপাড়াগাঁয়ের দরিদ্র কৃষকদের সাথে মিশতে তাদের অনিহা ছিল। নাক সিঁটকানো মনোভাব ছিল। ময়লা ছেঁড়া জামা পরিহিত কোনো দরিদ্র মানুষের সাথে মিশতে চাইত না। মাথা বা পিঠে হাত দিয়ে শান্ত্বনা দেওয়া, আশা দেওয়া, তাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা শোনা তাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি-বিরোধী ছিল। এধরনের রাজনীতি করার কথা তারা কখনো ভাবতেই পারতো না।

নির্বাচনী প্রচারের সময় থাকতো ভাড়া করা মাওলানা আকরাম খাঁদের মতো গোঁড়া ধর্মান্ধ ব্যক্তিরা। ধর্মের স্পর্শকাতর জায়গায় যুৎসই খোঁচা দিয়ে প্রচার করে জনগণের কাছে ভোট চাইতেন তারা। অনেকে বাংলায় কথাও বলতে পারতেন না। জনগণের সাথে কথা বলা তো দূরের কথা, তাদের দৈনন্দিন সমস্ত জীবন-যাপন এবং সমাধানের পথ কী তা নিয়ে মাথাও ঘামাতেন না।

এই রাজনৈতিক সংস্কৃতি দেশ ভাগের পরও ছিল। সেই সময় আওয়ামী মুসলিম লীগের অনেক নেতাই ছিলেন অভিজাত পরিবারের সন্তান মুসলিম লীগ ঘরানার। অনেক শৌখিন নেতাই নির্বাচনে জিতে এমপি মন্ত্রী হবার লোভে এবং

অনেক মুসলিম লীগের নেতৃত্বের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগ দিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে অনেকেই পুরনো সংস্কৃতি ধরে রেখেছিলেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাদের এই রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে প্রত্যক্ষ করে সুকৌশলে রাজনীতির মাঠে নেমে পড়লেন। সরাসরি জনগণের কাছে যাওয়ায় তিনি নিজেকে চেনাবেন এবং নিজে জনগণকে চিনবেন, বুঝবেন কোন শ্রেণীর জনগণের কি চাহিদা এবং এইসব সমস্যার সমাধান কিভাবে সম্ভব। তাই ঘন ঘন জনসভা করতে শুরু করলেন। এতে করে প্রত্যহ দৈনিক পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয়ে শহুরে শিক্ষিত লোকদের কাছে পরিচিত হতে থাকলেন তিনি। অন্যদিকে গ্রামে গ্রামে জনসভা করে সরাসরি জনগণের সাথে কথা বলতেন এবং স্থানীয় কোনো নেতার বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করতেন। এতে তাঁর কোনো নাকসিঁটকানি ও ঘৃণার মনোভাব ছিল না। এভাবে তিনি সর্বসাধারণের মাঝে মিশে যেতে পারতেন।

তিনি গ্রামের ও শহরের তরুণ সমাজের সাথে মিশতেন। এমন একটি শ্রেণীর সাথে মিশেছেন এবং একটি স্বপ্ন দেখানোর চেষ্টা করেছেন। যারা নিম্ন মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্তের সন্তান, লেখাপড়া শিখছেন ভালো একটা চাকুরির আশায়, তাদেরকে বুঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন পাকিস্তানের এই অগণতান্ত্রিক মুসলিম লীগ সরকারের বৈষম্যমূলক নীতি প্রয়োগের কারণে বাঙালি যুবকদের যোগ্যতানুযায়ী চাকরি থেকে বঞ্চিত হতে হবে। এরই মধ্যে ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দানকারী নির্যাতিত যুব-নেতাদের দলে টানতে সক্ষম হয়েছিলেন। অন্যদিকে প্রবীণ উচ্চ শিক্ষিত এবং বিত্তশালী নেতৃবৃন্দেরও অভাব ছিল না। কিন্তু পরবর্তী ইতিহাস বলে দেয়, তখনকার অনেক প্রবীণ দক্ষ এবং বিত্তশালী নেতৃবৃন্দ এতটা গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা পাননি, যা পেয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

অনেক কৌশলের মধ্যে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়াটাই হচ্ছে প্রজ্ঞার পরিচয়। তা সফলভাবে প্রয়োগ করে তার বাস্তবায়ন করাই হলো ইচ্ছা শক্তির সঠিক প্রতিফলন। ঘুরেফিরে বারবার একটি কথাই টানতে হয়। তা হলো রাজনীতির প্রতিযোগিতায় বঙ্গবন্ধুর প্রজ্ঞা।

সেই পঞ্চাশের দশক থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত প্রবীণ শিক্ষিত, অভিজ্ঞ জনপ্রিয় অনেক নেতাই ছিলেন যারা ভিন্ন মতাদর্শের কারণে বারবার বঙ্গবন্ধুর বিরোধিতা করেছেন। যতটুকু না মতাদর্শগত কারণ, তারচেয়ে বেশি কারণ ছিল স্বল্প সময়ে তাঁর জনপ্রিয়তা এবং নেতৃত্বে এগিয়ে যাওয়া সর্বোপরি তিনি একপ্রকার সেরা আইকনে (প্রতিমূর্তি) পরিণত হতে পেরেছিলেন বলে।

১৯৫৪ সালে পাকিস্তানের মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে নির্বাচন করার জন্য একটি রাজনৈতিক জোট গঠন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তারই

পরিপ্রেক্ষিতে যুবনেতাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যুক্তফ্রন্ট গঠন করা হয়। মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে এটা ছিল একটা নির্বাচনী জোট। শেরে বাংলা ফজলুল হক, মাওলানা ভাসানী এবং সোহরাওয়ার্দী প্রধান নেতৃবৃন্দ হলেও মতাদর্শগতভাবে তাদের মধ্যে মিলের চেয়ে অমিলই ছিল বেশি। এই মতাদর্শের ভিন্নতা থাকায় জোট গঠনে জটিলতার সৃষ্টি হয়। কিন্তু তরুণ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী ছাত্রনেতাদের বুঝিয়ে, একত্রিত করে, এক রকম চাপ দিয়ে ঐ তিন নেতাকে এক জায়গায় বসিয়ে একটি জোট গঠন করতে সক্ষম হলেন। তা যুক্তফ্রন্ট নামে খ্যাত। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রচারে একদল তরুণ নেতৃবৃন্দ নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নির্বাচনী প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এই নির্বাচনী প্রচারাভিযানে তিনি কিছু উর্দুভাষী অবাঙালি নবাব, জমিদারদের চরিত্র, বৈশিষ্ট্য, এবং তাদের ধর্মের অপব্যবহার চুল-চেরা বিশ্লেষণ করে তুলে ধরলেন জনগণের মাঝে। তিনি ছিলেন খুবই কৌশলী বক্তা। ক্ষমতাশীন এই বিশেষ শ্রেণীর সাথে সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রাম-বাংলার বাংলা ভাষাভাষী মানুষের আর্ত-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের যে পার্থক্য তা তিনি স্পষ্টভাবে জনগণকে বোঝাতে সক্ষম হলেন।

তিনি গ্রাম-বাংলায় ঘুরে ঘুরে নির্বাচনী জনসভাগুলোতে বক্তৃতা দিয়ে জনগণকে সচেতন করতে চেষ্টা করতে থাকেন। বাঙালিদের এই বাংলা ভাষা শত বছরের পুরনো, উর্দু ভাষার চাইতে সমৃদ্ধ এবং ব্যাপক। আমাদের দেশের বাঙালিদের চাল-চলন, আচার-ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাওয়া-দাওয়া, শারীরিক গঠন তথা আঞ্চলিক লোকজ উৎসব অনুষ্ঠান সর্বোপরি জীবন-যাপনের যে বৈশিষ্ট্য, তা পশ্চিম পাকিস্তানি মুসলমানদের চেয়ে অনেক পার্থক্য। এই সামান্য কয়টি কথাই জনসভায় বক্তৃতায় তিনি ব্যবহার করতেন। এভাবেই নাকি যুক্তফ্রন্টের জনসভাগুলিতে তিনি বক্তব্য দিতেন। একথাগুলো আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া। তৎকালীন সময়কার একজন ছাত্রলীগ কর্মী পরবর্তীতে স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। ফরিদপুর, খুলনায় কয়েকটি জনসভায় অংশ নেবার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল ঐ শিক্ষকের। তিনি আমাকে শুনিয়েছিলেন তার অভিজ্ঞতা এবং কিভাবে মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো শ্রোতা বানাতে পারতেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আরও একটি কৌশল অবলম্বন করতেন তিনি সেটা হচ্ছে, যে এলাকায় যেতেন সেই এলাকায় জনগণের বড় কোনো সমস্যা, চাহিদা কি সেটা গোপনে সংগ্রহ করতেন এবং জনগণকে সন্তুষ্ট করে কাছের মানুষ হবার চেষ্টা করতেন। বক্তৃতায়, জনগণের পক্ষে গঠনমূলক সমাধান করার কথা বলতেন। ছাত্র সমাজ ও বেকার তরুণদের ভবিষ্যৎ সমস্যার কথা সূক্ষ্মভাবে তরুণদের মাঝে তুলে ধরতেন এবং ভবিষ্যতে কিভাবে সমাধান

হতে পারে তা তিনি সবিস্তারে বর্ণনা করতেন। ঐ এলাকায় দায়িত্বে থাকা ক্ষমতাশীন মুসলিম লীগের সংসদ সদস্য, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা যে কোনো নেতৃবৃন্দের ব্যর্থতার কথা তুলে ধরতেন।

নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়লাভ করে যুক্তফ্রন্ট। মুসলিম লীগের অনেক বাঘা বাঘা নেতার জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছিল সেই নির্বাচনে। নির্বাচনের পরে তিনি হাতে হাতে দুটো ফল পেলেন। একটি হচ্ছে এভূখণ্ডের মানুষ নিজেদেরকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আলাদা বলে অর্থাৎ সর্বোপরি বাংলা, বাঙালি হিসেবে নিজেদের পরিচয় দিতে শুরু করেছে। আরেকটি হলো– মুসলিম লীগের ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে। মানুষ জেগে উঠেছে। মানুষ ধীরে ধীরে সংগঠিত হতে যাচ্ছে। এই অনুভূতিগুলোকে লক্ষ্য করে তিনি এগুতে থাকেন। যুক্তফ্রন্ট সরকারের তরুণ সংসদ সদস্য ও মন্ত্রী হয়ে তরুণ সমাজ তথা বাঙালি জনগণের মাঝে নিজের আসনকে পাকাপোক্ত করার লক্ষ্যে প্রথমেই যে কৌশলটি অবলম্বন করলেন তা হলে– পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের পরিচয়ের বিভ্রান্তি নিয়ে। তিনিই সংসদে এবং বাইরে প্রথমে প্রশ্ন তুললেন, পূর্ব বাংলা না পূর্ব পাকিস্তান। পাকিস্তানের মুসলিম লীগ সরকার দেশ বিভাগের সাথে সাথেই এ অঞ্চলকে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল আখ্যায়িত করে নামকরণ করেছিল পূর্ব পাকিস্তান।

১৯৫৫ সালের ২৫ আগস্ট পাকিস্তান গণপরিষদে পূর্ব বাংলা নাম বিলুপ্তির বিরোধিতা করে শেখ মুজিবুর রহমান যে ভাষন দিলেন তা হলো–

> Sir, you will see that they want to place the words East Pakistan instead of "East Bangle". We have demanded so many times that you should make it Bangal. The word Bangal has a history has tradition of its own you can change it, then we will have to go back to Bangal and ask them whether accept it.

সবাইকে হতবাক করে দিয়ে এই বাঙালির বাংলা ইস্যুকে প্রাধান্য দিয়ে সংসদের ভেতরে এবং বাইরে বক্তব্য দিয়ে পত্র-পত্রিকার খোরাক হলেন এবং এই ভূখণ্ডের জনগণের কাছে বিশেষ করে তরুণ সমাজের কাছে খুবই গ্রহণযোগ্য হলেন। কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিকরা এ নিয়ে বেশ লেখালেখি করতে শুরু করলেন।

মুসলিম লীগ থেকে আসা সোহরাওয়ার্দীপন্থী বেশকিছু প্রবীণ, শিক্ষিত, অভিজ্ঞ নেতা ছিলেন, যারা যুক্তফ্রন্ট থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন। সেই সব খ্যাতিমান, অভিজাত নেতারা সংসদে প্রাধান্য বিস্তার করার জন্যে ব্যস্ত থাকতেন। নিজেদের এলাকার উন্নয়ন তথা সমস্যা সম্পর্কে অবহিত করতেন। তা সমাধানের জন্যে

সরকারের কাছে আবেদন জানাতেন। অনেকে মন্ত্রী হবার জন্য জোর লবিংও করতেন। মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা আবুল কাসেম ফজলুল হককে সন্তুষ্ট করার জন্য এবং নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখার জন্য তারা সর্বদাই ব্যস্ত থাকতেন। সেই সময়টি ছিল ঐতিহাসিকভাবে পরিবর্তনের সময়। বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলনের ঘটনা বাংলা ভাষাভাষীদের মাঝে রূপকথার গল্পের মতো গ্রামের জীর্ণকুটির থেকে শুরু করে শহরের বাংলাভাষীদের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়েছিল। একদিকে ছিল জাতির জন্য অত্যন্ত শোকের, অন্যদিকে বাংলাভাষার বাঙালির নতুন করে অভিযাত্রা। সারা গ্রাম বাংলায় একটি চিন্তা-চেতনার পরিবর্তনের সুর বাজছিল। নিরক্ষর কৃষক থেকে শুরু করে উঠতি শিক্ষিত তরুণ সমাজ ছিল খুবই আঘাতপ্রাপ্ত। এরা একটি নতুন জীবনের সন্ধানে উন্মুখ। ধর্মের আবরণে দেশ তথা পাকিস্তানি শাসকদের চরিত্র ও উদ্দেশ্য সাধনে তাদের যে আগ্রাসী হীন ও ঘৃণ্য প্রচেষ্টা সে ব্যাপারে এদেশের মানুষ স্থির সিদ্ধান্তে উপনিত হতে শুরু করে। মানুষের কাছে দেশ, ভাষা ও সংস্কৃতি তথা সবকিছুই পশ্চিমাদের থেকে স্বতন্ত্র প্রতিফলিত হয়েছে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে সেই আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে। এ নির্বাচনে বিজয়ের মাধ্যমে বাঙালি সংস্কৃতির স্থায়ী সনদ পায় বাংলার মানুষেরা।

সারা বাংলার মানুষ সেদিন যুক্তফ্রন্টের পঁচিশ বছরের তরুণ প্রার্থীকে ভোট দিয়েছিল। মুসলিম লীগ প্রার্থী জমিদার, নবাব বংশের অর্থবিত্তশালী প্রার্থীরা মানুষের মাঝে টাকা-পয়সা ছড়িয়ে অথবা ধর্মের দোহাই দিয়েও লাভ করতে পারেনি। মানুষ যে আঘাত পেয়ে প্রতিঘাতের জন্যে অপেক্ষায় ছিল, তা সেই সমস্ত ধর্মান্ধ, উগ্রবাদী, উর্দুভাষী, আশরাফ শ্রেণীর নেতৃবৃন্দ ও বুদ্ধিজীবীরা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

গ্রামের মানুষেরা নিরক্ষর হলেও অধিকাংশ লোকেরা তাদের সন্তানদেরকে লেখাপড়ার জন্য স্কুল, কলেজে পাঠান। সচেতন তরুণ সমাজের নির্বাচনী প্রচারে এই নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবির পর পূর্ব পাকিস্তানী ভাবধারা এবং উর্দুভাষীদের চিন্তা-চেতনা ধুলিসাৎ হয়ে যায়। সারা পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগের দ্বিজাতিতত্ত্বের খান্দানি আশরাফ রাজনীতির দুর্গে আঘাত হানে।

নতুন একটি সমাজ, ব্যবস্থা গঠনের লক্ষ্যে যুক্তফ্রন্টের তরুণ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সন্ধান করেন সাধারণ পরিবার থেকে আসা উঠতি শিক্ষিত তরুণ শ্রেণীটিকে, যাদের দিয়ে সংগঠনের বৈশিষ্ট্য এবং রূপ পরিবর্তন করতে পারবেন।

যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের পর সারা দেশে গ্রাম-বাংলায় বিশেষ করে মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত, কৃষক পরিবারের সন্তানেরা লেখাপড়া শিখে দেশ, ভাষা, জাতি সম্বন্ধে

সচেতন হয়েছে। বিশেষ করে তরুণ সমাজের রক্ত-মাংসে, অস্থি-মজ্জায় মিশে যায় বাংলা, বাঙালিত্ব। সেই সাথে সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক কর্মীরা কবিতা, গান, নাটক, গল্প লিখে প্রচার করে তরুণ সমাজকে মুসলিম লীগের দ্বিজাতিতত্ত্বের রাজনীতির বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। এরাও বাংলা, বাঙালিত্বকে জাগাবার জন্য হাতে কলমে মাঠে নেমেছিলেন। ধর্মভিত্তিক রাজনীতির অবসানের জন্য যুক্তি দিয়ে সচেতন করেছেন। বিশেষ করে একটি বিষয় স্পষ্ট করে তুলতে সক্ষম হন, এ ভূখণ্ডের গ্রাম-বাংলার দরিদ্র কৃষক তথা সাধারণ মানুষের উন্নয়নের জন্য মুসলিম লীগ সরকারই বাধা। বেশির ভাগ নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং গ্রাম থেকে আসা শিক্ষিত সমাজ বুঝতে সক্ষম হলো এই সরকার আমাদের জন্য নয়। এরা উর্দুভাষী নবাব, জমিদার তথা পশ্চিমাদের স্বার্থের অনুকূলে।

তখন শুধু রাজনৈতিক ভাবেই নয়, তখন সাংস্কৃতিক কর্মীদের আন্দোলন এবং এ নিয়ে গান কবিতা, গল্প, উপন্যাস লেখালেখি শুরু হয়ে যায়। সবকিছু মিলে সময়টা ছিল পরিবর্তনের এক মহেন্দ্রক্ষণ। ঠিক এ সময়টার জন্যই যেন শেখ মুজিবুর রহমান অপেক্ষায় ছিলেন। সুযোগ বুঝে একটি ভাষণ দিয়ে বাংলা ভাষাভাষী তরুণ সমাজের কাছে তথা সর্বস্তরের সাধারণ মানুষের কাছে নায়ক হয়ে যাওয়ার সুযোগটি হাতছাড়া করলেন না।

তিনি খুব সূক্ষ্মভাবে কৌশল অবলম্বন করলেন। বগুড়া জেলার তৎকালীন জয়পুরহাট মহকুমায় ছাত্রলীগের এক সভায় পূর্ব পাকিস্তানের পরিববর্তে পূর্ববাংলার নাম প্রস্তাব করলে তরুণ ছাত্র সমাজ পূর্ণ সমর্থন দেয়। ছাত্রসমাজের কাছে বাংলা নামটি খুবই গ্রহণযোগ্য হয়। ছাত্রলীগের সেই ঘটনা থেকেই তিনি উপলব্ধি করলেন ছাত্র সমাজের হৃদয় জয় করে নিতে হলে, তাদের কাছে একক নেতা হতে চাইলে 'বাংলা' নামের ইস্যুকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। ঐতিহাসিকদের মতে, এভাবেই প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তরুণদের ভালোবাসা সঞ্চয় করতে লাগলেন।

যুক্তফ্রন্টের সেই সংসদে নির্বাচিত, জনপ্রিয়, দক্ষ, প্রবীণ, অভিজ্ঞ, উচ্চ শিক্ষিত অনেক নেতাই ছিলেন। যেমন– শেরে বাংলা ফজলুল হক, সোহরাওয়ার্দী, আবুল মনসুর আহমদ, আতাউর রহমান খান, সালাম খান, কফিল উদ্দিন চৌধুরী, মাওলানা তর্কবাগিশ। এক্ষেত্রে কাউকে ছোট করার যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। অনেকেই অনেক গুণে বঙ্গবন্ধুর চাইতে বড় ছিলেন। কিন্তু আলোচিত বিষয় হচ্ছে তিনি যখন ভাবতেন কোন্ কাজটি করা উচিত সেটি তিনি করেছেন নিঃশঙ্কচিত্তে এবং সেটা নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা থেকেই করেছেন। বিশেষ একটি ফলের আশায় যা অন্যান্য নেতৃবৃন্দ অনুধাবন করতে পারেনি, তাই তিনি করলেন। কোন্ কথার

পরিপ্রেক্ষিতে, কোন্ কাজের পরিপ্রেক্ষিতে, এমনকি কোন্ কর্মসূচির পরিপ্রেক্ষিতে জনগণের মাঝে নায়ক হওয়া যাবে, গ্রহণযোগ্য হওয়া যাবে, তাই তিনি করতেন খুবই কুশলতার সাথে।

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মাঝে এটা এক রকম প্রতিযোগিতা। রাজনীতিতে এই প্রতিযোগিতাটাই বেশি চলে। তারপরে থাকে নেতা-কর্মীদের অনুসারী, যাদের সুবুদ্ধি, কুবুদ্ধি নিয়ে নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে থাকেন। সেরকম প্রচ্ছন্ন একটা প্রতিযোগিতায় মনোযোগী ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজে। বিশেষ করে পঞ্চাশের দশকে তা ছিল খুবই বেশি। সে সময়টাতেও সে ধারা অব্যাহত ছিল।

তিনি যখন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হন ১৯৫৩ সাল থেকে '৫৭ সাল পর্যন্ত সহকর্মী, সাথী, নেতৃবৃন্দের মধ্যে খুবই প্রচ্ছন্ন একটা প্রতিযোগিতা ছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই সমস্যাগুলিতে খুব বুদ্ধিমত্তার সাথে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। অবশ্যই এই প্রতিযোগিতা ছিল শেষ পর্যন্ত জাতির স্থপতি হওয়া পর্যন্ত। কারণ ষাটের দশকের শেষ দিকে '৬৯-এর গণআন্দোলনের সময় এদেশে বেশ কয়েকজন প্রবীণ ব্যর্থ-অক্ষম নেতা ছিলেন যারা সর্বদাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে হিংসা করতো। তাদের মধ্যে আবুল মনসুর আহমদ, আতাউর রহমান খান, সালাম খান প্রমুখরা ছিলেন অন্যতম। গণঅভ্যুত্থানের পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এদের ডিঙিয়ে জনপ্রিয়তার শিখরে আরোহন করেন। তখন অনেক নেতৃবৃন্দই ব্যর্থতার হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে যান। কোন্ সময় কি কৌশল অবলম্বন করতে হবে এবং কোন্ সিদ্ধান্ত নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে, তা খুব সুক্ষ্মভাবে চিন্তা-ভাবনা করে নিতেন। এভাবেই তিনি এগিয়ে যাচ্ছিলেন অপ্রতিরোধ্য গতিতে।

মনে হচ্ছে, তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারছিলেন কখন কি করতে হবে। কিভাবে জনপ্রিয়তার শীর্ষে আরোহন করা যায়, তা যেন অনুভব করতে পারছেন তিনি। তাই প্রতিটি পদক্ষেপে তিনি সুকৌশলে সফল হয়েছেন।

হিসাব করে পা ফেলা, জটিল সমস্যাকে সমাধান করে ধীরে ধীরে জনগণকে নিজের মতো করে গড়ার চেষ্টা করেছেন। তিনি যা বলবেন তাই যেন জনগণকে দিয়ে করাতে পারবেন। তাই মোনায়েম সরকার সম্পাদিত 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব : জীবন ও রাজনীতি' গ্রন্থের ৭৫৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন–

> "মানুষকে চেনার ক্ষমতা যেমন বঙ্গবন্ধুর ছিল তেমনি মানুষকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রেও তাঁর কথাবার্তা ছিল খুবই আটপৌরে এবং আকর্ষণ করার মতো ক্ষমতা ছিল তাঁর অসাধারণ। আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার ছয় বছরের মাথায় মূলতঃ তাঁরই উদ্যোগে এবং তাঁর সাংগঠনিক শক্তির কল্যাণে দলটিকে আওয়ামী লীগে পরিণত করা সহজ হয়। ১৯৫৫ সালের মধ্যে আওয়ামী লীগের

অবস্থান সারা পূর্ব পাকিস্তানে জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং শেখ মুজিব মানুষের মনে ঠাঁই করে নেন।"

তৎকালীন আওয়ামী মুসলিম লীগে অনেক সিনিয়র নেতা ছিলেন, যারা সর্বস্তরের মানুষদের সাথে মেলামেশা পছন্দ করতেন না। ধনাঢ্য, উচ্চশিক্ষিত, প্রবীণ নেতৃবৃন্দরা গতানুগতিক ধারার রাজনীতি থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি। অতীতে অভিজাত শ্রেণীর রাজনীতির ধারা ছিল শিরওয়ানী, সালওয়ার পরে মাথায় জিন্নাহ টুপি দিয়ে সদা-সৌখিনভাবে সর্বদাই আভিজাত্যের অহংকার নিয়ে চলাফেরা করতেন। তারা শহর ছেড়ে মাঝে মাঝে গ্রামে আসলেও গ্রামের অভিজাত পরিবারের মিয়াসাব, ভূইয়াসাব, চৌধুরীসাব, তালুকদার সাবদের বাড়িতে আতিথ্য ও আশ্রয়গ্রহণ করতেন। সেখানে ঘরোয়াভাবে সৌখিন লোকদের সাথে হাত মেলাতেন, কথা বলতেন। সাধারণ গ্রামের নিরক্ষর কৃষক শ্রেণীর সাথে হাত মেলাতেন না, এমনকি কথাও বলতেন না। নিজেদের থেকে তাদেরকে আলাদা ভাবতেন। শুধু নির্বাচনের সময় ধর্মের দোহাই দিয়ে, হিন্দু বিদ্বেষী মন্ত্র দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করে ভোট নেওয়ার চেষ্টা করতেন।

এইসব গ্রাম-বাংলার সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ যারা এদেশের পরিচয়ে বেড়ে উঠেছেন, সেই গ্রাম ও শহরের সাধারণ বাংলাভাষী জনগণ যারা স্বপ্ন দেখছিল নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের– তাদের কাছাকাছি যেতে এইসব সৌখিন নেতারা পছন্দ করতেন না। এদিক থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই ব্যতিক্রম ছিলেন। তিনি তথাকথিত সৌখিন নেতা না হয়ে জনগণের আপন মানুষ হতে চাইলেন, তাদের হৃদয়ে প্রবেশ করতে চাইলেন, প্রকৃতই জনগণের নেতা হতে চাইলেন।

তিনি সারা গ্রাম বাংলা ঘুরে মানুষকে প্রস্তুত করতে চেয়েছেন। তিনি মানুষকে সাহসী করে তুলতে শুরু করেন। এরই মধ্যে নিজের সংগৃহীত শিক্ষিত সাহসী যুবকদের সমন্বয়ে দলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন।

পাকিস্তানের স্বৈরাচারী মনোভাবের বিরুদ্ধে সংগঠিত করতে প্রচেষ্টা শুরু করেন। সাহসী-মানসিক শক্তি সম্পন্ন দেশে একদল সাহসী জনসমষ্টি সৃষ্টির লক্ষ্যে তিনি বিভিন্ন দফা ও দাবী দিয়ে কৌশল অবলম্বন শুরু করলেন। কারণ সাহসী দেশপ্রেমিক জনগণ ছাড়া স্বাধীনতা অর্জন ছাড়া সম্ভব নয়, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা তো নয়-ই এমনকি ব্যক্তি স্বাধীনতাও নয়। এ প্রসঙ্গে জ্যাঁ জ্যাক রুশো তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'The social contract, or principles of political right' যা ১৭৬২ সালে রচনা করেন – তাতে উল্লেখ করেন– "সদা সতর্ক সাহসী জনসমষ্টিই পারে গণতন্ত্র ও ব্যক্তি স্বাধীনতা বাঁচিয়ে রাখতে"। তা থেকেই শিক্ষা নিয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব।

তরুণ বয়সেই তিনি সুখী সমৃদ্ধ সমাজ গঠন করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। বাংলার জনগণের সাথে অবাধে মিশতে শুরু করেন। তাদের কাছাকাছি যেয়ে কথা বলতেন। গায়ে কাদামাটি মাখা, ছেঁড়া জামা পরিহিত মানুষদের বুকে টেনে নিয়েছেন। সর্বস্তরের সাধারণ মানুষের সাথে মেলামেশা করে তাদের মনের ভেতরে একটি আলাদা জগৎ দেখেতে পেলেন। তিনি যেন বুঝতে পারলেন– এ জগৎই একদিন বাংলার সাধারণ মানুষের জগৎ হবে। এ জগৎকেই একদিন নাড়া দিতে হবে, জেগে ওঠার মন্ত্র দিতে হবে।

তার ভাবনার আয়নায় প্রতিফলিত হয়েছে যে, হুজুগে পাকিস্তান সৃষ্টি হলেও পূর্ববাংলার বিশাল জনগোষ্ঠী-ই একদিন তাদের রুচি, বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তাদের জীবন-মানের উন্নতির জন্য জেগে উঠবে। কারণ, উঁচুতলার কতিপয় মুসলিম লীগ অবাঙালি নেতাদের রাজনৈতিক দর্শন বা ভাবমূর্তি (image) গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষ যারা সংখ্যায় প্রায় ৯০ জন, তাদের কাছে তখনও গ্রহণযোগ্য হয়নি বা তাদের মানসে স্থান করে নিতে পারেনি। কারণ, হুজুগ অনেকটাই কেটে গেছে। ধীরে ধীরে মোহ ভাঙতে শুরু হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যেন স্পষ্ট দেখতে পেলেন সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশাগুলি। সহজেই চিহ্নিত করতে পারছেন তাদের ক্ষোভগুলি। এদের ভাষা, সংস্কৃতি, স্বতন্ত্র এই জীবন-যাপন, চাল-চলন যা ঐ পাঞ্জাব, করাচির মানুষের সাথে মেলে না। ধর্মে এক হলেও পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমানেরা বাঙালি-মুসলমানদের মুসলমান হিসাবে ভাবতে পারে না। এদেরকে সভ্য মানুষ হিসাবে মানতে চায় না। অবাঙালিদের এই সব আচরণে বাঙালিদের দেশপ্রেমে আঘাত লাগতে শুরু করে। এর মধ্যে কবি, সাহিত্যিকরা দেশপ্রেম, জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে লেখালেখি শুরু করেন।

বাঙালি সংস্কৃতির তীর্থস্থান হচ্ছে এই বাংলা। একে কেন্দ্র করে অনেক লেখা বেরিয়ে আসতে শুরু করে। মীর মোশারফ হোসেন ১৯০৮ সালে 'এসলামের জয়' নামক তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে দেশপ্রেম ও দেশের স্বাধীনতা সম্বন্ধে লেখেন–

"জন্মভূমি কাহার না আদরের– মানুষের তো কথায় নেই– পশুপক্ষী, কীট-পতঙ্গগণও জন্মস্থানের মায়ামমতা বোঝে, আদর-যত্ন করে। নিজের জীবন রক্ষা করতে স্বদেশের স্বাধীনতা রত্ন যাহারা পর হস্তে তুলিয়া দেয় তাহাদের ন্যায় কুলাঙ্গার, দেশবৈরী আর কে হতে পারে?"

ইসলামের জয়গান গাইতে গিয়ে স্বদেশের দেশপ্রেমের অমোঘ বাণী বাংলাভাষীদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন তিনি। এভাবে কবি, সাহিত্যিক, গায়ক, চিত্রকর, তথা সাংস্কৃতিক কর্মীরা পূর্ববাংলাকে আলাদা সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যের ভূখণ্ড হিসাবে

চিত্রিত করতে শুরু করলেন। বেশির ভাগ লেখকই বাংলার সমাজ-সংসার, নদ-নদী, আবহাওয়া, জলবায়ুকে কেন্দ্র করে হৃদয় ছোঁয়া লেখা লিখতে শুরু করেন। ভাষা, জাতীয়তাবাদ বাংলা-বাঙালি এক সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি দেশ-জাতি। পরিপূর্ণ একটি ধ্যান-ধারণা বাংলা ভাষাভাষী মানুষের মনে নতুন করে স্থান পেল।

এতদিন মানুষ ভাবতো রাজনীতিতে ধর্ম একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কিন্তু ১৯৫২ সালে সেই ভাবনাটিই বাঙালিদের মোহভঙ্গ করলো। সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, "কাল মানুষকে পরিবর্তন করে। তবে আঞ্চলিক আবহাওয়া, জলবায়ু, মানুষের কৃষ্টি, কালচার– প্রভাবকে ক্ষীণ করতে পারে না। তা সর্বক্ষণ চালচলনেই প্রকাশ পাবে।"

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জীবন-যাপনের সংস্কৃতিতেও এই পরিবর্তনটুকু গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি একজন দক্ষ সমাজবিজ্ঞানীর মতো পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন– এই ভূখণ্ডের মানুষ পশ্চিমা মুসলমানদের ভাষা, সংস্কৃতি থেকে ভিন্ন। এমনকি তাদের ভূমিতে ভিন্নদেশ, ভিন্ন মানুষ যারা আমাদের আপনজন হবে না কখনোই।

সুদূরপ্রসারি চিন্তার প্রেক্ষাপটে সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রটিকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আঞ্চলিকতা, স্বদেশিকতা থেকেই দেশপ্রেম জন্মলাভ করে। আর এভাবেই স্বপ্ন দেখতে শুরু করে বাঙালি এবং ভাবতে থাকে নিজের ভাষা, সংস্কৃতি, ও ভূখণ্ড নিয়ে। সে ভাবনাই শক্তিশালি ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠনের দিকে এগিয়ে যায়।

'দর্শনের নানা প্রসঙ্গ' গ্রন্থের ১৩০ পৃষ্ঠায় এভাবেই বর্ণনা করছেন উপমহাদেশের প্রবীণ বাঙালি মুসলিম দার্শনিক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ। তিনি লেখেন–

> "বৈচিত্র্যময় ও জীবনের নানাবিদ প্রয়োজনে এভাবেই মানুষের কালচারের বৈচিত্র্য দেখা দেয় এবং এই বৈচিত্র্য থেকে প্রথমে স্বদেশিকতা এবং পরবর্তীতে প্রাদেশিকতার উৎপত্তি হয়। জাতীয় চরিত্র গঠনে তাই পরিবেশের প্রভাব অত্যন্ত শক্তিশালী।"

লেখক, গবেষকদের চিন্তা-ভাবনায় বারবার এসেছে, এমনকি ইসলামি রেঁনেসা– বুদ্ধিজীবীদেরও স্বীকার করতে হয়েছে ভূখণ্ডগত জাতীয়তাকে। আর জাতীয়তাই একমাত্র সংগঠিত করার মন্ত্র, তা তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করলেন। জনমানুষের মধ্যে এই বোধশক্তিকে রাজনৈতিকভাবে জাগিয়ে তুলবার চেষ্টা করলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি জনগণকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে, তাঁর দেওয়া

কর্মসূচি, দফাসমুহই সমাধান করতে পারবে বাঙালির এই রাজনৈতিক সমস্যা। তিনি আরও বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে, বাঙালিদের ভবিষ্যৎ বাঙালিদেরকেই সৃষ্টি করতে হবে। জাতীয়তাবোধ যেহেতু জনগণের শেকড়ে প্রোথিত, তাই তিনি এটাকেই পুঁজি করে সামনে এগিয়ে যেতে লাগলেন।

তিনি আত্মবিশ্বাসী ছিলেন যে, গ্রাম থেকে আসা বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্ররা এই ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের প্রতি আকৃষ্ট হবে। এরা বারশ' মাইল দূরের একটি বিচ্ছিন্ন জাতির শোষণ শাসনে থাকতে চাইবে না বা তাদের শাসন মানবে না। বয়সের কারণে তরুণ সমাজ স্বাধীনচেতা হয়ে থাকে। বিশেষ করে শ্রেণীগত কারণে বিক্ষুব্ধ ছিল তরুণ ছাত্র সমাজ। কারণ, দীর্ঘদিন ধরে একটি বিশেষ শ্রেণীর লোক নেতৃত্ব দিয়ে আসছে। ইউনিয়নের চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে সংসদ সদস্য পর্যন্ত হতেন ঐ শ্রেণীর লোকেরা। সামাজিকভাবে তারা নিজেদেরকে অভিজাত শ্রেণীর ভাবতেন। গ্রামীণ সমাজের সাধারণ পরিবারের সব সন্তান লেখাপড়া করে সচেতন হোক বা প্রতিষ্ঠিত হোক সেটা তারা চাইত না। এই সমস্যাগুলো, শ্রেণী বৈষম্যগুলোই সকল স্তরের মানুষকে মানসিকভাবে বিক্ষুব্ধ করেছিল শাসকগোষ্ঠীর উপর। তাই এরা নিজেদের ক্ষোভ, প্রতিবাদ জানানোর সুযোগ পেল, তথা সংগঠিত হওয়ার সুযোগ পেল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের রাজনৈতিক দলের উপর বিশ্বাস রেখে এগিয়ে যাবার সুযোগ পেল।

অন্যদিকে সাধারণ মানুষকে সংগঠিত করার কাজে বামপন্থী দল গোপনে কাজ করত। তাদের রাজনীতি নিষিদ্ধ ছিল। তাদের কিছু ত্রুটিও ছিল। বিশেষ করে তখনকার মুসলমানদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থকদের সমাজে ধর্মবিদ্বেষী বা নাস্তিক বলে ভাবা হতো। বিশেষ করে কমিউনিস্টরা শ্রেণী সংগ্রামের কথা বলতেন। মার্কস, লেনিনের রাজনৈতিক দর্শনের কঠিন ব্যাখ্যা দিত। রুশ বিপ্লবের ইতিহাস শ্রবণ করানোর চেষ্টা করতেন। শ্রেণী সংগ্রামের তাত্ত্বিক কথা বলতেন। বুর্জোয়া, প্রলেতারিয়েত– এসব কঠিন শব্দের বচন আওড়াতেন। তারা শ্রমিকের কথা বলতেন। সামন্তবাদী ভূস্বামীদের চরিত্র বর্ণনা করতেন। এই সব কঠিন কঠিন শব্দের সাথে পরিচিত ছিলেন না সাধারণ কৃষক তথা গ্রাম বাংলার মানুষ। অন্যদিকে মুসলিম লীগ যারা দেশ, জাতি, ভাষা, সংস্কৃতি বা গ্রাম বাংলার কৃষকদের কথা, বাঙালিদের উন্নতির কথা না বলে শুধু ভারত বিরোধিতা করতো, কারণে অকারণে হিন্দু বিদ্বেষী কুৎসা ছড়াত, ধর্মের দোহাই দিয়ে পূর্ব বাংলার মুসলমানদের অনুগত রাখার চেষ্টা করত, এদেশে চোখে পড়ার মতো অর্থনৈতিক বৈষম্য থাকলেও তারা তা স্বীকার করতো না বরং মিথ্যা প্রচার করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করতো।

এর মাঝে আওয়ামী লীগের তরুণ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মাঝে মাঝে যা বলেন তা এদেশের জনগণের কথা বিশেষ করে তরুণ সমাজের মনের কথা। তরুণদের মনের কথাগুলি যেন তিনি বুঝতে পারছিলেন। খুব সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করে ধাপে ধাপে এগিয়ে গিয়েছেন তিনি। সেই সময়টাতে বাংলার মানুষেরা ছিল হতাশাগ্রস্ত, অসহায়। জনগণ যেন তাদের মনের মানুষ খুঁজছিল তাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা বলার জন্য। একেবারে কাছে পেতে চাচ্ছিল তারা যে কোনো একজন মানুষকে, যিনি বাংলা ভাষাকে ভালোবাসবেন, স্বতন্ত্র সংস্কৃতির, আধাপেটা খাওয়া দরিদ্র কৃষক জনতাকে ভালোবাসবেন, তাদের গৃহ, যা খর বা শন দিয়ে তৈরি তাতে তিনি বসবেন। সুখে-দুঃখে সাথী হবেন, কাদামটি মাখা মানুষগুলোকে বুকে টেনে নেবেন তিনি। এমন কাউকে তারা খুঁজছিল। কারণ, তৎকালীন আওয়ামী লীগের ভেতরে তখন পর্যন্ত কিছু নেতা ছিলেন যারা মুসলিম লীগ থেকে আসা প্রবীণ, অভিজাত পরিবারের। তখন পর্যন্ত তারা শুধুমাত্র দল পরিবর্তন, ক্ষমতা পরিবর্তন এবং মন্ত্রিত্ব পরিবর্তনের রাজনীতিতে নিমগ্ন ছিলেন। এরা অতীত দলের রাজনৈতিক সংস্কৃতি তখনও ভুলতে পারেনি। এই দেশের মানুষের মনে কি দুঃখ-বেদনা রয়েছে, কী চায়, কী তাদের চাহিদা– এইসব নিয়ে ভাবতে খুব একটা সময় নষ্ট করতেন না। তারা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছিল, ভাষা আন্দোলনের একটি ঝাঁকুনির পর যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের প্রতিফল কী হতে পারে? দুটি ধাপে জনগণের চাহিদা কী বা কতটুকুই বা সচেতন হয়েছে, কতটুকু প্রস্তুত– এ নিয়ে সেই নেতারা আদৌ মাথা ঘামাতেন না।

তারা সমস্যার গভীরে ঢুকবার চেষ্টা করতেন না এবং ভষিষ্যতে কী হতে পারে তাও তারা ভাবতেন না। শুধু নিজেদের ভাগ্য বদলের রাজনীতিই করতেন। নিজ পুত্র-কন্যাদের, আত্মীয়-স্বজনদের কিভাবে ভালমতো প্রতিষ্ঠিত করা যায়– সে ভাবনাকেই প্রাধান্য দিতেন। জনগণের বর্তমান, ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা-ভাবনাও করেননি তারা, করার প্রয়োজনও মনে করেননি।

কিন্তু তরুণ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের বিশেষ করে তৎকালীন তরুণ সমাজের মনে ঠাঁই করে নেবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ভাষা আন্দোলনের আঘাত থেকে পরবর্তীতে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের পর বিশাল পরিবর্তন আসে এভূখণ্ডের মানুষের মন-মানসিকতায়। তরুণ সমাজ ভাষাভিত্তিক সংস্কৃতিকে ধারণ করবে– এটি তিনি বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন। জন্মের পর একটি শিশু যা দেখে ও বুঝে বেড়ে ওঠে তাই যৌবনে রক্ত-মাংসে, অস্থি-মজ্জায়, মননে প্রোথিত হয়ে যায়। তা থেকে শুধুমাত্র ধর্মের দোহাই দিয়ে সেখান থেকে মানুষকে ফেরানো সম্ভব নয়। চিন্তা-চেতনাকে ধ্বংস করতে পারে না। সাময়িকভাবে হয়তো

Northern University Library Bangladesh

প্রতারিত হতে পারে, বিভ্রান্ত হতে পারে, তবে তা অস্থায়ী।

মিজান রহমান সম্পাদিত 'বঙ্গবন্ধু' গ্রন্থের ৪৪৩ পৃষ্ঠায় রেহমান সোবহান বলেছেন–

> "পূর্ব বাংলার বাঙালিদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনাকে দৃঢ়মূল করার সাথে সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার দুরদর্শী রাজনৈতিক চিন্তার মাধ্যমে সে চেতনাকে রাষ্ট্রগত বাস্তব রূপ দিয়েছেন এবং সে প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রীয় ভূমিকা রেখেছিলেন। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালিদের অবিনাশী আত্মপ্রকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে, আন্দোলনে যে একাত্ব ছিলেন তা কেবল রাজনৈতিক অভিলাষ বা উচ্চাভিলাষের কারণে নয়। তিনি নিজেও ছিলেন মনে-প্রাণে এই বিকাশধারার একটি অংশ, একটি বিকিরণশীল প্রত্যয়।"

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদগণ বঙ্গবন্ধুর এই কৌশলকে ব্যাখ্যা করেছেন– তিনি নিজে পরিপূর্ণভাবে বাঙালিত্বের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জীবন-যাপন করতেন, সে চরিত্র ধারণ করতেন এবং আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলতে পারদর্শী ছিলেন। তিনি আঞ্চলিক পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান করতেন। সহজে মানুষের সাথে, মানুষের মনকে জয় করার কৌশল ছিল অবাক করার মতো।

এই গাঙ্গেয় বদ্বীপের পলিমাটি ঘেরা নদীমাতৃক বাংলার রূপ এবং তার অধিবাসী মানুষগুলোর চরিত্র, বৈশিষ্ট্য ও স্বভাব নিয়ে অনেকেই গবেষণা করেছেন। অনেক গবেষক ভেজা মাটির মানুষ, কেউ ষড়ঋতুর মানুষ, জোয়ার ভাটার দেশের মানুষ। বছরে ছয়টি ঋতুর মধ্যে চারটি স্পষ্ট। এই ঋতুচক্র নদী মাতৃক কাদা-মাটি, বন-জঙ্গলের মানুষগুলোকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে। আবহাওয়া, জলবায়ু, বিশেষ করে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব মানুষের চরিত্রে থাকে। এই চরিত্র, বৈশিষ্ট্য বা সাহিত্যের ভাষায় বলতে গেলে রক্ত-মাংস, অস্থি-মজ্জায় মিশে থাকে পরিবেশের প্রভাব।

নৃবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীরা এই বাংলা ও তার জনগোষ্ঠীকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, পর্যবেক্ষণ করেছেন। এটাই প্রকৃত বাংলার রূপ। নিরীহ সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ এই রূপের সাথে মিলেমিশে একাকার। কিন্তু তৎকালীন পাকিস্তানি শাসককুল ছিল এই ধারার বিপরীত। তারা কেউ বাঙালি সংস্কৃতির মানুষ হতে চায়নি। এই শ্রেণীর লোকেরা কখনও এদেশকে নিজের দেশ মনে করতো না। ইরান-তুরান থেকে আগত অভিজাত বংশের, কেউ খলিফার বংশের, কেউ মোঘল সেনাপতির বংশের বলে প্রচার করতো। এভাবে নিজেদের বাঙালিত্বের গন্ধটুকু নাকে লাগাতে চাইত না। তৎকালীন সময়ে প্রথম পর্যায়ে ছিলেন মুসলিম লীগের

A-98786

শহরে বসবাসকারী উর্দুভাষী অভিজাত পরিবারের রাজনীতিবিদরা। দ্বিতীয় পর্যায়ে ছিলেন তাদের দোসর বাংলাভাষী মসুলমান নামধারী ধর্মান্ধ একটি দল, যারা শুধু ধর্মবিদ্বেষের কারণে ভারতবিরোধী থাকায় পশ্চিম পাকিস্তানের সরকারকে প্রভু হিসাবে গ্রহণ করেছিল। তাদের কাছে সংস্কৃতি, ইতিহাস, ভাষা, স্বদেশ, কিছুই বোধগম্য ছিল না। এরা ছিল মূলত প্রচারক, প্রাচীনপন্থী ধ্যান-ধারণায় আচ্ছন্ন। শত শত বছর পূর্বের আরব-পারস্যের গল্প, খলিফাদের আমলের গল্প গর্ব করে বলে বেড়াতেন মানুষের কাছে।

এদের শিক্ষা, চিন্তা-ভাবনা, গবেষণা, গভীর ছিল না। সামাজিক, সাংস্কৃতির পরিবর্তন, যুগে-যুগে, সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তন হয়। বিশেষ করে ভূখণ্ডের ভাষা, সংস্কৃতি, প্রাকৃতিক পরিবেশ, আবহাওয়া ও জলবায়ুর ভিন্নতার কারণে মানুষের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য ভিন্ন থাকে। এই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রকৃতির প্রভাব খুবই শক্তিশালী। এক সময় তা সমাজ বিনির্মাণে ও রাষ্ট্র গঠনে প্রভাব ফেলে। কারণ একই ভাষা, সংস্কৃতি, একই ভূখণ্ড, আবহওয়া, জলবায়ুর মানুষের কামনা-বাসনা, রুচি, চাহিদা এক হলে তারা দ্রুত সংগঠিত হয়। আলাদা আলাদা ভূখণ্ডের মানুষের সভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাসও ভিন্ন থাকে।

মধ্যযুগের মুসলিম রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানী ইবনে খালদুন, 'আল মুকাদ্দিমা' গ্রন্থে 'আসাবিয়াত' অধ্যায়ে মত ব্যক্ত করেছেন–

> "জলবায়ুর তারতম্যের হেতু কেবল মানব প্রকৃতিই বিভিন্ন হয় না, ইহার ফলে সভ্যতা, সংস্কৃতি ও শাসন ব্যবস্থার রূপান্তর ঘটে।" তাহার মতে, "নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলেই সভ্যতা, সংস্কৃতি ও শিল্পের চরম বিকাশ ঘটতে দেখা যায়।" ইবনে খালদুনের ভবিষ্যদ্বাণী গভীর, যা আজও প্রতিফলিত হয়।

বাংলাভাষা ও সংস্কৃতি, এদেশের কাদা-মাটি, বন-জঙ্গল, নদী-নালা, ধান, পাট ও সবুজ মাঠের সমারোহ, আবহাওয়া, জলবায়ু তথা বিশেষ ঋতুচক্র সবকিছু মিলে এই ভূখণ্ডের শংকর প্রজাতির শারীরিক গঠনের মানুষগুলোর সাথে পৃথিবীর কোনো দেশের মানুষের মিল নেই। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের মানুষের রুচি, পছন্দ, চাহিদা, পোশাক-পরিচ্ছদ, দৈনন্দিন খাওয়া-দাওয়ার নিয়ম, বিয়ে-শাদী, বিভিন্ন উৎসব সবকিছু মিলিয়ে একটি ভিন্ন সংস্কৃতির জাতি বাঙালি।

এটাকে রাজনৈতিক কারণে, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে কিছু চালাক, চতুর নেতৃবৃন্দ তৃণমূল পর্যায় থেকে ধরে উপরিস্তর পর্যন্ত। এই স্পর্শকাতর বিষয়ে মানুষকে আন্দোলিত করার চেষ্টা করে। ধর্মীয় জিগির তুলে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে দাঙ্গা বাঁধিয়ে দেবার ফলে হাজার হাজার হিন্দু-মুসলমান নিহত হয়। বিশেষ

করে ভারত বিভাগের সময় এই আগুন তীব্রভাবে জ্বলে ওঠে। আর এই দাঙ্গার কারণে কৌশলে ফায়দা লুটে নেয় উভয় ধর্মের ধর্মান্ধ উগ্র রাজনৈতিক গোষ্ঠী। এরই উত্তাপে দুই বাংলার বাঙালিদের দ্বিধা-বিভক্তিতে অনেক দিন ধরে রাজনীতির মাঠ উত্তপ্ত থাকে। যার জন্য দেশ বিভাগের পরে ১৯৪৯ সনের ২৩ জুন আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। দলের নামটি আওয়ামী মুসলীগ রাখা হয় এই কারণে যে, তখন পর্যন্ত পাকিস্তান আন্দোলনের অনেক সমর্থক ছিলেন। তৎকালীন পরিস্থিতি বিবেচনায় সদ্য প্রতিষ্ঠিত দলটিকে ভারতঘেঁষা, হিন্দুঘেঁষা বলে মুসলমান নামধারী ধর্মীয় উগ্রবাদীরা যাতে অপবাদ দিতে না পারে সেজন্যই আওয়ামী শব্দের সাথে মুসলিম শব্দটি সংযুক্ত করা হয়। তাছাড়া মুসলিম লীগের চেয়ে অপেক্ষাকৃত বঞ্চিত, প্রগতিশীল নেতৃবৃন্দরাই সদ্য পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করে। এই দলেরই প্রতিষ্ঠাতা যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

তখন পর্যন্ত ১৯৪৬ সালের হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার রেশ ছিল। দাঙ্গার ভয়াবহ স্মৃতি অনেককেই প্রতিনিয়ত তাড়িত করতো। আর সে কারণেই পাকিস্তানের মুসলমান জনগণের মাঝে তখনও হিন্দুবিদ্বেষী মনোভাব ছিল। সেই সময়ে জনগণ তথা মুসলিম লীগ যাতে সদ্য প্রতিষ্ঠিত নতুন দলটিকে কোনো ধর্মীয় অপবাদ দিতে না পারে সেজন্য মুসলিম শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছিল।

১৯৪৯ সনের মুসলিম লীগ সরকারের অধীনে উপনির্বাচনে টাঙ্গাইলের তরুণ নেতা শামসুল হকের নিকট মুসলিম লীগ প্রার্থী জমিদার খুররম খান পন্নির পরাজয় বরন করেন। সেই উপনির্বাচনে ১৫০ নং মোগলটুলির তরুণ বন্ধুদের নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলা ভাষাভাষী তরুণ ছাত্রসমাজ সরকারবিরোধী প্রার্থী শামসুল হকের পক্ষে প্রচারণা চালায়। ১৯৪৮-এর ভাষা আন্দোলনে নির্যাতিত, বিক্ষুব্ধ ছাত্রসমাজই এই নির্বাচনের কর্মী হিসাবে ঘরে ঘরে প্রচারণা চালায়।

নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আসা শিক্ষিত যুবসমাজ ভাষা-সংস্কৃতি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠেন। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য একদিকে যেমন রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু হয় অন্যদিকে লেখক, গায়ক, সাংবাদিক, চিত্রকররা তাদের নিজ নিজ শিল্প ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের দ্বারা মানুষকে সচেতন ও সংগঠিত করে তোলে। অবশ্য বাংলা, বাঙালি নিয়ে কবি নজরুল চল্লিশের দশকেই লেখেন। তিনি বাঙালি জাতিকে অলস জাতি হিসাবে দেখতে চাননি। তিনি অতীতের গৌরবগাঁথা ইতিহাস মনে করিয়ে দিয়ে শিক্ষিত, সচেতন, সাহসী বীরের জাতিতে রূপান্তরিত হতে কামনা করেছেন।

ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে ইংরেজ খেদাও আন্দোলন শুরু হলেও, বিদ্রোহী কবি নজরুল ইংরেজদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট লিখলেও, সাথে সাথে বাংলা ভাষাভাষী বাঙালি জাতির জাগরণ চেয়েছিলেন। স্বতন্ত্রভাবে বাঙালিদের বিশ্বে গৌরবের জাতিতে রূপান্তরের চেষ্টা করেছেন। তিনি চেয়েছেন বাঙালির জয়। তাইতো আমাদের বাংলা সাহিত্যের বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম 'বাঙালির বাংলা' প্রবন্ধে লিখেছেন–

> "আজ আমাদের আলস্যের কর্ম বিমুখতার পৌরুষের অভাবেই আমরা হয়ে আছি সকলের চেয়ে দীন। যে বাঙালিরা সারা পৃথিবীর লোককে দিনের পর দিন নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতে পারে তারাই আজ হচ্ছে সকলের দ্বারে ভিখারী। যারা ঘরের পাশে পাহাড়ের অজগর, বনের বাঘ নিয়ে বাস করে তারা আজ নিরক্ষর। বিদেশীদের দাসত্ব করে। শুনে ভীষণ ক্রোধে হাত মুষ্ঠিবদ্ধ হয়ে উঠে। সারা দেহ মনে আসে প্রলয়ের কম্পন। সারা বক্ষ মন্থন করে আসে অশ্রুজল। হায় তারা এই অপমান, এই দাসত্ব, বিদেশী দস্যুদের এই উপদ্রব, নির্যাতন কি করে সহ্য করে?"

তাই তিনি স্পষ্ট করে লিখলেন– "বাঙালিকে বাঙালির ছেলে-মেয়েদের ছেলে বেলা থেকে শুধু এই মন্ত্র শেখাও–

এই পবিত্র বাংলা, বাংলাদেশ, বাঙালির।
আমাদের দিয়া প্রহারেন ধনঞ্জয়
তাড়াব আমরা করিনা ভয়।
যত পার দেশী দস্যু ডাকাত
রামাদের গামারের
বাংলা বাঙালির হউক।
বাংলার জয় হউক
বাঙালির জয় হউক।"

মীর মোশারফ হোসেনের 'এসলামের জয়' গ্রন্থের নাম দিয়ে এই 'জয়' শব্দটির ব্যাপক প্রচলন শুরু হয়। বাঙালি মুসলমান লেখকরা জয় শব্দটি উচ্চারণ করেন গভীর আবেগ ও ভালোবাসায়। বাঙালির প্রকৃত মনের কথা, বৈশিষ্ট্যের কথা, গভীরভাবে উপলব্ধি করেই তিনি বাঙালির জয় কামনা করেছেন। ভষিষ্যতের যে ছবি তিনি এঁকে দিয়েছেন তাই বাস্তবায়ন করেছে বাঙালিরা আন্দোলন সংগ্রামের মাধ্যমে। তথাকথিত ইসলামি দল এবং কিছু ধর্মান্ধ মুসলমান লেখক কবি নজরুলকে হিন্দু রবীন্দ্রনাথের প্রতিপক্ষ হিসাবে দাঁড় করিয়ে জন্ম ও মৃত্যুদিবসে তাঁর রচিত কিছু ইসলামী গান, কবিতা আওড়াতে থাকেন। কিন্তু তারা খুব ভালো

করে জানেন নজরুল তাদের পূর্বসুরি মুসলিম লীগ নেতা মাওলানা আকরাম খাঁ সম্পাদিত পত্রিকা 'আযাদ' নজরুলকে কাফের বলে আখ্যা দিয়েছিল। তিনি ছিলেন ধর্মীয় রাজনীতির বিরুদ্ধে, মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে। আর ছিলেন বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী।

প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মীরা বিশেষ করে তরুণ লেখকদের একটি দল যারা সাধারণ পরিবার থেকে উঠে এসেছিল, তাদের দলবদ্ধ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, কবিতা, গান, নাটক, গল্প, উপন্যাস, তথা প্রবন্ধ ধারাবাহিকভাবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম বাঙালিত্বকে লেখার মাধ্যমে জাগিয়ে তুলেছিল। পরবর্তীতে এই উঠতি শিক্ষিত তরুণ সমাজই বাঙালি জাতীয়তাবাদের সমর্থক, কর্মী হিসাবে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে বাংলার মানুষকে জাগিয়ে তোলে। এরা একদিকে ইতিহাস পড়ে সচেতন হয় অন্যদিকে বাস্তব সমস্যা পাকিস্তানিদের অবহেলা, বঞ্চনা, বৈষম্য তাদের মনে করিয়ে দেয় এরা ভিনদেশী। এরা কখনও আমাদের ভাল চোখে দেখে না। শুধুমাত্র ধর্মের দোহাই দিয়ে বাঙালিদের ঘুম পাড়িয়ে রাখে, অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করতে থাকে। পর্বত অধ্যুষিত ইসলামাবাদকে রাজধানী করার জন্য হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করতে থাকে। অথচ পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের জন্য শিক্ষা, চিকিৎসা, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে যা ব্যয় করা হয় তা পাকিস্তানের একটি জেলারও সমান নয়। একদিকে অর্থনৈতিক এই বৈষম্য, অন্যদিকে নিজেদের দৈহিক গড়ন, চেহারা, ভাষা সংস্কৃতি, পোশাক-পরিচ্ছদ তথা চালচলনের পার্থক্য স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। এই চিন্তা-চেতনা তরুণদের মনে প্রোথিত হয়েছিল দৃঢ়ভাবে।

ধীরে ধীরে এই ভূখণ্ডের মানুষের মন থেকে পাকিস্তান, মুসলিম লীগ ইত্যাদি ভাবধারা উঠে যেতে থাকে।

শহরে অভিজাত, শিক্ষিত, ধর্মান্ধ মুসলমান ছাড়া গ্রামের হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রীতি ছিল অবাক করার মতো। দু'একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া কালক্রমে বিশেষ করে গ্রামের কৃষক, হিন্দু ও মুসলমানরা ছিল সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ। এইসব ভ্রাতৃত্বের সম্প্রীতির নিদর্শনের তথ্য পাই লোকগীতির কিংবদন্তি গায়ক বাউল শাহ আবদুল করিমের বিখ্যাত জনপ্রিয় গান থেকে। এই গানই প্রমাণ করে গ্রামের হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতির কথা :

আগে কি সোন্দর দিন কাটাইতাম
গ্রামের নওজোয়ান, হিন্দু-মুসলমান
সবাই মিলে ঘাটু গান আর বাউলা গান গাইতাম।
আগে কি সোন্দর দিন কাটাইতাম।

হিন্দুদের নিমন্ত্রণে গ্রামের মুসলমানরা যেত। হিন্দুরা আসতো মুসলমানদের উৎসবে। সেসব কথা বর্ণিত হয়েছে গানে।

এছাড়া বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম পাকিস্তানের ধারণাকে ফাঁকিস্তান বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। তিনি একবার নির্বাচনও করেছিলেন মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে। ফরিদপুরে ধর্মান্ধ মুসলিম লীগ কর্মীরা তাঁকে জনসভা পর্যন্ত করতে দেয়নি। অন্যান্যদের মতো তিনি আরব-পারস্যের লোক বলে হৃদয়ে কখনো পোষণ করেননি। ফার্সিভাষী বা উর্দুভাষী আশরাফ বংশের লোক বলে নিজেকে জাহির করার চেষ্টা করেননি বরং সর্বহারার জয়গান গেয়েছেন। কৃষকদের নিয়ে সংগঠন করেছেন। ধর্মান্ধদের ব্যঙ্গ করে কবিতা লিখেছেন। তিনি খুব কাছে থেকে উপলব্ধি করেছেন এইসব মূর্খতাকে। এরা যুগ পরিবর্তনের হাওয়াকে বুঝতে পারেনি। তারা নিম্নধরনের চিন্তা-ভাবনা মনে লালন করতো। কত উপলব্ধি থাকলে এই ধর্মান্ধ গোঁড়া রক্ষণশীল গোষ্ঠীর ধ্যানধারণা সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন–

"বিশ্ব যখন এগিয়ে চলে আমরা তখন বসে
বিবি তালাকের ফতুয়া খুঁজি ফিকাহ হাদিস চষে।"

যেখানে বিশ্ব জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা করে, কারিগরী-প্রযুক্তির মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে ঠিক তখনও ঐসব ধর্মান্ধ গোষ্ঠী সাম্প্রদায়িক চিন্তায় মগ্ন থাকতো। তখন নজরুল বলেন–

"হিন্দু না মুসলিম জিজ্ঞাসে কোন জন
কাণ্ডারি বল– ডুবিছে সন্তান মোর মার-"

এছাড়া বিদ্রোহী কবি বাংলার জয়গান গেয়েছেন তার সাথে গেয়েছেন এদেশের গরীব খেটে খাওয়া কুলি, মজুর, কৃষকদের কথা। তিনি সর্বদাই সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের জয়গান গেয়েছেন।

ব্রিটিশ শাসনের বিরোধিতা নয় বরং সহযোগিতা– এই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগ গঠিত হয়। ইংরেজ শাসনে মুসলমানদের সহযোগিতার মনোভাব পোষণ করে এক শ্রেণীর মুসলমান নবাব জমিদারদের ইংরেজ প্রীতি বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বসবাসকারী নবাব, জমিদারগণ মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার জন্য ঢাকায় ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করেন। ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হলেও এই দল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অবাঙালি উর্দু ও ফার্সিভাষী ভারতের ইংরেজ প্রিয় নবাব, জমিদারগণ। তারা ব্রিটিশদের বিরোধিতা করার চাইতে কংগ্রেসের হিন্দু জমিদার ব্যবসায়ীদের চেয়ে বেশি

সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার জন্য ইংরেজদের সমর্থনে অবাঙালি মুসলমানরা মুসলিম লীগ সংগঠন সৃষ্টি করে। এর সাথে যুক্ত ছিলেন ভারতের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অবাঙালি উর্দুভাষী মুসলমানরা যাদের অধিকাংশই ছিল ইংরেজদের তোষামোদকারী নবাব, জমিদার তথাকথিত মুসলিম মধ্যবিত্ত পরিবারের উঠতি আশরাফ শ্রেণীর লোকজন। তারা নিজেদেরকে পারস্য, ইরান-তুরান, আরব থেকে আসা সহি অভিজাত শরীফ মুসলমান ভাবতেন। অন্যদিকে এদেশের গ্রামের খেটে খাওয়া বাংলা ভাষাভাষী মুসলমান, যারা সংখ্যায় ছিলেন বেশি তাদেরকে নিচ বলে অবহেলা করা হতো। তাদেরকে ঘৃণা করে বলা হতো মিসকিন বা আতরাফ।

এই মুসলিম লীগের প্রতি ইংরেজদের সহানুভূতি ছিল কংগ্রেসের কারণে। একক দল কংগ্রেসের রাজনীতির সাথে মোকাবেলা করার জন্য কৌশলে মুসলিম লীগের পৃষ্ঠপোষকদের উৎসাহিত করলেন একটি ভারসাম্য অবস্থা সৃষ্টির জন্য। এই মুসলিম লীগের অবস্থা এবং বৈশিষ্ট্য, চরিত্র বিচার বিশ্লেষণ করে তুলে ধরেছেন উপমহাদেশের স্বনামধন্য লেখক, দার্শনিক, লন্ডনের অক্সফোর্ডের আলোচিত মেধাবী ছাত্র, ভারতীয় কেন্দ্রীয় সাবেক মন্ত্রী অধ্যাপক হুমায়ূন কবির।

১৯৪৩ সালে 'ধারাবাহিক' গ্রন্থের প্রবন্ধে তৎকালীন মুসলিম লীগ বা ঐ শ্রেণীর মুসলমানদের চরিত্র বর্ণনা করেছেন এভাবে–

"যে মুসলিম লীগ ছিল প্রকৃতপক্ষে উচ্চ শ্রেণীয় অবাঙালি উর্দুভাষী মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার দল, মুসলমানদের ধর্মীয় বা অন্য কোন স্বার্থ রক্ষা করার জন্য নয়। এবং ১৯০৬ সালের পর থেকে ইংরেজ যে, কিছুটা মুসলিম প্রীতি দেখালো তার কারণ তারা হিন্দু মধ্যবিত্তের কংগ্রেসকে ভীতির চোখে দেখেছিল।"

অধ্যাপক হুমায়ূন কবিরের বিশ্লেষণই নয়, এসব কারণে শেরে বাংলা ফজলুল হক 'কৃষক প্রজা' দল গঠন করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত দেশ ভাগের সাথে সাথে মুসলিম লীগের এই চরিত্র বৈশিষ্ট্যের কারণে মাওলানা ভাসানী উক্তি করেছিলেন–

"মুসলিম লীগ এখন খাজা গজাদের হাতে চলে গেছে। এদের দিয়ে বাঙালি মুসলমানের কিছু হবে না, তা নিশ্চিত হয়ে গেছে।"

এসব ফার্সি এবং উর্দু ভাষাভাষী পরিবারের সদস্য যারা মুসলিম লীগের নেতৃত্বে বহাল ছিলেন তারা সর্বদাই বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিপক্ষে ছিলেন। অন্যদিকে কিছু ধর্মান্ধ বাংলা ভাষাভাষী মুসলমান তাদের সমর্থক হিসাবে নিজেদেরকে অভিজাত বংশে রূপান্তর করার লক্ষ্যে মুসলিম লীগের রাজনীতিকে সমর্থন করে।

এরা নিজেদের ব্যক্তিগত ভাষা ও সংস্কৃতি এদেশে জোর করে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল। বৃহৎ বঙ্গের শতকরা ৯৫ জন মানুষের কথা তারা ভাবতো না। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষা-সংস্কৃতির কথা ভেবে একটি রাজনৈতিক কৌশল নির্ধারণ করেন। পরিবর্তনশীল মন মানসিকতায় যুব সমাজকে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে ধর্মান্ধ রাজনীতি পরিবর্তন করার মানসে দলের নাম পরিবর্তন করার চিন্তা করলেন। বাংলা ভাষাভাষী ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ'-কে সার্বজনীন দলে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে মুসলিম শব্দটি বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

১৯৫৫ সালের ২২ সেপ্টেম্বর আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেওয়া প্রস্তাব করা হয়। অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক কর্মীবহুল সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সাদরে এ প্রস্তাব গ্রহণ করেন। কারণ, এরই মধ্যে বাঙালির ভুল ভেঙে গেছে। এরা পাকিস্তান সরকারের রূপ দেখেছে, বুঝতে পেরেছে তারা ধর্মীয় শব্দ শুধু শোষণ করার কৌশল হিসাবে ব্যবহার করে। জনগণের এই পরিবর্তনের দিকটা মুসলিম লীগ থেকে আসা সিনিয়র নেতারা উপলব্ধি করতে পারেননি। বিশাল জনগোষ্ঠীর পরিবর্তনশীল অনুভূতির সাথে তারা পরিচিত ছিলেন না। কিন্তু সেটা সূক্ষ্মভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন প্রজ্ঞাবান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সংখ্যাগরিষ্ঠ তরুণদের সমর্থনের জোয়ারে প্রবীণেরা চুপ রইলেন।

আওয়ামী মুসলিম লীগকে 'আওয়ামী লীগ'-এ রূপান্তরিত করে গণমানুষের সংগঠনে পরিণত করার সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সংগঠনকে এভাবে গণমানুষের সংগঠনে পরিণত করার জন্য দলের ভেতর তরুণদের সাথে সাথে উদারপন্থীরাও বড় ভূমিকা পালন করেন। তারা সহজেই একটি দলকে অসাম্প্রদায়িক দলে রূপ দিলেন। বাংলাদেশের সাধারণ কৃষক বা খেটে খাওয়া মানুষ সব সময়ই অসাম্প্রদায়িক। তাই যখনই দলে তাদের সংখ্যা বেশি হয়েছে তখনই সম্ভব হয়েছে দলকে অসাম্প্রদায়িক সংগঠনে পরিণত করা।

ভূখণ্ডগত সংস্কৃতির জোয়ার যে বইবে তা তিনি আঁচ করতে পেরেছিলেন। বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন আন্দোলন শুরু হয়। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের ইশতেহারে বাংলা, বাঙালিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। সেখানে কোনো ধর্মীয় রাজনীতিকে জনগণ বর্জন করে। এই নির্বাচনে একটি সামাজিক বিপ্লব ঘটে যায়, দ্বিজাতি তত্ত্বের কবর রচনা হয়। ধর্মভিত্তিক রাজনীতির পরিবর্তে জাতি ভিত্তিক রাজনীতি সৃষ্টি হয়।

কবির চৌধুরী সম্পাদিত, 'বঙ্গবন্ধু - জননায়ক থেকে রাষ্ট্রনায়ক' গ্রন্থের ১৬৭

পৃষ্ঠায় তিনি এভাবেই বর্ণনা করেছেন–

> "১৯৫৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভাসানী, সোহরাওয়ার্দী ও শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগ যে মুহূর্তে অসাম্প্রদায়িক দলে পরিণত হয়ে হয় আওয়ামী লীগ তখন থেকে আওয়ামী লীগ জনপ্রিয় দলে পরিণত হয়।"

১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী ক্ষুব্ধ কারা– নির্যাতিত তরুণ নেতৃবৃন্দ ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী দক্ষ সংগঠক নেতৃবৃন্দ যারা বাংলা কংগ্রেস পার্টি গঠনে নিয়োজিত ছিলেন তাদের অনেক স্থানীয় নেতা-কর্মী আওয়ামী লীগে ভিড়তে থাকে। দু'টি দলের বিশেষ করে বাংলা কংগ্রেস এবং কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী সংগ্রহ ও দল গোছানোর উৎসাহে অনেকটা ভাটা পড়ে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এই কৌশলগত রাজনীতির কারণে আওয়ামী লীগ অতি দ্রুত একটি অসাম্প্রদায়িক জনপ্রিয় দলে পরিণত হতে থাকে। অন্যান্য ধর্মের লোকেরা অর্থাৎ হিন্দুরা দলে দলে যোগদান করার সুযোগ পেল। কারণ তখনও হিন্দু জনসংখ্যার আধিক্য ছিল। শুধু তাই নয়, এরা যেমন ছিলেন শিক্ষিত ও মেধাবী তেমনি ছিলেন আর্থিকভাবে সচ্ছল। সেই সময় এই সিদ্ধান্ত না নিলে হয়তো আওয়ামী মুসলিম লীগ, মুসলিম লীগের মতো একটি ধর্মভিত্তিক দল হিসেবেই থাকতো যা পূর্ববাংলার মানুষের কাছে অসহনীয় হয়ে পড়তো। তাই জনগণের চাহিদানুযায়ী দলের নাম হওয়াতে নতুন প্রগতিশীল মনের শিক্ষিত লোকেরা দলে দলে আওয়ামী লীগে যোগদান করতে লাগল।

যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে জয়ী হওয়ায়, বাঙালি জাতীয়তাবাদের পুনর্জাগরণের লক্ষণ দেখে পাকিস্তানের শাসক শ্রেণী প্রমাদ গুনল। অবশ্যই ১৯৫২ সালে দ্বিজাতি তত্ত্বের রাজনীতির প্রতি বাঙালির মোহভঙ্গ হতে শুরু করে। রাজনীতির এই পরিবর্তনটুকু বাংলাদেশের তাত্ত্বিক রাজনীতিবিদগণ উপলব্ধি করতে পারেননি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই সুচিন্তিত পদক্ষেপের মাধ্যমে রাজনৈতিকভাবে সফলতা অর্জন করতে পেরেছিলেন। বয়সে তরুণ হলেও তিনি পাকিস্তান সরকারের কাছে প্রবীণ দক্ষ নেতৃবৃন্দের চেয়েও বেশি প্রতিপক্ষ, অন্যদিকে দক্ষ সংগঠক ও প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন।

বাংলার মানুষকে দাবিয়ে রাখার জন্য ৯২-এর ক ধারা জারি করে পাকিস্তান সরকার দমন-পীড়ন নীতির পথ বেছে নেয়। এর তাৎপর্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ধরতে পেরেছিলেন। তার সম্পর্কে পূর্ববাংলার গভর্নর ইস্কান্দার মির্জা, পাকিস্তানের তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদকে প্রেরিত গোপন রিপোর্ট লেখেন। তা শামসুল হুদা হারুন রচিত 'The making of the Prime

Minister H.S. Suhrawardy' গ্রন্থের ২০০১ পৃষ্ঠা থেকে নিচে উদ্ধৃত করা হলো–

> 'SHEIKH MUJIB-UR-RAHMAN has been prisoned several times, is a remarkably good organizer, has guts, holds extreme views in politics, is an experienced agitator, maybe described as the stormy patriot of the Awame League, a dangerous gentle man who is the best in jail.'

যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে, প্রচারণার মাধ্যমে সেদিনের প্রবীণ ঝানু রাজনীতিবিদরা বাংলার সাধারণ মানুষ, গ্রামের দরিদ্র কৃষকের জীর্ণ কুটির থেকে শুরু করে শহরের মধ্যবিত্ত উঠতি শিক্ষিত সমাজকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছিলেন, বুঝিয়েছিলেন বা সফলভাবে সক্ষম হয়েছিলেন যে মুসলিম লীগের বেশির ভাগ নেতাই উর্দুভাষী, খান্দানি অভিজাত, নবাব, জমিদারদের বা নতুন শৌখিন খান্দানি এসব মানুষ তোমাদের জন্য নয়। তারা তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থে, ক্ষমতার স্বার্থে শুধু নির্বাচন এলে ধর্মের জন্য কান্নাকাটি করে। ধর্মের দোহাই দিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ এনে ভোট পেতে চায়। কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবনমানের উন্নতি, দরিদ্র মানুষের কর্মসংস্থান, কৃষকদের সুযোগ-সুবিধার জন্য জীবনে কিছুই করবে না তারা। অতীতের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়, ধর্মের দোহাই দিয়ে ভোট নিয়ে ক্ষমতায় গিয়েছিল ঠিকই কিন্তু বর্ণ হিন্দুদের ব্যবসা, চাকুরি, জায়গা-জমি, সবকিছুই হস্তগত হয়েছিল মুসলিম লীগের সমর্থকদের। সাধারণ মানুষের কোনো লাভ হয়নি। গঞ্জে, হাটে-বাজারে, বড় বড় মহাজনি ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে, সরকারি লোভনীয় চাকুরিতে, পানির দামে হিন্দুদের জায়গা-জমি কেনা– সবদিক থেকে লাভবান হয়েছে তারা। কিন্তু সাধারণ গ্রামের কৃষক, ক্ষুদ্রব্যবসায়ী, নিরক্ষর খেটে খাওয়া মানুষগুলোর কোন লাভই হয়নি। তারপর বড় একটি আঘাত বাংলা ভাষার উপরে আসে, সেটি একেবারে রূপকথার মতো– গ্রাম-বাংলার ঘরে ঘরে শোকের ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়।

ঠিক সেই মোক্ষম সময়ে জনগণের দৈনন্দিন পরিবর্তনগুলি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গভীরভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন। এ পরিবর্তন চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন, রুচি ও বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন, সর্বোপরি রাজনৈতিক কারণে সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিবর্তনই বেশি প্রতিফলিত হচ্ছিল। ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সমর্থনকারী স্কুল-কলেজের ছাত্রদের মধ্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন চোখে পড়ে। সেই পরিবর্তনকে অংক কষে হিসাব করে দেখলেন যে, এ শ্রেণীটিই হবে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে সমাজের মুখপাত্র। এরাই হলো সচেতন নাগরিক যাদের কথা নিরক্ষর বাঙালিরা গুরুত্ব দিবে। এরাই পাকিস্তানের ধর্মভিত্তিক রাজনীতির অসারতা তুলে

ধরবে এবং তারাই আগামীতে নেতৃত্ব দেবে। বিশেষ করে ১৯৫২'র ভাষা আন্দোলন ও ১৯৫৪'র যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন থেকে হিসাব মেলালেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

নির্বাচনে একদিকে বাংলা ও বাঙালির দর্শন স্পষ্ট হয়েছে, অন্যদিকে ধর্মান্ধ উগ্রবাদী গোষ্ঠীর মোহ ভাঙতে শুরু হয়েছে। এ নির্বাচনের পরই জেগে উঠেছে একটি তরুণ শিক্ষিত ছাত্রসমাজ। মোটামুটি সময় এসেছে, পরিবর্তনকে গ্রহণ করার মানসিকতায় প্রস্তুত হয়েছে। বিশেষ করে গ্রাম থেকে আসা শিক্ষিত তরুণ সমাজ বুঝতে সক্ষম হয়েছিল ধর্মীয় রাজনীতি ভেলকিবাজির রাজনীতি ছাড়া আর কিছুই নয়।

হাজার বছরের একটি জাতির ভাষাকে ধ্বংস করতে চায়, পাকিস্তানি শাসকদের এই ঔদ্ধত্য বাংলার জনগণকে ক্ষিপ্ত করে দেয়। বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে বাঙালি। বিশেষ করে বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মীদের গোপন তৎপরতাও জনগণকে সজাগ ও সচেতন করার জন্য যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে। গোপনে ছদ্মবেশে গ্রামে পালিয়ে থেকে, ছদ্মনামে লজিং থেকে শিক্ষক সেজে মানুষের কাছে মুসলিম লীগের উগ্রবাদী রাজনীতি, দ্বিজাতিতত্ত্বের অসারতা তুলে ধরতেন। এর বিরুদ্ধে গোপনে ঠাণ্ডা মাথায় সাধারণ মানুষের সাথে মিশে পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে ধর্মকে ব্যবহার করার উদ্দেশ্য তুলে ধরতেন। আরেক দিক ছিল, কৃষকদের সংগঠিত করতে তাদের রাজনৈতিক দর্শনে জোতদার, জমিদারদের চরিত্র, বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতেন তারা। জোতদার, জমিদার, নবাব এবং শহরের ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ একই শ্রেণীভুক্ত পাকিস্তান সরকারের বা মুসলিম লীগের পৃষ্ঠপোষক। এদের দ্বারা গ্রামের কৃষক শ্রেণীর কোনো উপকার হবে না। বরং এরা ধর্মের নামে পাকিস্তানকে টিকিয়ে রাখতে চান।

এদেশের কৃষকের ঘাম ঝরানো পরিশ্রমে উৎপাদিত পাট বিদেশে রফতানি করে অর্জিত জাতীয় আয়ের বেশির ভাগ অর্থ ব্যয় করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নতির জন্য। শস্য শ্যামল এই বাংলার মাঠ-ঘাট ফসলে ভরপুর। ধান, পাট, চা, আলু, ডাউল, পিঁয়াজ, মরিচ, মশলা, সরিষার তৈল যেভাবে এই বাংলার কৃষক মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উৎপন্ন করে সেভাবে পশ্চিম পাকিস্তানিরা করে না, করতে পারে না। অন্যদিকে মরুময় পার্বত্য এলাকা পাকিস্তানে তখন পাট উৎপন্ন হতো না। ধান, তরিতরকারি কিছুই উৎপন্ন হতো না। পাকিস্তানিরা এদেশের কৃষকের উৎপাদিত পণ্য খাদ্যসামগ্রী কম মূল্যে ক্রয় করবার সুযোগ পেতো। ঐতিহাসিক ড. মহসিনের ভাষায়– "ঊষর মরু, পাহাড়-পর্বত, উপত্যকা এলাকায় গম ছড়া তরিতরকারি, ধান-পাট, তথা অর্থকরী ফসল কিছুই হতো না।"

কিন্তু তখনো বাংলায় বিশেষ করে পূর্ব বাংলায় একটি প্রবাদ প্রচলিত ছিল– "গোলাভরা ধান, পুকুর ভরা মাছ আর গোয়াল ভরা গরু।" ফসল সমৃদ্ধ বাংলার অনেক ইতিহাস ঐতিহ্য ছিল। মধ্যযুগের অনেক ভ্রমণকারী পর্যটকের ভ্রমণ কাহিনীতেও বারবার প্রতিফলিত হয়েছে সুজলা-সুফলা বাংলার সমৃদ্ধির কথা। সে ইতিহাস বাংলার মানুষ ধারণ করতো এবং তার সৃষ্টিকারী ছিলেন গ্রাম-বাংলার বাংলাভাষী সংস্কৃতির কৃষক সমাজের সাধারণ মানুষেরা।

এদের এই সুখকে কেড়ে নেওয়ার জন্য ষড়যন্ত্র করতে থাকে ইরান-তুরান থেকে আগত আশরাফ নামধারী উর্দুভাষী তথাকথিত মুসলমান, যারা নিজেদেরকে উচ্চ বংশীয় এবং মর্যাদার অধিকারী বলে ভাবতেন। তাদের বেশির ভাগই শহরে বসবাসকারী, সুযোগ সন্ধানী, উপাধিধারী, মুসলিম লীগ সমর্থক নেতৃবৃন্দ। এরা গ্রামের বাংলাভাষী কৃষকদের ভোট নিতেন ধোঁকা দিয়ে হিন্দুবিদ্বেষী ও ভারতবিদ্বেষী কিস্‌সা কাহিনী ছড়িয়ে।

মন দিয়ে কৃষকদের সাথে তারা মিশতেন না। কৃষকদের ঘরে পানি পর্যন্ত খেতেন না। এদের অবহেলা, ঘৃণা করতো তারা। এই তথাকথিত দলটিকে যারা শুধু পূর্ব পাকিস্তান নয় পশ্চিম পাকিস্তানেও ছিল তাদেরকে সমাজবিজ্ঞানীরা মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বলে অভিহিত করেছেন। তখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দৃষ্টি পূর্ব পাকিস্তানে নয়, সারা পশ্চিম পাকিস্তানের বিশেষ একটি শ্রেণীর বিরুদ্ধে ছিল, যে শ্রেণীটি তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের ভাষায় মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী।

'শেখ মুজিবের জীবন ও রাজনীতি' গ্রন্থের ১৫২ নং পৃষ্ঠায় এমন তথ্যই পাওয়া যায়।

> "ভারসাম্যহীন এই আর্থ-সামাজিক অবস্থা পাকিস্তান সৃষ্টির পরও ছিল। পাকিস্তানের দুই অংশেই এ অবস্থা বিরাজ করতো। এ শ্রেণীটির বিরুদ্ধে চরম আন্দোলন দানা বেঁধে উঠে সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে। সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষ ছিল এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। উঠতি শিক্ষিত সচেতন, স্বাধীনচেতা তরুণ সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার কৌশলটি হাতছাড়া হয়ে যায়। পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্ব থেকেই উভয় অঞ্চলে জমিদারি প্রথা নিয়ে দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রাম অব্যাহত ছিল। ১৪ই ফেব্রুয়ারীর অধিবেশনে আবুল মনসুর আহমদ কর্তৃক আনীত সংশোধনীর প্রতি সমর্থন জানিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান জমিদারি জায়গীরদারি প্রথা বিলোপ করার পক্ষে বেশ তথ্যমুলক একটি বিতর্ক উপস্থাপন করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সামন্তবাদী অর্থনৈতিক সম্পর্কের উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে একটি আধুনিক রাষ্ট্র ও অর্থ ব্যবস্থা গড়ার পক্ষেই তার অভিমত ব্যক্ত করেন।"

এদেশের মানুষ ব্রিটিশ উপনিবেশিক আমল থেকে জমিদার, জোতদার, মহাজন এই শব্দগুলির সাথে পরিচিত। এর সাথে আরও বেশি পরিচিত জমিদারদের অত্যাচার, প্রজা পীড়নের কাহিনী লোকমুখে গল্পে, নাটকে, সিনেমার মাধ্যমে অবহিত। ১৯৫০-৫১ সালে জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হলেও রয়ে গেছে সেই ভাবধারা। যা ছিল সাধারণ জনগণের কাছে বিরক্তিকর পীড়নমূলক একটি সংস্কৃতি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এটিকে আঘাত করার উপর গুরুত্ব দিলেন। সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের দাবি-দাওয়া নিয়ে রাজনীতি করতে গিয়ে হয়েছিলেন সরকারের প্রতিপক্ষ ও প্রধান লক্ষ্য।

তৎকালীন পাকিস্তান সরকার প্রতিবাদী আন্দোলনকারী একজন জনপ্রিয় তরুণ নেতাকে বারবার দেখতে পেল। তাই সরকারের কাছে অনেক নেতার চাইতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকেই সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষ বলে মনে হলো। তেমনি দলের ভেতরে তার অবস্থান এবং কর্মীদের কাছে জনপ্রিয় হওয়ায় অনেকের গাত্রদাহ শুরু হয়। সেটা অনেকটা বয়সের কারণে, আর্থিকভাবে অনুদানের কারণে।

অনেক প্রবীণ, দক্ষ আইনজীবী ও আর্থিকভাবে সমর্থ্য ধনাঢ্য পরিবার থেকে আসা অনেক নেতৃবৃন্দ রয়েছেন, সর্বোপরি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চেয়ে অধিকতর শিক্ষিত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ রয়েছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বয়সে তরুণ এবং আর্থিকভাবে ধনাঢ্য, জমিদার শ্রেণীর ছিলেন না। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দক্ষ সাংগঠনিক ক্ষমতাকে অনেকেই ঈর্ষার চোখে দেখতেন। কিন্তু নির্লোভ, পরিশ্রমী, দক্ষ, কৌশলী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়নি। দলের ভেতর সাধারণ সম্পাদক পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিপক্ষ নবীন, প্রবীণ নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে একটি ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছিল।

১৯৫৭ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একদিকে দলের সাধারণ সম্পাদক অন্যদিকে তিনি বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতিদমন মন্ত্রী। দলের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে সফল পারদর্শিতা অন্যদিকে মন্ত্রী হয়ে পার্লামেন্টে বিভিন্ন ইস্যুতে বক্তব্য প্রদান করে দিন দিন জনপ্রিয়তা অর্জন করতে থাকেন। এ অবস্থাটা দলের ভেতরে অনেকেই গ্রহণ করতে পারেনি। কিছুদিন পর আওয়ামী লীগের কাগমারী সম্মেলন। সে সম্মেলনে তরুণ নেতা এবং মন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে কিছু তরুণ নেতার কুমন্ত্রণায় কিছু প্রবীণ নেতৃবৃন্দ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের সাধারণ সম্পাদক পদের প্রতি লোভাতুর দৃষ্টি ফেলেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে দলীয় সভাপতি প্রবীণ জননেতা মাওলানা ভাসানীকে প্রভাবিত করার

চেষ্টা করেন। তারা দাবি তোলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব একসাথে দুটি দায়িত্বে থাকতে পারবে না। হয় তাকে মন্ত্রিত্ব ছাড়তে হবে নয়তো সাধারণ সম্পাদক পদ।

জাতীয় পর্যায়ে নেতা হবার জন্য অনেক প্রবীণ নেতাই উৎসুক ছিলেন। তারা চেয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অস্থায়ী মন্ত্রিত্ব রাখুক, অন্যদিকে সাধারণ সম্পাদকের পদ যেন ছেড়ে দেন। তিনি ঠিকই উপলব্ধি করলেন উপরে উঠার সিঁড়ি দলের সাধারণ সম্পাদক পদ। তাই মনে মনে ঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছিলেন। তিনি এ ষড়যন্ত্রের আভাস পেয়ে কাউকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে এমনকি মাওলানা ভাসানী তাকে কিছু বলার আগেই ৩০শে মে, ১৯৫৭ সালে মন্ত্রী হতে পদত্যাগ করেন, যেন তার সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব বহাল থাকে। কেউ কিছু বোঝার আগে বা সম্মিলিত শ্লোগান ওঠার আগেই লোভনীয় সম্মানজনক মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিলেন। সেক্ষেত্রেও তাঁর বিরোধীরা রাজনৈতিক কূটকৌশলে তাঁকে পরাজিত করতে ব্যর্থ হয়। ষড়যন্ত্রে সফল হওয়ার সে সুযোগ তিনি তাদেরকে দেননি। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার সাথে সমস্যাটি সমাধান করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

উনি ভালো করেই জানতেন মন্ত্রিত্ব অস্থায়ী। অন্যদিকে সম্পাদকের দায়িত্ব কিছুটা স্থায়ী। বিশেষ করে এই দায়িত্বের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছাকাছি যাওয়া যাবে, তাদের জন্য কাজ করা যাবে।

১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের পাঠান বংশীয় শৈশবে মাদ্রাসায় পড়ুয়া সেনা কর্মকর্তা আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করে সকল রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করে কারাগারে নিক্ষেপ করেন।

বেশ কিছু নেতৃবৃন্দ জেল থেকে বের হওয়ার পর আইয়ুব খানের সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রকে পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক জোট গঠন করে।

আইয়ুব সরকার বিরোধী আন্দোলনে এন.ডি.এফ-এর রাজনৈতিক জোটের দলগুলো বিভিন্ন মতাদর্শে বিভক্ত ছিল এবং নেতৃবৃন্দের মধ্যে মতাদর্শের ভিন্নতা থাকায় সম্পর্ক ভালো ছিল না। এন.ডি.এফ জোটের প্রবীণ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দরা পাকিস্তানের ঐক্যকে অটুট রেখে একটি নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় যাওয়ার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি হৃদয়ে পোষণ করতেন। পূর্ব পাকিস্তান তথা বাঙালিদের জীবন-মানের উন্নতি এবং মৌলিক দাবি-দাওয়া নিয়ে কোনো আন্দোলন করার পক্ষপাতী ছিলেন না। অলস, ভীরু এবং বিলাসী নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে এন.ডি.এফ-এর রাজনৈতিক জোটের নিকট থেকে এদেশের মানুষের কোনো সমস্যার সমাধানই

যে হবে না তা এদেশের জনগণের বুঝতে বাকি ছিল না। এ জোটের আইয়ুব-বিরোধী রাজনীতি অনেকটাই ড্রয়িংরুমে তর্ক-বির্তক ও আলোচনা-সমালোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এর মধ্যে আইয়ুব সরকারের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে ১৯৬২ সালে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে বেশ কয়েকজন প্রাণ হারায়। সারা পূর্ব পাকিস্তানের স্কুল-কলেজে এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে।

এ শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে ছাত্রদের আন্দোলনকে কেন্দ্র করে স্বাধীনচেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মনে মনে আরেকটি কৌশল অবলম্বন করার চিন্তা করলেন। তিনি নিজ রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগকে এন.ডি.এফ জোট থেকে বের করে এনে স্বতন্ত্রভাবে রাজনীতি করার চিন্তা-ভাবনা করলেন। শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে ছাত্র-আন্দোলনকারী তরুণ সাহসী নেতৃবৃন্দদের নিয়ে দলকে সুসংগঠিত করার চিন্তা করলেন। এদিকে দলের বেশ কিছু প্রবীণ নেতৃবৃন্দ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এ সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে পারেননি। তারা এন.ডি.এফ-এর জোটে থেকেই অলস রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে কোনো কর্মসূচি দিয়ে আন্দোলন করার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাদের ধারণা ছিল আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করলে নির্যাতিত হতে হবে এবং জেলে নিক্ষিপ্ত হতে হবে। সেই ভয় থেকেই এই অলস ভীরু নেতৃবৃন্দ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কর্ম-তৎপরতার বিরোধিতা শুরু করেন। তিনি মনে-প্রাণে স্থির সিদ্ধান্ত নিলেন, যেভাবেই হোক আওয়ামী লীগকে স্বতন্ত্রভাবে তুলে ধরে বাঙালিদের আস্থা, বিশ্বাসী ও নির্ভরযোগ্য রাজনৈতিক দলে পরিণত করতে হবে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ-আলোচনা করে প্রবীণ নেতা মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগিশকে সাথে নিয়ে কাজে নেমে পড়েন।

এধরনের একটি তথ্য আমরা পাই মিজান রহমান সম্পাদিত 'বঙ্গবন্ধু' গ্রন্থের ১০৯ পৃষ্ঠায়। তথ্যটি নিম্নরূপ–

> "১৯৬৩ সালের দিকে শেখ মুজিব চেয়েছিলেন আওয়ামী লীগকে পুনুরুজ্জীবিত করতে, রাজনৈতিক তৎপরতা চালাতে। কিন্তু প্রবীণ নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আতাউর রহমান খান, নুরুল আমিন প্রমুখ প্রবীণ নেতারা রাজনৈতিক দল সমুহের পুনুরুজ্জীবিত করতে চাইলেন না।"

১৯৬৩ সালে আওয়ামী লীগের প্রবীণ নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যু হলে এন.ডি.এফ-এর নেতৃত্ব সংকট দেখা দেয়। জোটের রাজনীতি নিয়ে প্রবীণ নেতৃবৃন্দদের সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ তরুণ নেতৃবৃন্দদের মত

পার্থক্য তীব্র আকার ধারণ করে। এক পর্যায়ে ১৯৬৪ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগিশের বাড়িতে এক সভায় আওয়ামী লীগকে আলাদভাবে পুনরুজ্জীবিত করতে সিদ্ধান্ত নেন। এদিকে আতাউর রহমান খান সহ অনেক প্রবীণ নেতৃবৃন্দ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে দল ত্যাগ করেন। সময় এবং কালকে নিরূপণ করে এবারও তিনি আত্মবিশ্বাস নিয়ে দলকে একটি গতিশীল গঠনমূলক রাজনৈতিক দলে পরিণত করার অবিচল নিষ্ঠায় কার্যকর পদক্ষেপ নিতে শুরু করেন।

তিনি বুঝলেন অতীতমুখী অখণ্ড পাকিস্তানের দর্শনে বিশ্বাসী অলস, ভীরু নেতৃবৃন্দ দিয়ে শুধু কালক্ষেপন হবে, কোনো আন্দোলন সংগঠিত হবে না। এদের সামনে রেখে রাজনীতি করলে নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিল হবে না। বঙ্গবন্ধুর উদ্দেশ্য ছিল ভিন্নভাবে আওয়ামী লীগ এবং নিজেকে বাঙালিদের মাঝে প্রতিষ্ঠিত করা।

আন্দোলনে মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত উঠতি শিক্ষিত তরুণ নেতৃবৃন্দদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টার্গেট করলেন। সেই সব তরুণ নেতা, যারা ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং দশ বছর পর ১৯৬২ সালে আইয়ুব প্রবর্তিত শিক্ষা নীতির বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, সাহসী ভূমিকা নিয়ে জেল খেটেছিলেন। সেইসব বিক্ষুব্ধ, তরুণ নেতৃত্ব নিয়ে তিনি এগুতে লাগলেন। তারা সবাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চাইতে বয়সে অপেক্ষাকৃত তরুণ। তারা নেতা হিসাবে মেনে নিতে পারে এবং এদেশের মানুষের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে যে কোনো কর্মসূচিতে অনুগত হয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়বে। প্রবীণদের মতো অলসতা এবং সৌখিনতা দেখাবে না। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা অনুযায়ী সেই সব তরুণ নেতৃবৃন্দ নিয়ে আওয়ামী লীগের কাউন্সিলের মাধ্যমে তরুণদের সংগ্রহ করে দলকে গতিশীল করে তুললেন। সময়োপযোগী জনতার চাহিদা অনুধাবন করতে তরুণদের নিয়ে সারা বাংলাদেশ সফর করলেন।

একই গ্রন্থে আহমদ মাজহার উল্লেখ করেন–

> "আতাউর রহমান খান দল থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর মুজিব সারা দেশে সফর করেন। দেশের আনাচে-কানাচে ঘুরে দেশের মানুষের মনোভাবের সংগে গভীরভাবে পরিচিত হন। গ্রাম পর্যায়ে সকল গুরুত্বপূর্ণ মানুষকে নিয়ে তিনি স্মৃতিতে নিয়ে নেন। সে সময় তিনি জাতীয় নেতা হয়ে উঠতে থাকেন।"

জনগণের অনুভূতি বুঝে একদল তরুণ, আন্দোলনে অভিজ্ঞ, সাহসী গতিশীল নেতৃবৃন্দ নিয়ে তিনি দলকে সুসংগঠিত করলেন। ১৯৬৪ থেকে ১৯৬৬ সালের মধ্যে যে সমস্ত তরুণ নেতৃবৃন্দদের আওয়ামী লীগে অংশগ্রহণ করান তাদের বেশির

ভাগই ছিলেন গ্রামের মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। এই শ্রেণীটির নব প্রতিনিধিরা দলে প্রবেশ করার পর কেন্দ্র থেকে জেলা ও থানা কমিটিতে সব জায়গায় দলের বৈশিষ্ট্যই পাল্টে যায়। সবাই সমাজ পরিবর্তনে বিশ্বাসী এবং অর্থনৈতিক কারণে ধনাঢ্য অভিজাত ব্যক্তিদের অগণতান্ত্রিক রাজনীতির বিরুদ্ধে। এরা নতুন কিছু পাওয়ার আশায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আন্দোলনে শরীক হলেন।

তিনি এতদিনে স্থির সিদ্ধান্তে উপনিত হলেন– এদের দিয়ে আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ দল হিসাবে আওয়ামী লীগকে জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য করা যাবে। এদের দিয়েই মান্ধাতার আমলের ধ্যান-ধারণার মুসলিম লীগের ক্ষয়ে যাওয়া জমিদারি, নবাবী, বাইশ পরিবারের সামন্তবাদী রাজা-প্রজা, অভিজাত রাজনীতির সংস্কৃতির দূর্গে আঘাত হানতে হবে, পাল্টে দিতে হবে এই অপরাজনীতির সংস্কৃতি। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের তরুণ সমাজের কাছে উপরোক্ত ধারণাটি স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয় ১৯৬৪ সালে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সময়।

এই দাঙ্গায় গ্রামে-গঞ্জে পাকিস্তানপন্থী ধনাঢ্য জোতদার ব্যবসায়ীরা সুযোগ বুঝে ভীত সন্ত্রস্ত হিন্দুদের জায়গা-জমি ও ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান পানির দামে ক্রয় করতে থাকে। অনেক অঞ্চলেই মুসলিম লীগের স্থানীয় নেতা কর্মীদের নেতৃত্বে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংগঠিত হয়। এই দাঙ্গায় পাকিস্তানপন্থী মুসলিম লীগ নেতা কর্মীদের উস্কানি ছিল জনগণের কাছে স্পষ্ট। এতে মুসলীমলীগের সমর্থক ধনাঢ্য, ব্যবসায়ী জোতদাররাই লাভবান হয় বেশি। হিন্দুদের ফেলে যাওয়া সম্পত্তির উপর তাদের দখল ছিল অন্যদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশি।

এভাবে গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত বর্ণহিন্দুদের রেখে যাওয়া সম্পত্তি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কম মূল্যে ক্রয় করে তারা বেশ লাভবান হলো। পাকিস্তানপন্থী ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এবং প্রশাসনের লাভজনক পদে চাকুরিরত মুসলমানরাই বেশি লাভবান হলো। দাঙ্গার কারণে হিন্দুদের একটা অংশ ধীরে ধীরে বাস্তুভিটা ত্যাগ করে চলে যায় ভারতে। শহরের অভিজাত হিন্দু পরিবারগুলিও তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে চলে যেতে থাকে। অনেকে অফিস-আদলতের বড় বড় চাকুরি ত্যাগ করে চলে যায়।

এ অবস্থাটা সৃষ্টির বিশেষ একটি কারণও ছিল। তা হলো পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু ধর্মাবলম্বী জনগণ মুসলিম লীগকে নির্বাচনে ভোট দেয় না বলে তাদের বদ্ধমূল ধারণা ছিল। আর এ চলে যাওয়াটাই চেয়েছিল স্থানীয় কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ। ব্যাপক হারে হিন্দুরা এদেশ ছেড়ে চলে গেলে মুসলিম লীগ রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে পারবে। তবে এই সব দাঙ্গার প্রতিবাদে প্রগতিশীল দলসমূহের

নেতৃবৃন্দরা আন্দোলন করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে "পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও" নামে একটি দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটির মাধ্যমে দাঙ্গা প্রতিরোধের যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। তা সত্ত্বেও দাঙ্গায় ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে প্রচুর সংখ্যক হিন্দু ভারতে চলে যায় বাস্তুভিটা ত্যাগ করে।

আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের পর থেকে ১৯৬৫ সালের পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের আগ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক শাসন-বিরোধী কোনো যৌথ রাজনৈতিক কর্মসূচি ছিল না। তৎকালীন বাঙালি তরুণ সমাজ ও শ্রমিক সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য কোনো দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলনের কর্মসূচি এন.ডি.এফ দিতে ব্যর্থ হয়।

উল্লেখ্য যে, আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলনের জন্য কতিপয় রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে এন.ডি.এফ-নামে যে জোট গঠিত হয়েছিল তার বেশিরভাগ নেতাই ছিলেন বয়স্ক, ব্যধিগ্রস্ত, সৌখিন ও ভীরু। তারা পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি রেখে রাজনীতি করার পক্ষপাতি ছিলেন। শুধুমাত্র নিজেদের ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করার প্রতিযোগিতায় মগ্ন থাকতেন। বাঙালিদের স্বার্থের অনুকূলে রাজনৈতিক আন্দোলন ছিল তাদের কাছে গৌণ।

ক্রমেই পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ অনুধাবন করতে থাকে যে, এ দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য বিশেষ কোনো বাজেট বা কর্মসূচি নেই।

১৯৬৫ সালে পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় পাকিস্তানের সামরিক সরকার পূর্ব পাকিস্তানকে রক্ষার চাইতে পশ্চিম পাকিস্তানকে রক্ষা করাকেই বেশি গুরুত্ব দেয়। এ যুদ্ধে বাঙালিরা লক্ষ্য করলো পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের অরক্ষিত রেখে পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের জান-মাল রক্ষার জন্য বাঙালি সৈনিকদেরকে চাপ দেওয়া হয় এবং ১৭ দিনের পাক-ভারত যুদ্ধে অনেক বাঙালি সৈনিকই বিরত্বের পরিচয় দিয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ যে নিরাপত্তাহীন ছিল, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে সর্ব প্রথম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই তা তুলে ধরেছিলেন। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সাংবাদিক, লেখক এম আর আখতার মুকুল রচিত 'ভাসানী মুজিবের রাজনীতি' নামক গ্রন্থের ১১৩ পৃষ্ঠায় এভাবেই বর্ণনা করা হয়েছে–

> "১৯৬৬ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী লাহোরে সর্বদলীয় জাতীয় সম্মেলনে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তৃতা সবাইকে হতবাক করে দেয়। শেখ সাহেব এই মর্মে সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করলেন যে, ১৭ দিন ব্যাপী পাক-ভারত যুদ্ধের মধ্যে ১২ শত মাইল দূরবর্তী পূর্ব বাংলা নিরাপত্তাহীন অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মধ্যে নিপতিত ছিল।"

৬ দফার ব্যাখ্যাদানের পূর্বেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির নিরাপত্তার ব্যাপারটি গুরুত্বসহকারে ভাষণে তুলে ধরেন। এই প্রথম "বাংলার মানুষের পক্ষে পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে বাঙালির প্রতি অবহেলা, বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরে সবাইকে হতবাক করে দেয়।

শুধু পশ্চিম পাকিস্তানকে রক্ষা করার জন্য ভারতের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধেই বাঙালি সৈন্যদের পাকিস্তানি পরিচয়ের মোহভঙ্গ হতে থাকে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে চাকরি রত বাঙালি সৈন্যরা লক্ষ্য করলো চোখের সামনে পশ্চিম পাকিস্তানকে নিরাপদ রাখার জন্য হাজার হাজার সৈন্য মোতায়েন করা হয়। বহু অর্থ ব্যয় করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে, এমনকি বাঙালি সৈন্যদেরও পূর্ব পাকিস্তান থেকে স্থানান্তর করে পশ্চিম পাকিস্তানের সীমান্তে নিয়োগ করা হয়। কিন্তু নিজের মাতৃভূমি ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও আসামের সীমান্তবর্তী পূর্ব পাকিস্তান (পূর্ববাংলা)-কে রক্ষার জন্য প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের কোনো উদ্বেগ ও মাথা ব্যথা নেই। অরক্ষিত পূর্ব পাকিস্তানের জন্য কোনো বরাদ্দ ছিল না, ছিল না কোনো সৈন্য-সমাবেশ।

সেই থেকে শুধু সৈন্যবাহিনীই নয়, সাধারণ জনগণের হৃদয়ে পাকিস্তানপ্রীতি হ্রাস পেতে থাকে। বিশেষ করে স্বাধীনচেতা তরুণ সমাজের বুঝতে বাকি রইল না। বাঙালি সৈন্যদের দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান রক্ষা করার জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ পূর্ব বাংলার অরক্ষিত সীমান্তে কোনো সৈন্যসমাবেশ নেই। কৌশল ছিল ভারত যাতে অরক্ষিত পূর্ব বাংলা আক্রমণ করে আর পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসী অর্থাৎ বাঙালিরা যাতে ভারতবিরোধী হয়, ভারত বিদ্বেষী মনোভাব সৃষ্টি করার জন্য মুসলিম লীগের ওয়াজ-বক্তৃতা শুরু করা যায়। ভাগ্যিস পাকিস্তানের তৎকালীন পূর্ব ভূখণ্ডে ভারত আক্রমণ করেনি, তাই পাকিস্তানের মতলবও হাসিল হয়নি। কারণ, ভারত আক্রমণ করলে মুসলিম লীগ সে সুযোগে পূর্ববাংলার জনগণকে নানা কিস্‌সা কাহিনী বানিয়ে তাতে রং লাগিয়ে কুৎসা রটনা করতো যাতে জনগণ ভারত-বিরোধী হয়।

যুদ্ধের পর ১৯৬৬ সালের প্রথম থেকেই নতুন একটি কর্মসূচি নিয়ে মাঠে নামার চিন্তা করলেন। রাজনীতির অনেক হিসাব কষে জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তরুণ অর্থনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবীদের দিয়ে চুল-চেরা বিশ্লেষণ করে কয়েকটি দাবি গঠন করলেন তিনি। ইতিহাসে যা 'ছয় দফা' নামে পরিচিত। এক সময় ছয় দফা বাঙালির প্রাণের দাবিতে পরিণত হয়। সারা বাংলার তরুণ সমাজ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রণীত আওয়ামী লীগের ছয় দফার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে সংগঠিত হতে থাকে।

বিচারপতি সোবহান তাঁর লেখা 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মুক্তিযুদ্ধের

সশস্ত্র অধ্যায়' প্রবন্ধে লেখেন–

"৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬ তে শেখ মুজিব ৬ দফা প্রস্তাব লাহোরে উত্থাপন করেন রাজনৈতিক দলের বৈঠকে। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুবকে এ কর্মসূচি বিচলিত করে তোলে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার কার্যকর পদক্ষেপ– ৬ দফা প্রস্তাবে ছিল বাঙালির বাঁচার দাবী এবং এ প্রস্তাবে স্বাধীনতার কার্যকর পদক্ষেপ ৬ দফা প্রস্তাবে ছিল। বাঙালির বাঁচার দাবী এবং ঐ প্রস্তাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে এক নতুন মোড় নেয়। তখন থেকেই শেখ মুজিবকে কেন্দ্র করে বাংলার রাজনীতি এগুতে থাকে।"

১৯৬৬ সালের দিকে বাঙালি বংশদ্ভুত কিশোরগঞ্জের সন্তান, লেখক, রাজনৈতিক বিশ্লেষক ইংল্যান্ডে বসবাসরত নিরদ চন্দ্র চৌধুরী 'পূর্ববঙ্গের সমস্যা' নামে একটি প্রবন্ধে লেখেন–

"পশ্চিম বঙ্গের বাঙালি ভদ্রলোকেরা তুচ্ছ ইংরেজীপনাতে নিজের ধর্মে হারাইতেছে। দ্বিতীয় পশ্চিমবঙ্গের বাঙালির মধ্যে অর্থ লিপ্সা ও অর্থাভাব– দুই আছে। এর প্রাবল্যে আদর্শপরায়নতা ও আত্মত্যাগ প্রবৃত্তি অনেক কমিয়া বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে এই দোষগুলি এখনও বেশি দেখা যায় না। তাহারা অনেক স্বাভাবিক সরল সহজ বাঙালি রহিয়াছে। বাঙালির দূর্বলতা ও শক্তি, দোষ-গুণ দুই। তাই আজিকার দিনে পূর্ববঙ্গে সমস্যা প্রকট। সুতরাং মুসলমান বাঙালি যে, সমস্ত প্রাণ মন দিয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিবে তাহা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু উহাদের প্রতিপক্ষ পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমান। উহাদেরও কতগুলি বিশিষ্ট গুণ রহিয়াছে। উহারা শরীরে বলিষ্ট, মনে দৃঢ়, তাহার উপরে সাংসারিক বুদ্ধি এবং ধীরভাবে হিসাব করিবার ক্ষমতা অনেক বেশি রাখে। একদিকে আবেগ আর একদিকে স্থির বুদ্ধি। সুতরাং এই দুয়ের দ্বন্দ্বে সহজে কারও জিৎ হবার নয়। আমার বিশ্বাস পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান পরস্পর বিরোধী কোন বিশেষ হার জিৎ দেখাতে পারবে না। সুতরাং পূর্ববঙ্গের সমস্যার সমাধান এই দুই কার্যকলাপের দ্বারা হইবে না। শেষ পর্যন্ত কী হইবে তাহা নির্ভর করিবে সমগ্র ভারতবর্ষের বাহিরে রাজনৈতিক বিবর্তন ও অবস্থার উপর। সমগ্র ভারতবর্ষের বাহিরে রাজনৈতিক বিবর্তন অবস্থার উপর– ইহার বেশি সঠিক তথ্য বলিয়া শেষ করা যাইবে না।"

বাঙালি বংশোদ্ভুত এই লেখক অনেকদিন জীবিত ছিলেন। তিনি অবশ্য ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে কে হারল, কে জিতল তা ভালো করেই প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর

ভবিষ্যদ্বাণী যথার্থ না হলেও পূর্ববঙ্গের বাঙালি মুসলমান মনে-প্রাণে আন্দোলন করবে তাহা নির্ণয় করিতে ভুল করেন নাই। তিনি ১৯৬৯-৭০ বা মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লিখেছেন কিনা জানি না। লিখে থাকলেও তার ৬৬ সালের লেখার অপরিণত দিকগুলি হয়তো বর্জন করতেন। যাহা হোক, দূরদেশে বসে এই মাতৃভূমির সম্বন্ধে লেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন– তাও এক প্রকার দেশপ্রেম।

তিনি কৈশোরে তেরো বছর বয়সে কিশোরগঞ্জ ছেড়ে গেছেন। আর কোনোদিন গ্রামে আসেননি। পরবর্তীতে কালের বিবর্তনে পূর্ববাংলার বাঙালিদের বৈশিষ্ট্য কী, তা নির্ণয় করতে ভুল করেছেন। ষাটের দশকের শেষের দিকের বাঙালিদের সাথে তিনি হয়তো কথা বলেননি বা শোনেননি কিংবা মেলামেশা করেননি। তিনি হয়তো কথা বলেননি তখনকার ছাত্রসমাজের সাথে। কথা বলেননি শ্রমিক, কৃষক, তরুণ সমাজের সাথে। যদি এদের সাথে মিশতেন তিনি, তাহলে উপলব্ধি করতে পারতেন বাঙালির শৌর্য-বীর্যের তপ্ত অবস্থা। বুঝতেন বাঙালির সচেতনতা, সাহস, উদ্দেশ্য, দেশপ্রেম, মেধা, বৈশিষ্ট্য, মর্যাদাবোধ এবং ভিশন। তারপর নিজের উক্তি, ধারণা, ভবিষ্যদ্বাণী সবকিছুই প্রত্যক্ষ করেছেন। হয়তোবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রণীত ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করার আগেই এ প্রবন্ধটি রচিত হয়েছিল। ছয় দফা আন্দোলনে পূর্ব পাকিস্তানের কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র-সমাজের তুমুল আন্দোলনের উত্তাপ তিনি অনুধাবন করতে পারেননি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা দাবিকে নিজের দল থেকে অনুমোদন করানোর লক্ষ্যে আওয়ামী লীগের বৈঠক ডাকার আগেই তরুণ নেতৃবৃন্দের কাছে তা ব্যাখ্যা করে তাদের প্রতিক্রিয়া জানার চেষ্টা করেন।

১৯৬৬ সালের ১৩ মার্চ আওয়ামীলীগের কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেই বৈঠকে ৬ দফা অনুমোদন করার সিদ্ধান গৃহীত হয়। সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৮, ১৯ ও ২০ মার্চ অনুষ্ঠিত কাউন্সিল অধিবেশনে অনুমোদন নিতে হবে। অবশেষে ১৮ মার্চ মতিঝিল ইডেন হোটেলে আওয়ামী লীগের কাউন্সিলের অধিবেশনে ৬ দফা গৃহীত হয়। এই ছয় দফাই প্রথম কর্মসূচি পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের পক্ষে। দলীয় কাউন্সিলে বেশির ভাগ তরুণ নেতাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ৬ দফার পক্ষে সোচ্চার ছিলেন। মুসলিম লীগ থেকে আসা বয়স্ক, বিলাসী, শৌখিন ও ভীত-সন্ত্রস্ত কিছু নেতৃবৃন্দ ছিলেন, যেমন– আতাউর রহমান খান, সালাম খান, জহিরুদ্দিন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

অত্যন্ত কৌশলে তরুণ নেতৃবৃন্দদের দিয়ে সমর্থন করিয়ে প্রস্তাব পাশ করানো হয়। এতে তাঁর প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায়। ছয় দফা নিয়ে অনেক ইতিহাস রয়েছে। অনেক বাম বুদ্ধিজীবী একে সি.আই.এ-র দলিল বলে আখ্যায়িত

করেছেন। বিদেশী প্রেসক্রিপশন বলে গালি দিয়েছে। অনেক দলের নেতৃবৃন্দই একে হঠকারী দফা বলে প্রচার করতে অপচেষ্টা চালায়। এই দফায় সরকারের দমন পীড়ন বেশি হবে, রক্তপাত হবে, পাকিস্তানিদের হিংস্রতা বৃদ্ধি পাবে– এই ভয়-ভীতি গোপনে রটাতে থাকে। কিন্তু আত্মবিশ্বাসী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সকল বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও ছয় দফার আন্দোলন নিয়ে এগিয়ে যেতে থাকেন।

একে একে বয়স্ক, প্রবীণ নেতা শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যু হলে পূর্ব বাংলা নেতাশূন্য হয়ে পড়ে। মাওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগ ত্যাগ করে তাঁর অনুসারীদের নিয়ে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠনে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। একদিকে ন্যাপের সশস্ত্রপন্থী নেতৃবৃন্দ অন্যদিকে মার্কস, লেনিন, মাও সে তুং-এর দর্শনের অতি তাত্ত্বিক বিপ্লবীদের কারণে প্রবীণ নেতা মাওলানা ভাসানীর দিশেহারা অবস্থা।

ঠিক সে সময়ে তরুণ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ধূমকেতুর মতো আবির্ভূত হলেন ৬ দফা নিয়ে। এবার সোজা স্থায়ী দাবি তুললেন– বাঙালির প্রাণের দাবি। ৬ দফা নিয়ে মাঠে নামলেন। ছয় দফার সমর্থনে সারাদেশে জনসভা ও হরতাল, ধর্মঘট পালন শুরু হয়। এদিকে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমাজ ছয় দফার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে ছয় দফার আদলেই ১১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে। ক্রমেই ছাত্রদের আন্দোলন তীব্র হতে থাকে। কিন্তু আইয়ুব খানের সামরিক সরকার নির্যাতনের পথ বেছে নেয়। এদেশের সংগ্রামী জনতার উপর আঘাতের পর আঘাত আসতে থাকে। ছয় দফার আলোকে প্রদেশের যে জেলায়ই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বক্তৃতা করতে যান সেখানেই সরকার রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা করে নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করতে থাকে। তারপরও তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা বসে রইলেন না। সারাদেশ চষে বেড়াতে লাগলেন– নতুন এক দাবি, বাঙালির প্রাণের দাবি, বাঁচার একমাত্র দাবি– এইসব শ্লোগানে মুখরিত করতে লাগলেন বাংলার আকাশ বাতাস। তৎকালীন পত্র-পত্রিকায়, প্রচার পত্রে, লিফলেটে তখন শুধু ছয় দফা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, আওয়ামী লীগ, সাহসী, সংগ্রামী– এই কয়টি শব্দই পত্রিকার খোরাক ছিল। এভাবে তিনি নিজেকে বাঙালিদের নিকট একমাত্র সাহসী দেশপ্রেমিক নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হলেন।

পাকিস্তানের সামরিক সরকার শুধু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব নয় আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার করে দেশের জেলখানাগুলি পরিপূর্ণ করে ফেলে। বিভিন্ন জায়গায় আন্দোলনকারী জনগণের রক্তপাতের খবরও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। সারা প্রদেশব্যাপী শুরু হয় তুমুল আন্দোলন। দীর্ঘদিন পর গ্রেফতার, নির্যাতন, মামলা, পুলিশের গুলি এসব দেখে বিভিন্ন দলের অনেক নেতাই ভয়ে

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে দোষ দিতে লাগলেন– এভাবে আইয়ুবকে ক্ষেপানো উচিত হয়নি। কেউ কেউ অন্য দেশের প্রেসক্রিপ্সন তত্ত্ব দিয়ে দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করতে চাইলেন। কিন্তু কারো সমালোচনাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আন্দোলনকে ব্যাহত করতে পারেনি। তিনি স্বেচ্ছায় কঠিন পথ বেছে নিলেন। জেনে শুনেই প্রস্তুত ছিলেন কঠিন দুর্গম পথ পাড়ি দিতে। সকল দলীয় প্রতিযোগীতা ও ষড়যন্ত্রের আঘাত শেষ হবার পর পরই শুরু হয় আবার নতুন করে আরেকটি ষড়যন্ত্র, যার নাম ছিল 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'। এই মামলায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ফাঁসিতে ঝোলানোর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো পাকিস্তান সরকার, যাতে করে ছয় দফার আন্দোলন এবং বাঙালি জাতীয়তার দর্শন নিমিষে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। বাঙালি যাতে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে তার জন্য মুক্তিকামী বাঙালি নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করে অন্ধকার কারা-প্রকোষ্টে নিক্ষেপ করলেন। শুরু হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ফাঁসি দেওয়ার ষড়যন্ত্র। ফাঁসির কথা শুনেও তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন ৬ দফা বাস্তবায়নে। তখন আইয়ুব খান ঘোষণা করেছিলেন ৬ দফার জবাব দেওয়া হবে অস্ত্রের ভাষায়। এদিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবও দমবার পাত্র নন। কারণ, তিনি জেনে শুনেই এ পথ বেছে নিয়েছিলেন। অনেক আঘাত যে সইতে হবে– তা তিনি আগেই অনুধাবন করেছিলেন। তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন, আপন পথে তিনি চলবেন।

লেখক, রাজনীতিবিদ অধ্যাপক হুমায়ুন কবিরের কবিতায় যেন তাকে সাহস দেয়–

কাঁটার পথে চলতে হবে তোর
তাহার লাগি সাধনা কর শুরু
আঘাতটুকু সইতে নারি আজি।
বিপদ সহি, নিন্দা সহিতে শত
আশার আলোয় আঁধারে পথ দেখি
চলতে হবে তোমার অবিরত
বক্ষ হবে দুরু দুরু
চিত্ত যদি মুর্চ্ছে পড়ে ভয়ে
আপন পথ সৃষ্টি করে তবু
হবে তোরে চলতে অসংশয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মৃত্যুর ঝুঁকি মাথায় নিয়েছেন। তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, সরকার নির্যাতন করবে, কারা ভোগ করতে হবে। এমনকি ষড়যন্ত্রমূলকভাবে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলতে হতে পারে। সবকিছু জেনে, বুকভরা সাহস নিয়ে আন্দোলনে

নেতৃত্ব দিয়েছেন। প্রতিদিন পত্রিকার পাতায় তাঁর বিভিন্ন রকমের নির্যাতনের সংবাদ ছাপানো হতো। এসব সংবাদ পত্রিকার মাধ্যমে জেনে বাঙালিরা ধীরে ধীরে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে। এভাবে তিনি জনগণের মনের মণিকোঠায় স্থান করে নেন। তাঁর জনপ্রিয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় কতিপয় সামরিক কর্মকর্তা জড়িত সন্দেহে গ্রেফতার হয়েছিলেন। বেশ কিছু বাঙালি তরুণ অফিসার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি হয়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। পাকিস্তানে চাকরিরত বাঙালি সেনাবাহিনীর মাঝেও শেখ মুজিবুর রহমানের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

আওয়ামী লীগের প্রবীণ নেতা কর্ণেল অব. শওকত আলী তখন ছিলেন ক্যাপ্টেন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ২৬নং আসামি তিনি। তাঁর উক্তি অনুযায়ী–

> "এই মামলায় যখন শুনতে পেলাম বঙ্গবন্ধুকে ১নং আসামী করা হয়েছে তখন থেকে আমরা সামরিক বাহিনীর লোকজন যারা অভিযুক্ত তারা ভরসা পেলাম এবং পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর বাঙালি কর্মকর্তাদের মধ্যে মুজিবপ্রীতি বৃদ্ধি পেতে থাকে।"

ছয় দফার আন্দোলনকে স্তিমিত করার কৌশল অবলম্বন করতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় ১নং আসামি করা হয়। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, মামলায় ফাঁসাতে গিয়ে সরকারই একরকম বিপাকে পড়ে যায়। অন্যদিকে সেনাবাহিনীর কিছু লোককে জড়িত করে সেনাবাহিনীর ভেতর ভীতির সঞ্চার করে ফেলে। তারপর থেকে সেনাবাহিনীর বাঙালি অফিসারদের দিকে পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থার তীক্ষ্ণ নজরদারি শুরু হয়। দিনে দিনে বাঙালি সেনাদের প্রতি সন্দেহ বৃদ্ধি পেতে থাকে। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমাজ আন্দোলনে মশাল হাতে রাস্তায় নেমে পড়ে।

যতই দিন যেতে থাকে ততই ৬ দফার আন্দোলনকারীদের উপর নির্যাতন বৃদ্ধি পেতে থাকে। ছাত্রদের উপর নির্যাতনের সংবাদ পত্রিকাগুলোতে ছাপতে থাকে। ১৯৬৯ সালে ছাত্রদের মিছিলে নবকুমার ইনস্টিটিউশনের মতিউর নামে এক কিশোর ছাত্রকে পুলিশ গুলি করে নির্মমভাবে হত্যা করে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের মিছিলে গুলি করে ছাত্র নেতা আসাদকে হত্যা করে। এইসব লোমহর্ষক রক্তপাতের সংবাদ পত্রিকায় পড়ে জনগণের ক্ষোভ বাড়তে থাকে। এভাবেই পূর্ব বাংলায় শ্রমিক, কর্মচারী, ছাত্রসমাজ, অর্ধশিক্ষিত, শিক্ষিত যুবসমাজ তথা সর্বস্তরের মানুষ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ পরিবর্তনের সাথে সাথে নিজেদের ধ্যান-ধারণারও পরিবর্তন করতে থাকে। এবারের এই আন্দোলন অতীতের আন্দোলনগুলির চেয়ে

ভিন্নতর, অতীতের দাবির চেয়েও ভিন্ন। পথটি কণ্টকাকীর্ণ হলেও, দুঃসাধ্য হলেও এটা সত্যিই একটি পরিবর্তনের রাজনীতি। রাজনৈতিক সংস্কৃতিরও পরিবর্তন। বঞ্চিত বৈষম্য অবহেলিত সাধারণ জনগণের এ রাজনীতি দিয়ে অভিজাত বিলাসী পরিবারের রাজনীতির দুর্গে আঘাত হানা।

এবারের রাজনৈতিক দাবি অতীতের সকল দল ও মতের চেয়ে ভিন্ন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এই দাবি, এই আন্দোলনের প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন বাঙালির চিন্তা-চেতনার মূলগত পরিবর্তনের, ধ্যান-ধারণা ও চাহিদা পরিবর্তনের। দাবির রং, বৈশিষ্ট্য ভিন্ন– তা তিনি অনুধাবন করেছেন। মান্ধাতার আমলের ধ্যান-ধারণা দিয়ে নয়, সম্পূর্ণ পরিবর্তনশীল সমাজের উপযোগী করে জনগণের চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন ঘটাতে হবে। সম্পূর্ণ নতুন পরিবর্তনশীল একটি দাবীর জন্যই তরুণ সমাজ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। এই পরিবর্তনের মাধ্যমেই সম্ভব সমাজকে নতুনভাবে গঠন করা। এই ধরনের পরিবর্তনের উপলব্ধি করেছিলেন বিশ্ববরেণ্য অর্থনীতিবিদ ও সমাজবিজ্ঞানী পণ্ডিত জন স্টুয়ার্ট মিল। তাই তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন–

> "আমি সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করি যে, মানুষের চিন্তা-ধারার মূলগত কোন পরিবর্তন সাধিত না হওয়া পর্যন্ত মানবজাতির বর্তমান অবস্থার বিশেষ কোন উন্নতি ঘটা সম্ভব নয়। কিন্তু মানুষের চিন্তাধারা এই পরিবর্তন ও তার পরিবর্তনশীল পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে উদ্ভুত হয় এবং জীবনের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের দুঃখ বেদনার ভেতর দিয়েই তা সাধিত হয়।"

আন্দোলনের এক পর্যায়ে সাংস্কৃতিক কর্মীরাও জেগে উঠলেন। এরা কবিতায়, গানে, প্রবন্ধে, নাটকে নতুন কথা, নতুন শ্লোগান, নতুন গানকে প্রতিষ্ঠিত করতে লাগলেন। লেখক, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবী সবাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এই নতুন রাজনৈতিক দর্শনের অনুসারী এবং তা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কাজ করতে লাগলেন। কয়েকদিন পর ঠিকই ছাত্র সমাজের বিভিন্ন শ্লোগানে চেতনার পরিবর্তনের ভাষা, ঢেউ জাগাল। যেমন– "তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা"। "পিণ্ডি না ঢাকা, ঢাকা-ঢাকা"। সারা বাংলায় এমন বিভিন্ন শ্লোগানে প্রতিফলিত হতে থাকে চেতনার পরিবর্তনশীল চিহ্নগুলি।

তিনি যেমন নিজেও পরিবর্তনশীল হয়েছিলেন সেই সাথে পূর্ব বাংলার জনগণের চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। যে পরিবর্তন ছিল নিজেদের জীবন মানের উন্নতির জন্য আন্দোলনে শরিক হয়ে নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে বিশ্বকে জানিয়ে দেওয়া।

ছয় দফা আন্দোলনের উপর ভর করে– এদেশের মানুষের মনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মাধ্যমে নতুন কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা জাগল। কতিপয় দলের অনুসারী ছাড়া এক পর্যায়ে ছাত্র-শ্রমিক, কৃষক পেশাজীবী, শিক্ষক, লেখক, শিল্পী, গায়ক, অভিনেতা সহ সমাজের সর্বস্তরের জনগণ রাস্তায় নেমে পড়ল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মুক্তি কামনায়। শেষ পর্যন্ত আন্দোলনের ঢেউ দেখে মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানীও নেমে পড়লেন আন্দোলনে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির দাবিতে সারা বাংলায় ছাত্রসমাজের আন্দোলনে কিশোর, তরুণ সহ গ্রামের কৃষক পর্যন্ত এ আন্দোলনে শরিক হলো। ফলে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি হলো যে, কতিপয় পাকিস্তানপন্থী দলের সমর্থক ছাড়া সর্বস্তরের ছাত্র-যুবক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আইয়ুব খানের ক্ষমতার মসনদ কেঁপে উঠল। সারা বাংলায় শহরগুলিতে অফিস-আদালতে সকল কর্মকাণ্ড স্তব্ধ হয়ে গেল। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচারকের বাড়িতে জনতা আগুন লাগিয়ে দিল। ফলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। এ অবস্থায় আইয়ুব সরকারের গ্রহণযোগ্যতা সেনাবাহিনীতেও হ্রাস পেতে লাগলো। তাকে অনেকটা ব্যর্থ বলে অভিহিত করা হয়। জনতার আন্দোলনের মুখে আইয়ুব খান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাসহ সকল প্রকার মামলা প্রত্যাহার করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ সকল রাজবন্দীকে মুক্তি দিলেন। মুক্তি পেয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনতার কাছে ফিরে এলেন। রেসকোর্স ময়দানে বিশাল জনসভায় প্রায় বিশ লক্ষ জনতার সামনে ছাত্র নেতৃবৃন্দ তাকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করলো। সেদিন তিনি গভীরভাবে অনুভব করলেন নিজের আকাশচুম্বি জনপ্রিয়তা। এমনিতেই তিনি ছিলেন আত্মবিশ্বাসী, ছাত্রসমাজ কর্তৃক এই উপাধি পেয়ে আত্মবিশ্বাস আরও বেড়ে যায়।

তিনি বুঝতে পারলেন, তাঁর প্রথম মিশন সফল হয়েছে। এবার পরবর্তী মিশনের প্রস্তুতি নিতে হবে। রাজনৈতিকভাবে উৎসাহিত বিভিন্ন শ্রেণীর পেশার লোক বঙ্গবন্ধুর কাছে আসতে থাকেন এবং আলোচনা করে দলে দলে আওয়ামী লীগে যোগদান করতে শুরু করেন। বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজন বঙ্গবন্ধুর সাথে আলাপ-আলোচনা করতে লাগলেন। অনেকটা মুক্ত পরিবেশে তরুণ ছাত্র সমাজ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর সাথে সাথে ছাত্র নেতৃবৃন্দরাও মুক্তি পেল। আন্দোলনকারী ছাত্র, শ্রমিক, জনতাকে বিভ্রান্ত করার চক্রান্ত শুরু হলো। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন তথ্য দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা হতে লাগল।

নতুন উপাধি পাওয়া বঙ্গবন্ধু একটি ব্যাপার উপলব্ধি করলেন, হাজার হাজার ছাত্র, তরুণ বঙ্গবন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশ ও জাতি সম্পর্কে কিছু বলবেন। ছয় দফাকে তো জনগণ জানেই। তিনি তরুণ

সমাজকে একটি প্রচারণা বা একটি শ্লোগান তুলে দিলেন। সবাইকে হতবাক করে দিয়ে তিনি জাতীয়তাবাদের স্বাদ পাওয়ার জন্য ছয় দফার বাইরে পূর্ব পাকিস্তানের পরিবর্তে 'বাংলাদেশ' নাম ঘোষণা করলেন।

অধ্যাপক কবির চৌধুরী সম্পাদিত 'জননায়ক থেকে বঙ্গবন্ধু' গ্রন্থের ১৭৭ পৃষ্ঠায় এভাবে বর্ণনা করা আছে–

> "১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে শেখ মুজিব কারান্তরাল থেকে বেরিয়ে এসে বাঙালির কপাল থেকে এই দাসত্বমূলক পরিচয় মুছে ফেলার পদক্ষেপ নেন। এ বছর ৫ই ডিসেম্বর-এ তিনি ঘোষণা করেন– এক সময় এদেশ থেকে, এদেশের মানচিত্র থেকে বাংলা কথাটার সর্বশেষ চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় নাই। বাংলার মানুষের পক্ষ থেকে আমি ঘোষণা করছি, আজ থেকে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলের নাম পূর্ব পাকিস্তানের বদলে শুধু 'বাংলাদেশ' হবে।"

সে সময় তরুণ সমাজের কাছে এ ঘোষণাটি ছিল আন্দোলনের গতির খোরাক। নতুন একটি ঘোষণায় তরুণ সমাজ বাংলা, বাঙালি, বাংলাদেশ– এই শব্দ কয়টিতে নতুন পথের সন্ধান পেল। এ ঘোষণাটি ছাত্রসমাজকে উদ্বুদ্ধ করলো আগামী দিনের পথ চলার জন্য। এই ঘোষণার পরই যেন তিনি আরেক ধাপ এগিয়ে গেলেন। এর দ্বারা একটি ইঙ্গিত তিনি তরুণ সমাজকে দিয়েছিলেন। এই বাংলাদেশ নামের উচ্চারণের পর 'জয় বাংলা', "তোমার দেশ আমার দেশ বাংলাদেশ, বাংলাদেশ"- এই সব শ্লোগান তরুণদের মুখে মুখে প্রচার হতে থাকে। এইভাবে তিনি জনগণকে প্রস্তুত করতে লাগলেন। এটিই ছিল বঙ্গবন্ধুর চলমান প্রজ্ঞার পরিচয়।

তিনি প্রথম থেকেই যে আত্মবিশ্বাস নিয়ে জনগণকে নিয়ে মাঠে নেমেছিলেন সেই আত্মবিশ্বাসে বলিয়ান হয়ে এতদূর পথ পাড়ি দিয়ে এসেছেন। অথচ এই কয়েক বছর আগে ১৯৬৬-৬৭ সালে গ্রেফতার হওয়ার পর নিন্দুকেরা ভেবেছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক আন্দোলনের সূর্য অস্ত গেলো– তা আর উদিত হবে না। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর দম্ভ ভরে ঘোষণা করেছিলেন, "শেখ মুজিবকে আর আলোর মুখ দেখিতে হইবে না।" কিন্তু না, জয়ী হবার ব্যাপারে শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মবিশ্বাস ছিল বলিষ্ঠ। কারণ, বাঙালিদের সেইভাবে গড়ে তুলেছেন তিনি। এই ধরনের আত্মবিশ্বাসী মানুষদের কথাই পাকিস্তানের জাতীয় কবি এবং দার্শনিক আল্লামা ইকবাল বহুকাল আগেই কবিতায় লিখে গেছেন–

"জাহা মে আহলে ঈমান সুরতি-ই-খুরশিদ জিতে হ্যায়,
ইধার ডুবে, উধার নিকলে, উধার ডুবে, ইধার নিকলে"

অর্থাৎ, "দুনিয়াতে বিশ্বাস ও আত্মবিশ্বাসী মানুষ সূর্যের মতো একদিকে পতন হলে আরেক দিকে উদ্ভাসিত হয়।"

তিনি মুসলিম লীগ বা জামায়াত-এ ইসলামির চাইতে বেশি গুরুত্ব দিতেন বামপন্থীদের। এদের মধ্যে একটি দল যারা পিকিংপন্থী বলে পরিচিত সেই চিনপন্থীদের সাথে ন্যাপ-ভাসানীর নেতা-কর্মীদের ভিতরে কেউ কেউ সশস্ত্র সংগ্রামেও বিশ্বাসী ছিল। অনেকের রাজনৈতিক দর্শন ছিল "শ্রেণী শত্রু খতম করা"। সিরাজ শিকদার, মতিন, আলাউদ্দিন, টিপু বিশ্বাস, তাদের মতো অতি বিপ্লবীদের দিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান খুব সূক্ষ্মভাবে নজর রাখতেন। এরা ৬ দফার আন্দোলনের সময় জনগণকে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করেছিল। ৬ দফাকে সি.আই.এ-র দলিল বলে শ্লোগান তুলেছিল। যদিও তাদের এই অপচেষ্টা সফল হয়নি, তারপরও তারা থেমে থাকেনি। বঙ্গবন্ধুর এই অগ্রযাত্রাকে প্রতিহত করার জন্য মাথা খাটাত তারা। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর ছিল তাদের দিকে তীক্ষ্ণ নজর। এরা কখন কোথায় কি সিদ্ধান্ত নেয়, কি মন্তব্য করে তা সব সময় প্রত্যক্ষ করতেন এবং সাথে সাথে পাল্টা সিদ্ধান্ত নিয়ে এগিয়ে যেতেন।

মিজান রহমান সম্পাদিত 'বঙ্গবন্ধু' বইয়ের ৫২০ পৃষ্ঠায় আছে– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বঙ্গবন্ধুর জীবন সম্পর্কে বলেন–

"আমি একটু গোড়া থেকে শুরু করতে চাই– কিছুটা তাত্ত্বিক ভাবে। প্রসঙ্গক্রমে ১৯৯৪ সালে একটা গবেষণামূলক পত্রিকা "দি আটলান্টিক মান্থলি" পত্রিকায় গ্যারিওলস্ নামে একজন গবেষক একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন– "What makes a good leader" সেখান থেকে সামান্য উদ্বৃতি দিয়ে শুরু করছি– "Leaders have a vision always response to it. Leader organizes the plan."– এ উদ্বৃতি থেকে এটা স্পষ্ট যে, নেতার অন্তত তিনটি বিষয় থাকতে হবে। তিনি একদিকে নেতা, তাঁর অনুসারী আছে এবং নেতা তাঁর অনুসারীদের নিয়ে একটা বিশেষ লক্ষ্যের দিকে এগুবেন। যেমন ধরা যাক– সেই ৫০-এর দশকে মোটামুটিভাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন বলেছিলেন, পাকিস্তানের সংসদে বসে ইষ্ট পাকিস্তান বলা যাবে না, পূর্ব বাংলা বলতে হবে। বাংলাদেশের ধারণা তার মধ্যে ছিল স্পষ্ট। আমি যেটা বলতে চাই, সেটা হলো– একটা লক্ষ্য সামনে ছিল। একই লক্ষ্য সামনে এনেই জনগণকে অনুসারী করেছিলেন এবং সেজন্য এ জায়গাটাতে আমাদের বড় উল্লেখযোগ্য একটা বিষয় যে, আমরা '৪৭ সাল থেকে '৭১-এর সময়টাতে অনেক নেতা পেয়েছি। জনগণের মুখপাত্র হওয়া, জনগণের ভাবনা, চেতনা, অভীষ্ট লক্ষ্য, স্বপ্ন, সবকিছুই তিনি ধারণ করতে পেরেছিলেন।"

গ্যারিওলসের ধারণাই যেন বঙ্গবন্ধুর বেলায় হুবুহু মিলে যায়। স্থান, কাল, পাত্র ভেদে হয়তো বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি একটু পৃথক হতে পারে কিন্তু মূল ভাবটা ঠিকই আছে।

১৯৬৯ সালে জেল থেকে মুক্তি পাবার পর তিনি ৬ দফা নিয়ে আরেক চমক সৃষ্টি করেছিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়ে ৬ দফা উত্থাপন করে গোলটেবিল বৈঠক ভেঙে দিয়ে আইয়ুব খানের পতনকে ত্বরান্বিত করেছিলেন। এদিকে ১৯৬৯-এর ১০ মার্চ আইয়ুব খানের আহুত গোলটেবিল বৈঠকে অনেকের নিষেধ সত্ত্বেও যেখানে মাওলানা ভাসানী বর্জন করলেন আইয়ুব খানের আহ্বান, সেখানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দলবল নিয়ে হাজির হলেন ৬ দফা নিয়ে। সেখানেও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৌশলের আশ্রয় নেন।

বিশিষ্ট সাংবাদিক ও স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের চরমপত্র খ্যাত জনাব এমআর আকতার মুকুল তাঁর 'ভাসানী মুজিবের রাজনীতি' গ্রন্থের ১৭৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন–

> "শেখ মুজিব ৬৯ সালের ১০ই মার্চের দ্বিতীয় বৈঠকে যোগদান করলেন। রাজনীতিতে এটা ছিল জুয়া খেলার মতো। স্বৈরাচারী আইয়ুবের সংগে কোন আলোচনা হতে পারে না বলে যেখানে ভাসানী, ভুট্টো বৈঠক বর্জন করেন তাদের জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য, সেখানে আইয়ুবের দালাল বলে আখ্যায়িত করার আশংকা থাকা সত্ত্বেও শেখ মুজিব রাওয়াল পিণ্ডিতে আহুত গোলটেবিল বৈঠকে ১০ই মার্চ থেকে শুরু করে উপর্যুপরি ৪ দিন ধরে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা অব্যাহত রাখলেন। কিন্তু কেউই সিংহপুরুষ শেখ মুজিবকে তার ৬ দফা দাবী থেকে সামান্যতম বিচ্যুত করতে সক্ষম হলেন না। এই বৈঠকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে লিখিত ভাষণ দিয়েছিলেন তা অবিস্মরণীয় থাকবে। আবাল-বৃদ্ধ বনিতা অবাক বিস্ময়ে এক ঐতিহাসিক ঘটনা অবলোকন করল। সমগ্র বাঙালি জাতি অনুধাবন করতে সক্ষম হলো যে, শত প্রলোভনেও শেখ মুজিব জনগণের প্রতি কোন রকম বিশ্বাসঘাতকতা করেননি, করবেনও না। এ ধরনের চাঞ্চল্যকর ঘটনার জের হিসাবে রাজনীতির রেস খেলায় মুজিব তার প্রতিদ্বন্দ্বী ভাসানী, ভুট্টোর চেয়ে বহুদূর এগিয়ে গেলেন।"

এ ছিল সাংবাদিক রাজনৈতিক বিশ্লেষক হিসাবে এমআরআকতার মুকুলের মূল্যায়ন। তবে এর বাস্তবতা ছিল আরেকটি। যেটি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। তখনকার আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক, এরশাদ সরকারের প্রধানমন্ত্রী

মিজানুর রহমান চৌধুরী ১৯৯৯ সালে অবসর অবস্থায় একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে নিরিবিলি পরিবেশে বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা নিয়ে আলাপের এক পর্যায়ে তিনি বলেছিলেন, সেটা ছিল বঙ্গবন্ধুর একটি কৌশল। কেউ যখন যাবে না, তখন খালি মাঠে পাকিস্তানের জনগণ তথা দেশী ও আন্তর্জাতিক পত্র-পত্রিকায় তথাকথিত লৌহমানব আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে ৬ দফার মতো একটি নতুন কর্মসূচি দিয়ে চ্যালেঞ্জ করা। আওয়ামী লীগের ৬ দফাটি পাকিস্তানের পত্র-পত্রিকাগুলোতে এবং আন্তর্জাতিকভাবে আলোচিত হতে থাকে। এভাবেই কৌশল অবলম্বন করে এগিয়ে গেছেন। পরবর্তীতে আইয়ুব খানের পদত্যাগের পর ইয়াহিয়া খানের ঘোষিত নির্বাচনে যোগদানও ছিল আরেকটি কৌশল। সে নির্বাচনে মাওলানা ভাসানীসহ কতিপয় রাজনৈতিক দল নির্বাচন বর্জন করলেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার। এটাই ছিল সব চাইতে সফল কৌশল।

তিনি গভীরভাবে অনুধাবন করতে পারলেন যে, বাঙালি অনেকদিন যাবৎ সরাসরি নির্বাচনী ভোটে অংশগ্রহণ করতে পারেনি। জনগণ ভোটে অংশ নেওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। আর একটি বিষয় সূক্ষ্মভাবে অনুভব করলেন। নতুন ভোটারদের ভিতর ছিল তরুণ সমাজ যারা স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যে স্বাধীনচেতা। যুব সমাজের একটি বিশাল অংশই আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলন বা পাকিস্তান সরকার বিরোধী আন্দোলন করে নির্যাতিত হয়েছে। এদের বেশির ভাগই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির শ্লোগান দিয়েছে। অন্যদিকে আইয়ুব-মোনায়েম দুই ভাইয়ের ফাঁসি দাবি করেছে। সুতরাং এরা ভোট দেবার সুযোগ পেলে মুসলিম লীগ সরকারের, অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানের অনুগত কোনো দলকেই ভোট দিবে না।

এই সুযোগ কোনোভাবেই হাতছাড়া করতে চাইলেন না। যত ষড়যন্ত্রই হোক, যে যত কথাই বলুক, নির্বাচনের এই সুযোগ নিয়ে নির্বাচিত নেতা হওয়া গেলেই পূর্ববাংলার রাজনীতিতে নতুন এক ভাবধারা সৃষ্টি করা যাবে।

তিনি সূক্ষ্মভাবে অনুভব করলেন, তরুণ ছাত্রসমাজের একটি বৃহত্তর অংশই বঙ্গবন্ধুকে সংগ্রামের প্রতীক মনে করে। সময়ের বিচারে তরুণদের হৃদয়ে তখন পশ্চিম পাকিস্তানি সরকারের বিরুদ্ধে সরকার বিরোধী মনোভাব যেন অগ্নিসমতুল্য। বিশেষ করে মুসলিম লীগ, জামায়েতেইসলামী, সহ মৌলবাদী উগ্র সংগঠনের বিরুদ্ধে তপ্ত তেলভরা কড়াইয়ের মতো। তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলেন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য।

আবেগপ্রবণ বাঙালি জাতির বৈশিষ্ট্যই এরকম। হঠাৎ আবার সময় গড়ালেই ধীরে ধীরে এ আবেগ স্তিমিত হয়ে যেতে পারে। তাই তিনি নিজেকে এবার সারা

পাকিস্তানের নেতৃত্বের ম্যান্ডেট নেওয়ার কৌশল অবলম্বন করলেন। যত বাধাই আসুক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে হবে। পাকিস্তান সরকার যত বিধি জারী করুক তার ভেতর দিয়ে তিনি তার ছয় দফাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। পাকিস্তান সরকারের এসব বিধি-বিধান যে এক সময় বাঙালি ভুলে যাবে তা তিনি ভালোভাবেই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। কোনো রকম নির্বাচনের মাধ্যমে তিনি জনগণের সামনে যেতে পারলেই হলো। আর জনগণকে এই সুযোগে ঘর থেকে বের করে আনতে পারলেই ব্যাস। তারপর তাদের দিয়ে তিনি লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হবেন। কিন্তু নির্বাচন নিয়ে নানা দল নানা মত দিতে শুরু করল। অন্যদিকে মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানী নির্বাচন বর্জনের ডাক দিলেন। তখন তাঁরই সহকর্মী অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ ন্যাপের এক অংশের নেতৃত্ব নিয়ে নির্বাচনে যোগদানের ঘোষণা দিলেন। একত্রিত ন্যাপ যখন ভেঙে অগোছালো অবস্থায় তখন নির্বাচন করলে যে ভালো ফলাফল পাওয়া যাবে না তা ভেবেই নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিলেন। নির্বাচন বর্জন করার হুমকি দিয়ে নতুন এক শ্লোগানের সৃষ্টি করলেন। ভাসানী সাহেবের কর্মীরা শ্লোগান দেওয়া শুরু করেন, "ভোটের বাক্সে লাথি মার, নির্বাচন বর্জন কর।"

ন্যাপের এই সিদ্ধান্তের কারণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আরও সুযোগ পেয়ে গেলেন। নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার ঘোষণা দিয়ে প্রার্থী বাছাইয়ের নির্দেশ দিলেন অধিনস্ত নেতৃবৃন্দকে। দলে দলে বিভিন্ন পেশার বিভিন্ন ধরনের মানুষ প্রার্থী হবার আশায় আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে যোগাযোগ করতে থাকে। তিনি যথা সম্ভব তরুণ এবং দীর্ঘ লড়াই-আন্দোলনে সম্পৃক্ত নেতৃবৃন্দকে এবং শিক্ষিত মেধাবী লোকদের মনোনয়ন দেওয়ার জন্য সাক্ষাৎকার বোর্ডকে নির্দেশ দিলেন।

সে সময় হুজুগে মেতে অনেক লোকই মনোনয়ন পাবার জন্য দৌড় ঝাঁপ শুরু করলেন। কিন্তু তিনি খুব সতর্কতার সাথে বেছে বেছে মনোনয়ন দিলেন। এদেশে একটা পুরনো প্রবাদ আছে, "সুসময়ে বন্ধু বটে, অসময়ে নয়"– এই ব্যাপারটা মাথায় রেখে তিনি মনোনয়ন দেওয়ার নির্দেশ দিলেন।

বেশির ভাগ প্রার্থী ছিলেন তরুণ বয়সের এবং বিশেষভাবে লক্ষণীয় এরা দেশের মধ্যবিত্ত, এমনকি নিম্নবিত্ত পরিবারের শিক্ষিত শ্রেণীর। মানসিকভাবে বিক্ষুব্ধ ছিল বাইশ পরিবার, তথা মুসলীম লীগের অভিজাত খাজা-গজাদের বিরুদ্ধে।

পঞ্চাশের দশকের জমিদারি প্রথা বিলোপের পর পরই এই অভিজাত শ্রেণীটি গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসে। এদের সাথে সামাজিকভাবে জীবন-যাপনে দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে ওঠে। একদিকে গ্রামের কৃষকের সদ্য শিক্ষিত তরুণ রাজনীতিবিদ অন্যদিকে জমিদারি মনোভাবাপন্ন উর্দুপ্রীতির অভিজাত আশরাফ মুসলমান। এই দুই শ্রেণীর

মধ্যে সামাজিক সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব ছিল প্রকট। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ দূর্গে আঘাত হেনে তাদেরকে ধীরে ধীরে পরাজিত করতে লাগলেন। তাঁর চিন্তা-চেতনা, বুদ্ধি-প্রজ্ঞা যেন খুলে গেল। কাজগুলি, সিদ্ধান্তগুলি যেন তীরের মতো অব্যর্থ লক্ষ্যে পৌঁছাতে শুরু করলো।

বঙ্গবন্ধুর নির্বাচনী জনসভাগুলোতে নতুন নতুন তথ্য সম্বলিত কথা বলে জনগণকে সচেতন করতে থাকেন। সময়োপযোগী বক্তব্য, বাঙালিদের চেতনার বিভিন্ন দিকগুলি উপলব্ধি করে সাবধানে বক্তৃতা করতেন। মনে হয় যেন তিনি অনেকদিন পর আবার সুযোগ পেলেন জনগণের কাছে যাওয়ার। কথা বলার এই তো সুযোগ। জনগণকে বোঝানোর এই তো সুযোগ। এই সুযোগটাই তিনি কাজে লাগাতে চাইলেন। সময়ের বিবর্তনে যেন নতুন এক সমাজ গঠন করার জন্য তরুণ সমাজ উন্মুখ হয়ে আছে, প্রস্তুত হয়ে আছে।

নতুন মানুষ, নতুন ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-ভাবনা এবং নতুন চেতনা নিয়ে নব প্রজন্ম প্রস্তুত হয়ে আছে। সময়কে পর্যবেক্ষণ করে জনগণের মানসিক অবস্থা বিবেচনা করে তিনি কথা বলছেন, এগিয়ে যাচ্ছেন। কারণ, এ চেতনা যে তিনি সৃষ্টি করেছেন। এ নতুন ভাবনা যে তিনি ভাবতে শিখিয়েছেন, মানসিক শক্তির ভাণ্ডার যে তিনিই পূর্ণ করেছেন তাঁর অমোঘ মন্ত্র দিয়ে। সুতরাং তিনি যা গড়েছেন তা কালের বিচারে তিনিই তো তার খোরাক দেবেন– এটাই সত্যি।

বাংলার জনগণকে গড়ে তুলেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ণ স্বাধীনতাকামী বাঙালিতে। দীর্ঘদিনের লড়াই, সংগ্রামে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে চাওয়া-পাওয়ার চিন্তা-চেতনাতে, শক্তিতে-সাহসে দৃঢ় চিত্তে বাংলার প্রতিটি বাঙালি কতিপয় মানুষ ছাড়া সবাই একজন বঙ্গবন্ধু। একজন অন্তর্ধান হলেও কোনো ঘাটতি নেই। বঙ্গবন্ধুর অসংখ্য প্রতীকি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলার ঘরে ঘরে প্রস্তুত। এ প্রস্তুতি বিশ্বে বিরল।

নির্বাচনে পোষ্টার, দেয়াল লিখনে জনগণ দেখবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কি বলেছেন, কি লিখেছেন– তার উপর ভিত্তি করে অনেক কিছু হওয়া সম্ভব। তাই নির্বাচনের পোষ্টারের দিকে গুরুত্ব দিলেন তিনি। অভিনব কৌশল অবলম্বন করলেন। নির্বাচনে তিনি দুটি পোষ্টার ছাপলেন। একটিতে নৌকা মার্কায় ভোট চেয়ে। অন্যটিতে 'পূর্ববাংলা শ্মশান কেন'– এই শিরোনামে অর্থনৈতিক বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরলেন। দলীয় কর্মীদের নির্দেশ দিলেন, অর্থনৈতিক বৈষম্যের চিত্র সম্বলিত পোষ্টারটি গ্রামে গ্রামে পৌঁছে দেবার জন্য। সহজ ভাষায়, সহজ কথায়, এই চিত্র তুলে ধরা হয় এবং কর্মীরা ভোটারদের এই বৈষম্যের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করে নৌকা মার্কায় ভোট চাইতে থাকে।

জনতা এই পূর্ব এবং পশ্চিমের বৈষম্যের চিত্র পোষ্টারে দেখে পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হতে থাকে। ক্রমশই তা প্রচার করে গ্রাম বাংলার জীর্ণকুটির থেকে শুরু করে শহরের অভিজাত এলাকায় পৌঁছে যায়। এই পোষ্টার ছাপানোর কয়েকদিনের মধ্যেই নির্বাচনী জনসভাগুলিতে জনগণের উপচেপড়া ভিড় এবং দিন দিন আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের পিছনে তরুণ সমাজের অধিকতর অংশগ্রহণ স্পষ্টতই প্রতীয়মান হতে থাকে। এভাবেই প্রজ্ঞার প্রতিফলন ঘটিয়ে এগিয়ে যেতে থাকেন তিনি।

অন্যদিকে মুসলিম লীগ ও জামায়েতে ইসলামীর ইসলামী হুকুমত কায়েমের ঘোষণা এবং পাকিস্তান রক্ষা করার প্রচারণা চালাতে থাকে। আওয়ামী লীগকে ভারতের দালাল, বঙ্গবন্ধুকে হিন্দুদের এজেন্ট বলে প্রচার করতে থাকে। ইসলামের দোহাই দিয়ে অনেক মোল্লা, মাওলানা ভাড়া করে বাংলার জনগণকে বিভ্রান্ত করার কৌশল অবলম্বন করে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিভিন্ন জেলায় সফর করে নির্বাচনী জনসভা করতে থাকেন। যেখানে যা বলার প্রয়োজন তা কৌশলে বলতেন। সরকার বঙ্গবন্ধুর কৌশল বিশ্লেষণ করত। পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা সর্বদাই তার পিছনে জোঁকের মতো লেগে থাকতো। কখন, কোথায় তিনি কী করলেন, তা গোপনে রেকর্ড করতো তারা। বঙ্গবন্ধুও খুব সতর্কতার সাথে বক্তব্য দিতেন। সামান্য পান থেকে চুন খষলেই যে, অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবেন না তা তিনি খুব ভালো করেই জানতেন। তারা জনগণকে বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করবে তা তিনি উপলব্ধি করতেন। তিনি দূরদর্শিতা নিয়ে বক্তব্য রাখতেন এবং সিদ্ধান্ত নিতেন যা নির্ভুল ত্রুটিমুক্ত ছিল। এরকমই একটি ঘটনার কথা লিখেছিলেন পাকিস্তানের সামরিক গোয়েন্দা কর্মকর্তা সিদ্দিক সালিক তাঁর রচিত 'উইটনেস টু সারেন্ডার'-এর ১৭ পৃষ্ঠায়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পরম আস্থায় তাঁর সিনিয়র সহকর্মীদের সাথে এল.এফ.ও নিয়ে আলোচনা করতেন। তিনি জানতেন তাঁর কথাগুলো ইয়াহিয়া খানের জন্য টেপ হয়ে যাচ্ছে। সেই রেকর্ডকৃত টেপে বঙ্গবন্ধু মুজিব বললেন, "আমার লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা। নির্বাচন শেষ হওয়ার সাথে সাথে ঐ এল.এফ.ও টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবো। নির্বাচনের পর কে আমাকে চ্যালেঞ্জ করবে।"

কথাগুলো বলেছিলেন অনেক ভেবে-চিন্তে। কারণ, পাকিস্তানিরা চাইছিলেন তাঁকে ব্ল্যাকমেইল করতে। তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে পাকিস্তানের ঐক্য রক্ষা বা ৬ দফার বিরুদ্ধে কোনো কানাকড়ি বক্তব্য দেয়াতে পারলেই ব্যাস তা টেপ রেকর্ডে

সংগ্রহ করে তা জাতীয় প্রচার মাধ্যমে প্রচার করে বাঙালিদের কাছে বেঈমানে পরিণত করা। অথবা জনগণের কাছে প্রতারক, ঠকবাজ বানানো। সর্বদাই ওৎ পেতে থাকতো গোয়েন্দা সংস্থার লোকেরা। এমন কোনো বক্তব্য পাওয়া যায় কিনা। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জানতেন, এমন বক্তব্য দিতেন যা পাকিস্তান সামরিক সরকার প্রচার করতো না। কারণ স্বাধীনতার পক্ষে ৬ দফার পক্ষে বাঙালির পক্ষের বক্তব্য রেকর্ড করলেও তা জাতীয় প্রচার মাধ্যমে প্রচার করত না।

নির্বাচনের সময় বক্তৃতা, সিদ্ধান্ত, সাংবাদিকদের সাক্ষাৎকার সব তিনি নিজে দিতেন। সব দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিলেন। বিশেষ করে নির্বাচনের কৌশলগুলি। যদিও সহকর্মীদের কাজ ঠিক করে দিতেন, কর্মীরা আনুগত্যের সাথে সেগুলো পালন করতো। তিনি সর্বদা ভাবতেন, কৌশল অবলম্বনের যে কথা বললে বাঙালিদের একত্রিত করা যাবে, যে কথা বললে বাঙালি বিশ্বাস করবে সেভাবে তিনি আত্মবিশ্বাসের সাথে কথা বলতে লাগলেন। সহকর্মীদের নির্দেশ, বিভিন্ন কৌশল অবলম্বনের এবং নিজে যা করবেন, বলবেন তা কয়েকজনের সাথে আলোচনা করলেও সতর্কতার সাথে গোপনে করতেন। সময় বৃদ্ধির সাথে সাথে কৌশল পরিবর্তন করতেন। অরাজনৈতিক পেশাজীবী ব্যক্তিত্ব ও সুশীল সমাজের লোকজনও বিশেষভাবে অনুগত হতে থাকে তাঁর আদর্শের প্রতি। এ যেন মনের তাগিদেই সবাই শ্রদ্ধা নিয়ে আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর ছায়াতলে আশ্রয় নেওয়া। কারো প্রতি কোনো বল প্রয়োগ নেই। এরকম পরিস্থিতিতে কি করা? বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যেন আইনস্টাইনের মূল্যবান কথাগুলি মনে রেখেই সিদ্ধান্ত নিতেন।

আইনস্টাইন তার 'Living Philosophies' গ্রন্থের ত্রয়োদশ প্রবন্ধের ৯৩-৯৪ নং পৃষ্ঠায় উক্তি করেন–

> "আমি গভীরভাবে উপলব্ধি করি যে, কোন যৌথ কাজের সাফল্যের জন্য সে সম্বন্ধে চিন্তা করার ও পরিচালনা করার দায়িত্ব একজন লোকের উপরই দেওয়া উচিত। তাকে যারা পরিচালিত করেন তাদের বাধ্য করা চলবে না। নেতা নির্বাচনের সুযোগ তাদের অবশ্যই থাকতে হবে। আমার বিশ্বাস, আনুগত্য আদায়ে বল প্রয়োগ নির্ভর স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা অচিরেই বিকারগ্রস্ত হয়।"

তিনি যথার্থভাবে উপলব্ধি করেছেন, একটি যৌথ সার্বিক কাজকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য একজনকেই দায়িত্ব নিতে হয়। অন্যরা পরিচালিত নেতার নির্দেশ অনুযায়ী নিজ ইচ্ছায়, নিজ দায়িত্ববোধ থেকে। এখানে সহকর্মীদের কোনো বল প্রয়োগ করা নয়। এভাবেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এগিয়ে যাচ্ছিলেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচন। এই নির্বাচনের অংশগ্রহণ সবচেয়ে সফল কৌশল ছিল তাঁর। ভাসানীসহ

অনেক নেতৃবৃন্দ ইয়াহিয়া খানের লিগ্যাল ফ্রেম ওয়ার্কের অধীনে নির্বাচনে যেতে চাইলেন না। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঠিকই সিদ্ধান্ত নিলেন নির্বাচনে যাওয়ার। জনগণের দীর্ঘ দিনের আন্দোলনে নির্যাতিত জাতি-গোষ্ঠী উন্মুখ হয়ে আছে পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা দেওয়ার জন্য। জনগণের এই বিক্ষুব্ধতার ফসল নিজের পক্ষে নেওয়ার সব আয়োজন শুরু করলেন। নতুন ভোটারগণ তরুণ সমাজ, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব গ্রহণ করবে। যাদের দেশ, ভাষা-সংস্কৃতি এবং চাকুরি-ব্যবাসয়ে নিজেকে সমৃদ্ধ করা। অন্যদিকে মুসলিম লীগ ও জামায়েতে ইসলামীর ধর্মকে ব্যবহার, ধর্ম ব্যবহার করে জনগণকে বোকা বানানো, তারা এই অপকৌশল বুঝে গেছে। তরুণ সমাজের কাছ থেকে জনগণের নিরক্ষর অংশটিও বুঝতে পেরেছে যে বাংলা ভাষা, বাঙালি জাতি স্বতন্ত্র জীবন-যাপন, চলাফেরা, আচার-আচরণ, উৎসব-পার্বন, পোশাক-পরিচ্ছদ কোনোটাই আমাদের সাথে পশ্চিমাদের মিল নেই। দ্বিতীয়ত, তারা এদেশের ধান, পাট, চামড়া, পূর্ব বাংলার জাতীয় সম্পদ বিদেশে রপ্তানি করে উপার্জিত অর্থ দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নে ব্যয় করে, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে কোনো কল-কারখানা স্থাপন করে না। দিন দিন তরুণরা বেকার হয়ে যাচ্ছে। জনগণ এবার ভাবতে থাকে এরা শুধু ধর্মের দোহাই দিয়ে, ভারতের হিন্দুদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়িয়ে আমাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে চায়। তিনি তাঁর প্রতিপক্ষ তথাকথিত দক্ষ প্রবীণ নেতৃবৃন্দকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে জনপ্রিয়তার সনদ নিতে আহ্বান জানালেন। তিনি বললেন, এখন দেখা যাবে জনগণ কাকে ম্যান্ডেট দেয়, কাকে নেতা নির্বাচন করে। আসুন সবাই নির্বাচনের মাঠে।

৩০ অক্টোবর, ১৯৭০ সালে জয়দেবপুরে জনসভায় তিনি বলেন, "বাংলার উর্বর মাটিতে যেমন সোনা ফলে, ঠিক তেমনি পরগাছাও জন্মে। একইভাবে বাংলাদেশে কতগুলো রাজনৈতিক পরগাছাও রয়েছে, যারা বাংলার দুঃখ-দুর্দশার জন্য দায়ী। আসন্ন নির্বাচনে এসব পরগাছাদের শুধু উৎপাটিত করবো না, চিরতরে নির্মূল করবো।"

এক শ্রেণির বামপন্থি নেতা কর্মীরা চীন-রাশিয়ার মন্ত্র মুখস্থ করে এদেশের নিরক্ষর, অর্ধশিক্ষিত শ্রমিক-কৃষকদের মার্কস এবং লেনিন-এর তত্ত্বকথা মুখস্থ করানোর চেষ্টা করে। ব্যাপারটা অনেকটাই হাস্যকর। নিজ দেশের সমস্যা এবং জনগণের চাহিদার কথা না ভেবে বিদেশি মন্ত্র মুখস্থ করে তাত্ত্বিক কথা বলে জনগণকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। অন্যদিকে ধর্মভিত্তিক দলগুলো ইসলামের কথা বলে, কথায় কথায় ধর্ম গেল গেল বলে জিগির তোলে। তারা সরলমনা ধর্মভীরু বাঙালিদের তেইশ বছর শোষণ করেছে শুধুমাত্র ধর্মকে

ব্যবহার করে। এরা আবারও নির্বাচনের মাঠে নেমে আবার জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করতে থাকে। নির্বাচনে জনগণের কাছে এদের গ্রহণযোগ্যতা শূন্যের কোঠায় নামানোর কৌশল নিলেন বঙ্গবন্ধু।

তিনি এল.এফ.ও-এর অধীনেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন বলে ঘোষণা দিলেন। প্রতি মুহূর্তে তাঁর এই সূক্ষ্ম গভীর কৌশলগুলোর লক্ষ্য ছিল প্রতিপক্ষকে পরাজিত করা। শেষ পর্যন্ত শক্তিশালী একটি প্রতিপক্ষের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গিয়েছিলেন তিনি। যার জন্য তার কৌশলকে ঘায়েল করার মতো স্থির সিদ্ধান্তে উপনিত হতে পারেনি কেউ।

নির্বাচনকালীন কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। একদিকে তরুণ একদল ছাত্র নেতা যাদের মধ্যে অনেকেরই আকর্ষণ ছিল সমাজতন্ত্রের প্রতি, আরেক দিকে ছিল সম্পূর্ণ দক্ষিণপন্থী ছাত্রনেতারা। একদিকে অতি বিপ্লবী তরুণ সমাজ, অন্যদিকে দলের ভেতর ছিল নতুন লোকদের আনাগোনা। কে কোন মতাদর্শের, কোন মতলবের সেটাও লক্ষ্য রাখতে হতো তীক্ষ্ণ সজাগ দৃষ্টিতে, অবশ্যই তাদের নজর এড়িয়ে। অন্যদিকে পাকিস্তানি সামরিক সরকার। তারা কিভাবে নির্বাচন করবে সেদিকে তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখতে হয়েছে ওনাকে। এমনি হাজারো সমস্যা মাথায় নিয়ে প্রস্তুত হলেন নির্বাচন করার। তিনি নিজ কৌশলী পরিকল্পনা ও বুদ্ধিমত্তা দ্বারা পাকিস্তানি গোয়োন্দা সংস্থার নিরূপিত নির্বাচনী ফলাফলও পাল্টে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এই নির্বাচন সম্পর্কে পাকিস্তানি গোয়েন্দ সংস্থার রিপোর্ট ছিল বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না। একশ'র হয়তো কিছু বেশি পাবে যা সংখ্যাগরিষ্ঠতা কিংবা ক্ষমতা গ্রহণের জন্য যথেষ্ট নয়। নির্বাচনে গোয়েন্দা সংস্থা লক্ষ লক্ষ টাকা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তথা আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে জনগণের মাঝে বিভ্রান্তি ছড়ানোর জন্য পাকিস্তানপন্থী দলগুলোকে দিয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল এমন অপপ্রচার চালানো যাতে মানুষ মনে করে আওয়ামী লীগ প্রকৃতপক্ষে ভারতের দালাল এবং ক্ষমতায় গেলে এদেশের স্বার্থের পরিবর্তে ভারতের তথা হিন্দুদের স্বার্থে কাজ করবে। তারা ক্ষমতায় গেলে এদেশের মুসলমানরা ধর্ম পালন করতে পারবে না বরং তারা হিন্দু হয়ে যাবে। এজাতীয় জঘন্য সব অপপ্রচারের মাধ্যমে আওয়ামী লীগকে ঘায়েল করাই ছিল তাদের মূল উদ্দেশ্য।

এসব তথ্য মুক্তিযুদ্ধে বুদ্ধিজীবী হত্যার নায়ক, পাকিস্তানের সেনা কর্মকর্তা মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলির 'ভুট্টো, মুজিব, বাংলাদেশ' গ্রন্থ জুড়ে রয়েছে। এই তথ্যগুলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঠিকই সংগ্রহ করে ফেলতেন।

সাথে সাথে তাঁর বক্তৃতার কৌশল ও ধরন পরিবর্তন হয়ে যেত। ফলে সহজেই তাদের ষড়যন্ত্র ধূলিসাৎ হয়ে যায়। প্রতিপক্ষ সেই সব পাকিস্তানি কর্মকর্তাদের আফসোসের কথা লেখা রয়েছে এই বইয়ে। যেমন– 'মুজিব আমদের কী বলে আবার জনগণকে কি বুঝায়– কিছুই বুঝি না।' হয়তো বুঝলে সুষ্ঠু পদক্ষেপ নিয়ে বঙ্গবন্ধুকে প্রতিরোধ করতে পারত তারা।

সব ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে নির্বাচনী ইশতেহার তথা বক্তৃতা বিবৃতি এবং প্রতিদিন মানুষকে আরও কাছে টানার কৌশল অবলম্বন করতে থাকলেন। শেষে নির্বাচনে কী হল, কী ধরনের ফল হলো এবং তিনি জনগণের মাঝে কিসে পরিণত হয়েছিলেন তা তো ইতিহাসেই অমর হয়ে আছে।

ওনার দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে একটি সফল নতুন রাজনৈতিক দর্শন গঠিত হলো– বাঙ্গালিত্ব ধারা– যা জাতীয়তাবাদের গোড়াপত্তন করল। দর্শন যে মানুষের চেতনার পরিবর্তনেই সীমাবদ্ধ নয়, এযে সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়, তা ষাটের দশকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাংলা, বাঙালি, বাঙালিদের জন্য একটি স্বাধীন রাষ্ট্র– এই জাতীয়তাবাদী দর্শন আগুনের ফুলকির মতো কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র-জনতার মাঝে ছড়িয়ে পড়ে।

ড. আমিনুল ইসলাম দর্শনের গঠনমুলক আরেকটি রূপের তথ্য দিয়েছেন। তাঁর 'মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি' গ্রন্থের ৫ নং পৃষ্ঠায় তথ্য পাওয়া যায়–

> "প্রকৃত জীবন থেকে দর্শনকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার এই দৃষ্টিভঙ্গিকে আধুনিক দার্শনিকগণ প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাদের কাছে দর্শন শুধু তথ্যানুসন্ধান নয় বরং উন্নততর জীবন এবং সে জীবন অর্জনের জন্যে প্রয়োজনীয় জনগণের দাবির বাস্তব প্রকাশ। দর্শনের কাজ শুধু বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে জগৎকে জানাতে ব্যাখ্যা করা নয় বরং শান্তি ও সংহতিপূর্ণ এক নতুন সমাজব্যবস্থার কায়েমের পন্থা ও একে ব্যবহার করা।"

এটি সত্যি বলে প্রতিভাত হয়েছে। জাতীয়তাবাদের এই নতুন দর্শন দ্রুত পরিবর্তন করে দেয় পূর্ব বাংলার তরুণ সমাজের মনোজগৎকে, যা বাঁধভাঙা জোয়ারের মতো প্লাবিত হতে থাকে সমাজের সর্বস্তরে। সেই সময় জাতীয়তাবদী দর্শন ছিল তরুণ সমাজের রক্তে-মাংসে, অস্থি-মজ্জায়, মননে পরিপূর্ণ। এই দর্শনকে হৃদয়ে ধারণ করে তরুণ ছাত্রসমাজ শ্লোগান দিত– "তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা-মেঘনা-যমুনা।" "পিন্ডি না ঢাকা– ঢাকা, ঢাকা।" "আমি কে, তুমি কে– বাঙালি, বাঙালি।" "বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর।" এই সব শ্লোগানই হচ্ছে এই শক্তিশালী দর্শনের প্রতিফলন। দলবদ্ধ হয়ে এই সব তরুণরা জনগণকে সচেতন

করেছে, স্বাধীনতার মন্ত্রে তাদেরকে উজ্জীবিত করেছে। তারা গ্রাম-বাংলায় ঘুরে ঘুরে নির্বাচনী জনসভাগুলোতে বক্তব্য দিয়েছে ও বুঝিয়েছে– বাঙালিদের এই বাংলা ভাষা শত শত বছরের পুরনো। আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতি স্বতন্ত্র, অর্থাৎ চালচলন, আচার-ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাওয়া-দাওয়া, শারীরিক গঠন তথা আঞ্চলিক লোকজ উৎসব-অনুষ্ঠান বেশির ভাগ জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে রয়েছে ভিন্নতা। আমাদের বাঙালিদের জীবন-যাপনের সংস্কৃতি পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের জীবন-যাপনের সংস্কৃতির মধ্যে অনেক পার্থক্য। আমরা এই ভূখণ্ডের বাংলা ভাষাভাষী বাঙালিরা ঐ পশ্চিম পাকিস্তানের উর্দুভাষী সেনা শাসনাধীনে আর থাকতে চাই না। এভাবেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ ও শ্রমিকলীগের নেতা-কর্মীরা নির্বাচনের সময় বাঙালিদের সচেতন করেছিলেন।

১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন লাভ করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকার দুইটি আসন থেকে বিপুল ভোটে জয়ী হন। এই নির্বাচনেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ণ বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞার প্রতিফলন ঘটিয়ে সারা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাংবাদিক সম্মেলনে বললেন, "আওয়ামী লীগের বিজয় প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের লাখো লাখো নির্যাতিত মানুষের বিজয়।"

নির্বাচনের পর শুরু হয় নতুন করে ষড়যন্ত্রের পালা। পাকিস্তান সরকারের গোয়েন্দা সংস্থা নির্বাচিত সদস্যদেরকে অর্থ ও ক্ষমতার লোভ দেখিয়ে ৬ দফার বিরুদ্ধে একটি স্বতন্ত্র ফ্রন্ট গঠন করার পাঁয়তারা শুরু করে। এদিকে ১৯৬৯-এর গণ-আন্দোলনের পর বঙ্গবন্ধুর আদর্শের প্রতি অনুগত হয়ে আন্দোলন ও নির্বাচনের ডামাডোলে অনেক নতুন লোকই দলে যোগদান করে প্রার্থী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। এদের মধ্যে অনেকেরই পূর্বে কোনো রাজনৈতিক পরিচিতি ও অভিজ্ঞতা ছিল না। সময় সংকীর্ণতার কারণে পারিবারিক রাজনৈতিক ঐতিহ্যের পরিচয় নেওয়ার মতো সময়ও ছিল না। এমনি আরও অন্যান্য সমস্যার কারণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বদা এই চিন্তাই করতেন যে, কোনো একটি সদস্যকে দিয়েও যদি পাকিস্তান সরকার ৬ দফার বিরুদ্ধে বক্তব্য দেওয়াতে পারে তাহলে তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো ব্যাহত হতে পারে। তিনি পাকিস্তানিদের এ ষড়যন্ত্র অনুধাবন করতে পেরে সিদ্ধান্ত নিলেন সকল নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে স্বাধীনতাকামী লক্ষ লক্ষ লোকের সামনে শপথ করবেন। কেউ যদি বাঙালির প্রাণের দাবি ৬ দফার সাথে বেঈমানি করে, তাহলে তাদের পরিণতি কি হবে তা জনতার সামনেই বলা হবে।

তাই তিনি বিলম্ব না করে কৌশলের আশ্রয় নিলেন। ৩ জানুয়ারি ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে প্রায় ২০ লক্ষ স্বাধীনচেতা মানুষের এক সমাবেশে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে নির্বাচিত আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যদের জনগণের সামনে শপথ করান। শপথের পর তিনি নির্বাচিত সদস্যদের উদ্দেশে ৫০ মিনিট ভাষণ দেন। এতে জনগণের সাথে আওয়ামী লীগ বিশ্বাসঘাতকতা করবে না বলে প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফের ঘোষণা দিলেন। সকল খাসজমি বাস্তুহারাদের মধ্যে বণ্টন করার কথা বললেন। চর এলাকায় বাস্তুহারাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবেন। তিনি আরও বললেন, আমি কৃষক-শ্রমিককে কথা দিচ্ছি আওয়ামী লীগ তাদের সাথে বেঈমানি করবে না। কারণ, আমি বিশ্বাস করি আওয়ামী লীগের মাথা কিনবার মতো ক্ষমতা পুঁজিপতিদের নেই। এরা কেউ, এমনকি আমিও যদি বিশ্বাসঘাতকতা করি তাহলে আমাকে জীবন্ত কবর দিবে।

তিনি আবেগতাড়িত কণ্ঠে বলেন, প্রধানমন্ত্রী হবার ইচ্ছে আমার নেই। দেশে এখন গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। আমাকে আপনারা আর নাও দেখতে পারেন। প্রয়োজনে আমার শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও ঋণ শোধ করব। তাঁর প্রতি বাঙালির বিশ্বাস অবিচল ও অটুট রাখার জন্যই এই এই শপথ করানোর কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। তিনি আঁচ করতে পেরেছিলেন চীনপন্থী তথাকথিত সশস্ত্র বিপ্লবীদের বিভ্রান্তিকর মতবাদের ষড়যন্ত্র। তাই তিনি তাদের উদ্দেশ্যে ও ১৯৭১ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি একটি সংবর্ধনা সভায় ঘোষণা করেন–

> "বাংলার মানুষকে উদারতার সুযোগ নিয়ে লুটপাট করা হয়েছে। যে পাঁচ লক্ষ টাকার মালিক ছিল সে এখন পাঁচ কোটি টাকার মালিক। ইসলামের নামে পাকিস্তানের নামে, বাংলাদেশের জনগণকে সর্বশান্ত করা হয়েছে। তিনি জোর দিয়ে স্পষ্ট করে বললেন, আমারা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে বিশ্বাসী। তবে তা বিপ্লবের মাধ্যমে নয়। রাতারাতি দু'একজন ধনী লোককে হত্যা করলেই বিপ্লব হয় না। বিপ্লব হয় মাটি থেকে, সমস্ত জনগণকে বুঝিয়ে, সচেতন করে। আমরা ব্যাংক বীমা জাতীয়করন করব। বাংলার জনগণকে সর্বশান্ত করে যে বাইশ পরিবার গড়ে উঠেছে, আজ ব্যাংক, বীমা কোম্পানী তাদের নিয়ন্ত্রণে। আমি সব ব্যাংক, বীমা কোম্পানী জাতীয়করণ করে জনগণের সম্পদে পরিণত করবো।"

২৫ বিঘা জমির খাজনা মওকুফ করার কথা ঘোষণা করেন তিনি। এই কৌশলটি কৃষক-শ্রমিকদের মাঝে, যারা বামপন্থী সমাজতন্ত্রের সমর্থক ছিল তাদেরকে আশ্বস্ত করার জন্য। যাতে করে তারা বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে অবস্থান না নিতে পারে। আরেকটি

বিষয় লক্ষণীয় ছিল, তিনি সবকিছু আঁচ করতে পেরেছেন বলেই তিনি ছাত্রনেতাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, তিনি অবসরপ্রাপ্ত বাংগালী সৈন্যদের প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। দলীয় প্রধান হিসাবে দলীয় এমপি অবঃ কর্নেল এমএজি ওসমানীকে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন। সহকর্মীদেরকে কোথায় অবস্থান করে কি করতে হবে তা গোপনে নির্দেশ দিয়েছেন।

শেষ পর্যন্ত সমস্ত বাঙালি কর্মচারীকে বেতন দেওয়ার জন্য সরকারকে নির্দেশ দিলেন, যাতে গরীব শ্রমিক কর্মচারীদের মনোবল অটুট থাকে। বিশেষ করে ১৯৭০ সালেন নির্বাচনের পর প্রতিটি পদক্ষেপে সূক্ষ্মভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। অতি সতর্কতা ও প্রজ্ঞার সাথে দেশী-বিদেশী সাংবাদিকদের সাথে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। তখন এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল যে, পান থেকে চুন খষলেই আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা আন্দোলন ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। আমাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীন বাংলাদেশ হয়তো আমরা আর পেতাম না।

২০১২ সালের ডিসেম্বর মাসে 'সময়' নামক একটি টিভি চ্যানেলে ১৯৬৯-এর ছাত্র আন্দোলনের মহানায়ক, আওয়ামী লীগ নেতা তোফায়েল আহমদ একটি সাক্ষাৎকার দেন। ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের পরদিন ৮ মার্চ ১৯৭১ সাল। বঙ্গবন্ধুর সেই ভাষণ সম্বন্ধে পাকিস্তানি মিলিটারি গোয়েন্দা সংস্থার একটি রিপোর্ট জনাব তোফায়েল আহমদ বর্ণনা করেন।

পক্ষে সিরাজুল ইসলাম লেখেন–

"টিক্কা খানের আয়োজনে সেনাবাহিনী প্রস্তুত। সরাসরি স্বাধীনতা দিলে আক্রমণ শুরু করবে। কিন্তু চতুর শেখ মুজিব কৌশলে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে গেলেন– আমরা শুধু তাকিয়ে দেখলাম। তাকে বিশ্বাস করা– কাল ক্ষেপন।"

উপর্যুক্ত প্রতিবেদনটি স্পষ্টতই প্রমাণ করে যে, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা সংস্থাও বঙ্গবন্ধুর প্রজ্ঞার কাছে হার মেনেছিল।

১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চ কালরাতে নিরস্ত্র বাঙালিদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী। 'অপারেশন সার্চ লাইট' নামে হানাদার পশু পাকি বাহিনী হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। বঙ্গবন্ধুকে সে রাতেই গ্রেফতার করে পাকিস্তান সেনাবাহিনী। কথিত আছে বঙ্গবন্ধুর অনেক স্বজন ও আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ বঙ্গবন্ধুকে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু তিনি কোথায়ও যেতে চাননি। তিনি অনেক ভেবে-চিন্তে নিজ বাসভবনেই অবস্থান করছিলেন। সে অবস্থায়ই তিনি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে গ্রেফতার হন। এ ব্যাপারটি নিয়েও নিন্দুকেরা নানা সময়, নানা কটুক্তি করে। জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য অনেকেই

বলেছেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানিদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। আরেক দল বলে, তিনি আঁতাত করে ইচ্ছা করে নিজেই গ্রেফতার বরণ করেছিলেন। এই সব অযৌক্তিক বক্তব্য নিয়ে কিছু রাজনৈতিক দল রাজনীতির মাঠে ঢোল বাজাতেন। কিন্তু তাদের বোধগম্য হলো না, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যদি আত্মসমর্পণ করতেন তাহলে পাকিস্তানিরা বঙ্গবন্ধুকে দিয়ে ঘোষণার মাধ্যমে স্বাধীনতা যুদ্ধ বন্ধ করে পাকিস্তান টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করতেন। তাহলে পাকিস্তানিরা সে সুযোগ গ্রহণ করলো না কেন?

তখন বঙ্গবন্ধুর জনপ্রিয়তা এতই তুঙ্গে ছিল যে, তিনি যা বলতেন বাঙালিরা তাই মেনে নিতেন। যদি নিজে ইচ্ছা করে আঁতাত করে গ্রেফতার বরণ করতেন, তাহলে পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে তাঁকে বিচার করে ফাঁসি দিতে চেয়েছিল কেন? প্রতিহিংসায় অন্ধ প্রতিপক্ষ ভুলেই গিয়েছিল এইসব ঘটনা। বঙ্গবন্ধুর এই গ্রেফতার নিয়ে একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সাংবাদিক মাসুদা ভাট্টি একটি তথ্য দিলেন যে, এখানেও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যথেষ্ট প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি 'বাঙালিদের মুক্তিযুদ্ধে বৃটিশ দলিল-পত্র' নামে একটি তথ্যমূলক গ্রন্থের ১৮ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেন–

"তিনি শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে গ্রেফতার হয়েছিলেন– কারণ, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন বিশ্বের গণতান্ত্রিক মুক্তিকামী বিবেকের কাছে কারাবন্দী ও মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ানো শেখ মুজিবের অবস্থান, পালিয়ে ভারতে অবস্থান করে যুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী মুজিবের তুলনায় অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য, সুদৃঢ় ও সহানুভূতিপূর্ণ হবে। এখানেই মহান নেতা হিসাবে শেখ মুজিবের দূরদর্শিতা। এখানেই জাতির পিতা হিসাবে তাঁর বিজয়।"

সত্যিকার অর্থেই আমরা দেখতে পাই, বঙ্গবন্ধুকে যখন পাকিস্তানিরা প্রহসনের বিচারের নামে হত্যা করতে চেয়েছিল তখন বিশ্বের অনেক নেতৃবৃন্দই প্রতিবাদে ফেটে পড়ে এবং তাঁর ফাঁসি দেওয়ার ষড়যন্ত্র বন্ধ করার আহ্বান জানায়।

এভাবেই বঙ্গবন্ধু দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে কঠিন ও সঙ্কটকালে প্রজ্ঞার মাধ্যমে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে বা কর্মসূচি দিয়ে, ঘোষণা দিয়ে, কথা বলে সফল হয়েছেন। জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠে বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা, স্বাধীনতার স্থপতি ও জাতির পিতা হিসাবে ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। শুধু বাংলাদেশেই নয়, সারা বিশ্বের নিপীড়িত নির্যাতিত মানুষের বিপ্লবী নেতার আসনে আসিন হওয়ার গৌরব লাভ করেছেন।

সততা

'সততাই উৎকৃষ্ট পন্থা' বহুল প্রচলিত জনপ্রিয় প্রবাদটি লেখাপড়া করা মানুষ মাত্রই জানে। সততার অভাবেই সমাজে যত বৈষম্য, অনাচার, অত্যাচার ও দুর্নীতি। সভ্য সমাজের মানুষ মাত্রই সততার উপর নির্ভরশীল। সততাবিহীন মানুষ যেমন পূর্ণ মানুষ হিসেবে পরিগণিত হয় না তেমনি সততাবিহীন সমাজও সুসভ্য সমাজ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায় না। প্রকৃত পূর্ণ মানুষ হতে হলে সততা ব্যতীরেকে সম্ভব নয়। তেমনি সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রেও সততাকেই মৌল নীতি হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। সেই দিক থেকে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিদেরকে অবশ্যই সততার সহিত দায়িত্ব পরিচালনা করা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বাস্তবে তা পরিলক্ষিত হয় না। বিশেষ করে আমাদের মুসলিম রাষ্ট্রগুলির সরকার পরিচালনার ইতিহাসে সততাবিহীন অনেক নেতৃত্বেরই দুর্নীতির তথ্য প্রচারমাধ্যমগুলোর মাধ্যমে অবগত হই। এসব নেতৃবৃন্দ রাষ্ট্র পরিচালনা করতে গিয়ে অর্থ-বিত্তের লোভে প্রলুব্ধ হয়ে দুর্নীতি, স্বৈরশাসন ইত্যাদির মাধ্যমে অপরাজনীতির সূচনা করেছেন। ইন্দোনেশিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট সুহার্তো, লিবিয়ার বিপ্লবী নেতা কর্ণেল গাদ্দাফী, ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন, উগান্ডার সাবেক প্রেসিডেন্ট ইদি আমিন, মিশরের সাবেক প্রেসিডেন্ট হুসনি মোবারক, পাকিস্তানের সাবেক সামরিক শাসক আইয়ুব খাঁন– এদের দুর্নীতি ও স্বৈরশাসন এবং পতনের ঘটনা পৃথিবীর মানুষ মিডিয়ার মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করেছে। সেদিক থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি সংগ্রামী জননেতা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন ব্যতিক্রম। বাংলাদেশের স্থপতি এই মহান নেতা তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে বহু সততার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছেন। এজন্য তিনি নিজেও অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পেরেছিলেন।

আমরা প্রথমেই উল্লেখ করবো বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের কথা। তাঁর নেতৃত্বেই স্বাধীনতা সংগ্রাম, সত্তরের নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং মুক্তিযুদ্ধপূর্ব পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দদের সাথে আলাপ-আলোচনা, এমনকি মুক্তিযুদ্ধের সময়

পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী অবস্থায় পাকিস্তানি গোয়েন্দা সদস্যদের গোপন লোভনীয় প্রস্তাবের সময়ও কোনো লোভই তাঁকে প্রলুব্ধ করতে পারে নাই। তৎকালীন সময়ে বঙ্গবন্ধু যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন, এবং ক্ষমতার শীর্ষে আরোহন করার প্রস্তাবনাও পেয়েও তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। সবকিছুর ক্ষেত্রেই মহান এই স্থপতি যদি অর্থবিত্তের লোভে দুর্নীতির আশ্রয় নিতেন তাহলে বাংলাদেশ স্বাধীন হতো কিনা সন্দেহ। আজকের রাজনীতির প্রেক্ষাপটে কতিপয় নেতৃবৃন্দদের যে চরিত্র আমরা দেখতে পাই, তাতে করে সে সময়ে তিনি যদি গোপনে পাকিস্তান সরকারের নিকট অর্থ বিত্তের প্রস্তাব দিতেন তাহলে পাকিস্তান সরকার অবশ্যই তা লুফে নিত এবং বাঙালিদের অধিকার আদায়ের আন্দোলন দ্রুতই স্থিমিত হয়ে যেত। স্বায়ত্বশাসন এবং ছয় দফাকে এড়িয়ে যাবার প্রশ্নে বঙ্গবন্ধু যত পরিমাণ অর্থ বিত্তই চাইতেন, পাকিস্তান সরকার তা দিতে বাধ্য হতো। কিন্তু বাস্তবে তার কোনোটাই হয়নি, ইতিহাসে তা প্রমাণিত। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে প্রথম থেকেই তিনি সততাকে পুঁজি করেই সামনে অগ্রসর হয়েছেন।

১৯৫৪ সনের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে বিপুল ভোটে নির্বাচিত হয়ে তিনি শেরে বাংলা ফজলুল হকের মন্ত্রিসভার সদস্য হয়েছিলেন। অপরদিকে দলের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছিলেন। এনিয়ে দলের অভ্যন্তরে বঞ্চিত নেতৃবৃন্দের ভিতরে চাপা ক্ষোভের সঞ্চার হয়। বঙ্গবন্ধু একদিকে মন্ত্রী অন্যদিকে দলের সাধারণ সম্পাদক– এ ব্যাপারটাকে অনেক নেতৃবৃন্দই মেনে নিতে পারছিলেন না। দলের কাউন্সিলের পূর্বেই তিনি মন্ত্রীসভা হতে পদত্যাগ করেছিলেন। সবাইকে অবাক করে দিয়ে লাভজনক পদ মন্ত্রিত্ব বাদ দিয়ে পরিশ্রম এবং ঝুঁকিপূর্ণ দায়িত্বের দলের 'সাধারণ সম্পাদক' পদটি বেছে নিয়েছিলেন। সেদিন বিলাসবহুল গাড়ি-বাড়ি ও বিশেষ সুবিধাদি ত্যাগ করে সবাইকে হতবাক করে সততার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। তিনি সেক্রেটারির দায়িত্ব না নিয়ে মন্ত্রিত্ব বহাল রেখে বিলাসবহুল জীবন-যাপন করতে পারতেন। যেমনটি করেছিলেন হুসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী– বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সেক্রেটারির পদ ছেড়ে দিয়ে মন্ত্রিত্ব বহাল রেখেছিলেন। কিন্তু সে ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু ছিলেন সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম।

যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীসভা বাতিল করে পরবর্তীতে আইয়ুব খান যখন সামরিক শাসন জারি করে, তখন রাজনীতি নিষিদ্ধ করে অনেক নেতৃবৃন্দকেই গ্রেফতার করেছিলেন। সেই সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকেও গ্রেফতার করা হয়। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে সামরিক সরকার তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা করে। সেই দুর্নীতির মামলায় বঙ্গবন্ধু শিল্পমন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে দুর্নীতির মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎ করেছিলেন বলে মামলায় উল্লেখ করা হয়। কিন্তু মামলাটি দীর্ঘদিন

আদলতে চলার পর সরকারপক্ষ দুর্নীতির কোনো প্রমাণ আদালতে দাখিল করতে পারেনি বিধায় ১৯৫৯ সালের ১০ ডিসেম্বর আদালত তাকে নির্দোষ ঘোষণা করে বেকসুর খালাস দেয়। পাকিস্তানের সামরিক সরকার বহু চেষ্টা করেও দুর্নীতির কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেনি বিধায় বঙ্গবন্ধুকে কারাগারে আটকে রাখা সম্ভব হয়নি। সেদিনের স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের আদালতই প্রমাণ করেছে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সততার বিরল দৃষ্টান্ত।

জীবিকার প্রয়োজনে উনি ১৫০০ টাকা বেতনে একটি ইন্সুরেন্স কোম্পানিতে চাকরি নিয়েছিলেন। তথাপিও আইয়ুব খানের কাছে মাথা নত করেননি। পরবর্তীতে আইয়ুব খানের এক উদ্ভট রাজনৈতিক তত্ত্ব 'মৌলিক গণতন্ত্র'-এর নামে চালুন করেন। দেশ শাসনের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে জামানত হারানো অনেক নেতৃবৃন্দই আইয়ুব খানের আহ্বানে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিল। অনেকে আইয়ুব খানের মন্ত্রীসভার মন্ত্রীও হয়েছিল। সেই সময়ে ইচ্ছে করলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও অর্থবিত্ত ও বিলাসবহুল জীবন-যাপনের লক্ষ্যে আইয়ুব খানের আহ্বানে দলে যোগ দিয়ে মন্ত্রী হতে পারতেন। তিনি তা না করে এদেশের বঞ্চিত জনগণের দাবি আদায়ের আন্দোলনে নিজেকে সততার সহিত সম্পৃক্ত রেখেছিলেন।

পরবর্তীতে ১৯৬৯ সালে ৬দফার আন্দোলন যখন তুঙ্গে, তখন আইয়ুব সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝোলানোর ষড়যন্ত্রে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' নামে এক মামলায় অভিযুক্ত করেন। সে মামলার সময়েও তিনি সততা এবং সাহসের সহিত মোকাবেলা করেন। কোনো লোভ-লালসাই ছয় দফার দাবি থেকে তাকে পথচ্যুত করতে পারেনি। এমনি ৬৯-এর গণআন্দোলনে মুক্তি পাওয়ার পর তিনি যখন আকাশসম জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হলেন তখনো কোনো অর্থবিত্তের লোভ তাঁকে প্রলুব্ধ করতে পারেনি। বঞ্চিত, প্রতারিত বাঙালির দাবিকেই তিনি প্রাধান্য দিয়ে ১৯৭০-এর নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। নির্বাচনের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে সারা পাকিস্তানের একক জনপ্রিয় নেতায় পরিণত হলেন। নির্বাচনে জয়লাভের পর পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনার সময়ও বাঙালির প্রাণের দাবি ছয় দফা থেকে একচুলও বিচ্যুত হননি। ইয়াহিয়া খানের সাথে আলোচনার সময়ই ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানের ভাবি প্রধানমন্ত্রী বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্পষ্টভাবেই পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রিত্বের লোভ দেখানো হয়েছিল। তিনি তখন চাইলে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীও হতে পারতেন। বিলাসবহুল জীবন-যাপন, গাড়ি-বাড়ি এবং অর্থ-বিত্তের লোভে তিনি পাকিস্তানের

প্রধানমন্ত্রী হয়ে স্বাধীনতার আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিতে পারতেন। গণতান্ত্রিক রাজনীতির বিধানে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাই সরকার গঠন করে– এটাই হলো সংসদীয় গণতন্ত্রের বিধান। কিন্তু বঙ্গবন্ধু এ অবস্থায়ও কোনো লোভ-লালসার কাছে পরাজিত হননি। তিনি স্পষ্টভাবে ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ভাষণে বলেছিলেন, "আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। এদেশের মানুষের অধিকার চাই।" পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তাঁকে যখন বন্দী করে পাকিস্তানের কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয় তখন পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে অনেক লোভনীয় প্রস্তাবই দেওয়া হয়েছিল। কোনো প্রস্তাবই তিনি গ্রহণ করেননি। এমনকি তাঁকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝোলানোর ষড়যন্ত্রে রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা দিয়েও তাঁকে তাঁর সততার পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার প্রধান হিসেবে যখন দেশ গড়ার কাজে তিনি ব্যস্ত, তখনও তিনি সততার সাথে কাজ করেছেন।

তিনি সর্বদাই দলের নেতৃবৃন্দকেও সততার সাথে কাজ করার কথা বলতেন। নিজেও দুর্নীতি করতেন না, অন্যের দুর্নীতিকেও প্রশ্রয় দিতেন না। স্বাধীন বাংলাদেশে সরকারের প্রধান ক্ষমতাধর ব্যক্তি হয়েও ক্ষমতার অপব্যবহার, নিজের পারিবারিক সুখ-সুবিধা এবং বিত্ত-বৈভবের লোভ তাঁকে সততার পথ থেকে একচুলও সরাতে পারেনি। তিনি সর্বদাই স্পষ্টবাদী ছিলেন। নিজের আত্মীয়-স্বজন ও পরিবারের সদস্যদের বেলায়ও সত্য কথা বলতে তিনি দ্বিধা করতেন না। মুক্তিযুদ্ধের পরপরই একটি ঘটনার অবতারণা করেছেন একজন খ্যতিমান অর্থনীতিবিদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. নুরুল ইসলাম, যিনি বঙ্গবন্ধু সরকারের পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান ছিলেন। স্বাধীনতার পর ওনার জ্যেষ্ঠ পুত্র শেখ কামাল সম্বন্ধে কতিপয় পত্রপত্রিকায় লেখার মাধ্যমে গুজব ছড়ানো হতো। তিনি 'বাংলাদেশ জাতি গঠনকালে এক অর্থনীতিবিদের কিছু কথা' গ্রন্থের ১০১পৃষ্ঠায় এভাবেই বর্ণনা করেছেন–

> "তার বড় ছেলে শেখ কামাল তখন ছাত্ররাজনীতিতে খুবই সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েছে। পত্রপত্রিকায় সে সময় প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপগুলোর মধ্যে সংঘর্ষ ও উত্তেজনা সৃষ্টির পেছনে তার ভূমিকার কথা উল্লেখ করে সমালোচনামূলক লেখালেখি হচ্ছিল। কামাল সম্পর্কিত গুজবগুলোতে খুব স্বাভাবিকভাবেই শেখ মুজিবকে সংশ্লিষ্ট করা হতো এবং এসব লেখালেখিতে তার ভাবমূর্তি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল। আমি যখন এ প্রসঙ্গটি তার কাছে তুললাম তখন তিনি তা স্বীকার করলেন এবং একমত হলেন যে, বর্তমানে যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি তাতে ছাত্ররাজনীতিতে কামালের সক্রিয় ভূমিকা সমর্থনযোগ্য নয়। এটা কামাল বা তার পিতা– কারও ভাবমূর্তির জন্যই ভালো নয়।

আমি শেখ মুজিবকে পরামর্শ দিয়েছিলাম কামালকে উচ্চশিক্ষার জন্য বাইরে পাঠিয়ে দিতে। বলেছিলাম সে এই উত্তেজনাকর পরিস্থিতি থেকে দূরে থাকতে পারে এবং নিজের ভবিষ্যতের ব্যাপারে প্রস্তুতি নিতে পারে। শেখ মুজিব আমার প্রস্তাবের সঙ্গে একমত হলেন, তবে এ ব্যাপারে তিনি তার আর্থিক অক্ষমতার কথাও জানালেন। দাতা সংস্থা ও বিদেশী বেসরকারি দাতাদের সঙ্গে আমার সম্পর্কের সুবাদে আমি বললাম, বাংলাদেশে তাদের নিয়মিত সাহায্য কর্মসূচির বাইরে কোন বৃত্তির ব্যবস্থা করা যায় কি না তা আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি। তিনি উত্তর দিলেন, এই প্রস্তাব তার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। কামাল এমনিতে মেধাবী ছাত্র নয়, তার জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করলে সেটা ক্ষমতার অপব্যবহার কিংবা স্বজনপ্রীতি বলে গণ্য হবে। লক্ষ্য করলাম, নিজের স্বার্থে সরকারি ক্ষমতার স্বল্পতম সুবিধা গ্রহণের বিরুদ্ধে তার অবস্থান বেশ শক্ত অথচ তখন দেশব্যাপী গুজব ছিল যে তিনি ব্যক্তিস্বার্থে রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপব্যবহার করার বিষয় উপেক্ষা করতেন, এমনকি এ কাজে অন্যদেরও উৎসাহ দিতেন।"

নিজের সন্তানের উচ্চশিক্ষালাভের ক্ষেত্রেও তিনি আর্থিক অক্ষমতার কথা অকপটে জানিয়েছিলেন। অথচ আজকাল সরকার প্রধান তো দূরের কথা, সরকারদলীয় একজন ইউনিয়নের চেয়ারম্যানও নিজ সন্তানদের উচ্চশিক্ষার বেলায় দুর্নীতির আশ্রয় নিতে দ্বিধা করেন না। আজকাল এমপি, মন্ত্রীদের সন্তানরা কিভাবে উচ্চ শিক্ষা লাভ করে তার খবরও কেউ রাখেন না। অথচ সে সময়ে তিনি যে ক্ষমতাধর ব্যক্তি ছিলেন, এক শেখ কামাল তো দূরের কথা, হাজারও শেখ কামালকে উচ্চ শিক্ষার জন্য সরকারি সাহায্যের আশ্রয় নিলে কেউ খবরও রাখতো কিনা সন্দেহ। তিনি কতটুকু সততার সহিত রাজনীতি করতেন যে, তার নিজ পুত্রের ক্ষেত্রেও এক টাকার দুর্নীতির আশ্রয় নেননি। তিনি অত্যন্ত সাধারণ জীবন-যাপন করতেন। আটপৌরে জীবন-যাপনে তিনি পছন্দ করতেন। বিলাসবহুল জীবন-যাপনের তথ্য আমরা আজও পাইনি। সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রেও আর্থিক কৃচ্ছতার আশ্রয় নিতেন। শুধু শুধু অর্থ অপচয়ের মাধ্যমে নিজের অফিস ও সরকারি অফিস-আদালতের সৌন্দর্য বর্ধনের পক্ষে তিনি ছিলেন না। তিনি নিজে যে অফিসে বসতেন, সে অফিস সংস্কারের একটি ঘটনা উপর্যুক্ত লেখকের গ্রন্থের ৯৮পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে। বর্ণনাটি নিম্নরূপ–

"প্রধানমন্ত্রীর সম্মিলিত অফিস ও বাসা অর্থাৎ গণভবন নির্মাণের ব্যাপারে পূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পটি নিয়ে একটি ঘটনা ঘটেছিল। সম্পদের স্বল্পতার কারণে আমরা পূর্ত মন্ত্রণালয়কে প্রাক্কলিত ব্যয় কমানোর পরামর্শ দিয়েছিলাম। আমরা

বলেছিলাম অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করে এই নির্মাণ কাজকে ব্যয়বহুল না করার জন্য। শেখ মুজিবকে খুশি করার আশায় প্রকল্পটির ডিজাইন ও নির্মাণ মানের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় অনেক বাড়াবাড়ি করে ফেলে। আমাদের বলা হলো, এই প্রকল্পের কাগজপত্র ইতোমধ্যেই শেখ মুজিব দেখেছেন এবং এ ব্যাপারে তিনি একমত হয়েছেন। তবে আমরা নিশ্চিত ছিলাম যে, তিনি প্রকল্পটি ও ঐ প্রকল্পের নির্মাণ ব্যয় পুনর্মূল্যায়নের বিরোধিতা করবেন না। কিন্তু মন্ত্রণালয় আমাদের এই রকম মতামত পেয়ে খুবই বিস্মিত হয়েছিল এবং শেখ মুজিবের কাছে আমাদের আপত্তির বিষয়টি জানিয়েছিল। কোন সন্দেহ নেই যে, তারা অতিরঞ্জন করে কমিশনের 'অধ্যাপকদের' উদ্ধত ব্যবহার প্রধানমন্ত্রীর কাছে জানিয়েছিল। কিন্তু আমাদের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর বা তার অফিস থেকে আমরা কোন প্রতিক্রিয়া পাইনি।

গণভবন বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর এই যে, আচরণ, তা সহজেই বোধগম্য। সরকার যখন ঘোষিতভাবে কৃচ্ছ্রসাধনের নীতি অবলম্বন করছে তখন এটা প্রত্যাশিত যে কমিশন সে অনুযায়ী প্রকল্প অনুমোদনের দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করবে। শেখ মুজিব সিদ্ধান্ত নেন যে, এই অবস্থায় তিনি তার এই নিজের ব্যাপারটি নিয়ে কমিশনকে কোন ব্যতিক্রম করতে বলবেন না। যদিও তার আশেপাশের লোকজন এটা বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন যে, অন্যান্য দেশের সরকারপ্রধানরাও সাধারণত অনেক বিলাসবহুল বাসভবন ব্যবহার করে থাকেন। শেখ মুজিব যখন পরে যুগোস্লাভিয়া যান তখন ভিন্ন এক প্রসঙ্গে এই বিষয়টি আলোচিত হয়েছিল। সেই সফরে আমি তার সঙ্গে ছিলাম। সফরের সময় শেখ মুজিব ও তার দলের লোকজনকে ব্রিয়নি দ্বীপে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এই সামুদ্রিক অবকাশ কেন্দ্রে মার্শাল টিটোর একটি প্রাসাদ ছিল। বিশিষ্ট অতিথি সফরে এলে তিনি দু-এক দিনের জন্য তাদের সেখানে নিয়ে যেতেন। এই প্রাসাদটি ছিল পুরনো এক রাজপরিবারের। পরে এর মালিকানা আসে সমাজতান্ত্রিক সরকারের হাতে। উনিশ শতকে ও বিশ শতকের শুরুর দিকে ইউরোপীয় রাজকীয় প্রাসাদগুলোর মতো ঐতিহ্যগত এই প্রাসাদটি ছিল খুবই বিলাসবহুল। আমরা সমাজতান্ত্রিক একটি দেশের নেতার এ ধরনের জীবনযাপন দেখে খুবই বিস্মিত হয়েছিলাম।"

তিনি অর্থ সংকটের কথা ভেবে সরকার পরিচালনায় সূক্ষ্মভাবে আর্থিক কৃচ্ছ্রতাসাধনের পথ অবলম্বন করতেন। কারণে-অকারণে মন্ত্রীদের বিদেশ সফরকে তিনি পছন্দ করতেন না। নিজেও প্রয়োজন ছাড়া বিদেশ যেতেন না। বঙ্গবন্ধুর এই

নীতির প্রতি সমর্থন জানিয়ে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রীসভার 'প্রাকৃতিক সম্পদ ও বিজ্ঞান-প্রযুক্তি' মন্ত্রী ড. মফিজ চৌধুরীর লেখা 'বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রীসভায়' গ্রন্থের ১০৪ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেন–

> "বিদেশ ভ্রমণে তাঁর খুবই অনাগ্রহ ছিল। তাঁর মন্ত্রীদের বিদেশ পাঠাতেও তাঁর অনাগ্রহ ছিল প্রবল। নতুন দেশের অর্থ সংকটের এবং দেশে যখন গঠনমূলক কাজের বিরাট বোঝা, তখন তাঁর এই সিদ্ধান্ত সময়োপযোগী ছিল নিঃসন্দেহে। শুধু বিদেশ ভ্রমণই নয় বাংলাদেশে অবস্থিত বিদেশী দূতাবাসগুলোর আমন্ত্রণ রক্ষার ক্ষেত্রেও বঙ্গবন্ধু একটা নিয়ম বেঁধে দিয়েছিলেন। দূতাবাসগুলো সকল মন্ত্রীকেই প্রথাগতভাবে নিমন্ত্রণ করে, কিন্তু পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ই বলে দিবে কে কোন দূতাবাসের রিসেপশনে বা ডিনারে যাবেন। দল বেঁধে সবার একত্রে এক অনুষ্ঠানে যাওয়া চলবে না। হুজুগপ্রিয় বাঙালির জন্য নিয়মটা ভালই ছিল মনে হয়।"

অযথা অর্থ ব্যয় তিনি নিজের বেলায় যেমন পছন্দ করতেন না তেমনি মন্ত্রীদের বেলায়ও সেই নিয়ম প্রযোজ্য ছিল। কোনোক্রমেই যাতে অর্থ ও সময় অপচয় না হয় সেদিকে তিনি ছিলেন খুবই সচেতন। তিনি যেমনই ছিলেন সৎ তেমনি ছিলেন স্পষ্টবাদী। সততা এবং স্পষ্টবাদিতাই ছিল তাঁর জীবনের মূল বৈশিষ্ট্য।

স্বাধীনতার পর কিছু কিছু পত্রিকায় বঙ্গবন্ধুর পরিবার নিয়ে জঘন্য মিথ্যাচার করা হতো। জীবিত থাকতেও স্বাধীনতাবিরোধী কিছু পত্রিকা, বেনামে, ছদ্মনামে গুজব ছড়িয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করতো। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের কাল রাত্রিতে বিপথগামী কিছু সৈনিকের হাতে বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হন। যে রাতে তিনি নিহত হন তার পরদিন থেকে শুরু হয় মিথ্যাচার। মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য এই ধরনের মিথ্যাচার, অপপ্রচার গুজব চালানো হয়েছিল। হাইস্কুলের ছাত্র থাকাকালে আমরা শুনেছি তিনি নাকি ইন্ডিয়ায় বিশাল রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। যেখানে তিনশ' লোক থাকতে পারবে। কেউ কেউ বলতো লন্ডনে একেক সন্তানের জন্য একেকটি বিলাসবহুল বাড়ি ক্রয় করেছেন। দেশ ভারতের কাছে বিক্রি করে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করে পালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। এইসব কথা বলে বেড়াতো বেশ কিছু বয়স্ক লোক। পরবর্তীতে জানতে পেরেছি এরা মুসলিম লীগের কর্মী ছিলেন। তারাই পরবর্তীতে জিয়াউর রহমানের বিএনপি-তে যোগ দিয়েছিল।

কিন্তু বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর একুশ বছর দেশ শাসন করেছে আওয়ামী লীগ বিরোধী সরকার। এরা বহু তদন্ত করেও কোথায়ও এক টাকার দুর্নীতিও খুঁজে

পায়নি। বঙ্গবন্ধু অথবা তার পরিবারের নামে দেশে, বিদেশে কোথায়ও একটাকার সম্পদও পাওয়া যায়নি।

অপ্রিয় হলেও একটি কথা সত্য যে, মুক্তিযুদ্ধের পর অবাঙালিদের পরিত্যক্ত সম্পদ অনেক সুযোগ সন্ধানী লোক মুক্তিযোদ্ধা সেজে দখল করেছিল। যদিও পরবর্তীতে এসব সম্পদ সরকার নিয়ন্ত্রণে নেয়। সে সময় বঙ্গবন্ধু যদি অথবা তাঁর পরিবার যদি এধরনের একটি বড় বাড়ি তৎকালীন সরকার বরাদ্দ দিতেন তাহলে কারও কিছু বলার থাকতো না।

যেহেতু প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর বিএনপি সরকার জিয়াউর রহমানের পরিবারকে এক টাকার বিনিময়ে গুলশানে বিলাসবহুল বাড়ি দিয়েছে, এ নিয়ে অনেক বিতর্ক হলেও সে বাড়ি আজও জিয়া পরিবারের জন্যই বরাদ্দ আছে এবং জিয়াউর রহমানের স্ত্রী সে বাড়ি ফেরত দেওয়ার চিন্তাও করেন না। এখন তো জনগণ সে বাড়ির কথা ভুলেই গেছে।

অথচ এতবড় একজন সংগ্রামী মহান নেতা তিনি সরকারে থাকাকালীন এক টাকার সুযোগ-সুবিধাও গ্রহণ করেননি। এখন তো কতিপয় রাজনীতিবিদদের রাজনীতির মূলনীতিই হচ্ছে দুর্নীতি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে সততার স্বাক্ষর রেখেছিলেন বলেই জনগণের ভালোবাসা পেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর এই সততা একদিকে তার জীবনকে করেছে কলুষমুক্ত মহিয়ান। অন্যদিকে এদেশের জনগণ পেয়েছেন একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। যে রাষ্ট্রের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে আন্তর্জাতিক পাসপোর্টের মাধ্যমে বহির্বিশ্বে প্রায় ৭০ লক্ষ লোক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে পরিবারের ভরণপোষণ সম্ভব হচ্ছে। স্বাধীন না হয়ে পাকিস্তানের অধীন থাকলে তা সম্ভব হতো না।

দারিদ্র্য বিমোচন ভাবনা

"ক্ষেতে ক্ষেতে পুইরা মরিরে ভাই
পাছায় জোটেনা ত্যানা
বৌ-এর পৈছা বিকায় তবু
ছেইলা পায়না দানা।

এ কঠোর মহিতে
চাষা এসেছে শুধু সহিতে
আর মরমের ব্যথা লুকায়ে মরমে
জটর অনলে দহিতে।"

উপমহাদেশে নারী শিক্ষা জাগরণের অগ্রদূত, সমাজ সংস্কারক ও বিংশ শতাব্দীর খ্যাতিমান লেখিকা, বিদ্যাবিনোদীনি, সভ্যতার রত্নখনি বেগম রোকেয়া 'চাষার দুঃখ' নামক কবিতায় তৎকালীন নির্যাতিত, বঞ্চিত, দরিদ্র কৃষকের আর্তনাদ খুব সূক্ষ্মভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

"গোলা ভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু, পুকুর ভরা মাছ"– জনপ্রিয় এ প্রবাদটির মাধ্যমে এদেশের মানুষের সুখ-সমৃদ্ধির কথা জানা যায়, বিশেষ করে ভারতবর্ষে আসা মধ্যযুগের অনেক পর্যটকের ভ্রমণলিপিতে।

সুলতানী আমল এবং মোঘল আমলের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসেও বঙ্গদেশের গ্রাম-বাংলার সাধারণ মানুষের সুখ-সমৃদ্ধির তথ্য পাওয়া যায়। দিল্লীর মুসলিম শাসনের শেষের দিকে ১৭৭৬ সনের দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে একদিকে বাংলার অর্থনীতিতে দৈন্যের শুরু অন্যদিকে ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজদণ্ডের যাত্রা শুরু। এভাবেই এদেশের জনগণের সুখ-সমৃদ্ধিতে ভাটা পড়ে ইংরেজ আগমনের মধ্য দিয়ে। ইংরেজ আমলে ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিসের ঘোষিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে পূর্ববঙ্গের কৃষকের ভাগ্যে জোটে ভূমিহীনতা

এবং দারিদ্র্য। সে থেকেই এদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের বিশেষ করে গ্রাম-বাংলার কৃষকের জীবনে নেমে আসে দুর্বিসহ দুঃখ-দুর্দশা। দশকের পর দশক পেরিয়ে গেলেও কৃষকের জীবনের উন্নতি হয়নি বরং উন্নতি হয়েছে নবাব, জমিদার ও জোতদারদের। জমিদারদের জমিদারি স্ফীত করার লক্ষ্যে জমিদাররা নির্মমভাবে খাজনা আদায়ের মাধ্যমে কৃষকের ভূমি ও ভিটে-মাটি গ্রাস করতে কখনোই দ্বিধা করতো না। এভাবেই এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের জীবনের অভিধান থেকে সুখ শব্দটি হারিয়ে যায়। সর্বদাই দারিদ্র্য নামক ব্যাধিটি তাদের জীবনের সাথী হয়ে থাকে মৃত্যু পর্যন্ত। বাংলার এই কৃষক সমাজের নির্যাতন এবং ভূমিহীন হয়ে নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার ঘটনা তৎকালীন অনেক ইতিহাস ভিত্তিক গল্প, উপন্যাস, নাটক ও কবিতায় পাওয়া যায়।

ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে এসেছিল বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে। তাই তারা ভারতের বিভিন্ন জায়গায় কলকারখানা প্রতিষ্ঠা করে। এই কলকারাখানাগুলিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে নতুন নতুন শহর। গ্রামীণ শিল্প ধ্বংস হওয়ায় গ্রামবাসীরা এসে আশ্রয় নেয় ঐ শহরগুলোতে। এদের অধিকাংশ ছিলেন বাংলাদেশের মুসলমান। তখন প্রধানত দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন কৃষক ও অভিজাত শ্রেণী। অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে ছিলেন প্রশাসক, কর সংগ্রহকারী, জায়গিরদার, জমিদার, বিচারক, শিক্ষক ও সরকারি কর্মচারী। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকের মধ্যেই প্রশাসনের বড় বড় পদগুলি থেকে মুসলমানরা অপসৃত হয়। ইংরেজরা এই পদে নিজেদের লোকদের অধিষ্ঠিত করেন। অবশ্য মুসলমান শ্রেণী বিশেষ করে অভিজাত শ্রেণীর স্বার্থে সবচেয়ে বেশি আঘাত লাগে ১৭৯৩ সালে যখন লর্ড কর্নওয়ালিস ঘোষিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাস্তবায়নের মাধ্যমে।

ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠিত নগরগুলিতে যারা আশ্রয় নিয়েছিলেন তাদের অধিকাংশ ছিলেন হিন্দু। এদের অনেকেই কোম্পানির কর্মচারীদের সহযোগী হিসাবে ব্যবসা করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিস জমির বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী করায় এই নব্য ধনীদের অনেকেই জমিদারি কিনে নিয়ে জমিদার হওয়ার সুযোগ পান। পুরোনো জমিদারদের মধ্যে অনেকেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিশেষত সূর্যাস্ত আইনের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে না পারায় নিজেদের জমিদারি হারান। পুরনো ভূস্বামীদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর নতুন জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব হলে তাদের অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু ধর্মাবলম্বী। এছাড়া এ ব্যবস্থায় জমিদার ও কৃষকদের মধ্যে মধ্যস্বত্ব ভোগী আরেকটি শ্রেণীর উদ্ভব হয়। এরাও প্রধানত হিন্দু সম্প্রদায়ের ছিলেন। অনেক সময় আসল জমিদার ও কৃষকের মধ্যে দশ পনেরো

জন মধ্যস্বত্ব উপভোগকারী থাকতেন। জমির ফসল উৎপাদনে এই শ্রেণীর কোনো অবদানই ছিল না। এরা ছিলেন অনেকটা পরগাছা বিশেষ। এই বিপুল সংখ্যক পরগাছাদের খাওয়ানো ও তাদের ভোগ্য দ্রব্যের অর্থ যোগানের ভার পড়ে দরিদ্র কৃষকের উপরে। এভাবেই সময় বৃদ্ধির সাথে সাথে বিংশ শতাব্দীতে এসে সমাজে অর্থনীতির এ বিভাজনটি খুবই স্পষ্ট হয়ে দেখা যায়। সমাজের উপরের শ্রেণীতে হিন্দু জমিদার, ব্যবসায়ী এবং মধ্যস্বত্ব শ্রেণী, সরকারি কর্মকর্তা, অন্যদিকে মুসলমান নবাব জমিদার, জোতদার এবং হাতে গোনা কয়েকজন ব্যবসায়ী। তবে পূর্ববঙ্গের সামাজিক রূপ ছিল প্রধানত হিন্দু জমিদার এবং ইংরেজ কর্তৃক উপাধিপ্রাপ্ত মুসলমান জমিদার নবাব, খান বাহাদুর। এদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন পূর্ববঙ্গের বাইরের অবাঙালি উর্দুভাষী। জমিদারি ব্যবসার কারণে জমিদারি ক্রয় করে এরা পূর্ববঙ্গে বাস করতেন। এভাবেই সময়ের ধারাবাহিকতায় বিংশ শতাব্দীর বিশ-ত্রিশ দশকের দিকে একটি বিশাল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়। এর একটি বিশেষ কারণ, একদিকে ভূমিহীনের সংখ্যা বৃদ্ধি অন্যদিকে পরিবারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি। বিশেষ দুটি কারণেই এ সময়টাতে গ্রাম-বাংলার দরিদ্র কৃষক সমাজের তীব্র দারিদ্র্যই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তৎকালীন লেখক ও সমাজ-সংস্কারকরা সমাজের বিভিন্ন দিক নিয়ে লেখালেখি করলেও সমাজের এই বৃহৎ অভিশপ্ত দারিদ্র্যকে উপেক্ষা করতে পারেনি। তাই বেগম রোকেয়ার 'চাষার দুঃখ' নামক কবিতায় দরিদ্র মানুষের করুণ আর্তনাদ ফুটে উঠেছে।

ব্রিটিশ শাসনেরও সূর্য অস্ত যাওয়ার সময়টা ছিল ত্রিশ-চল্লিশের দশক। ব্রিটিশ শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভের আশায় একদিকে কংগ্রেস অন্যদিকে মুসলমানদের রাজনৈতিক সংস্থা মুসলিম লীগের মধ্যে নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা চলতে থাকে। উভয়েরই স্বাধীনতার উদ্দেশ্য ছিল স্ব-স্ব ধর্মের পুঁজিপতি ব্যবসায়ীদের সুযোগ-সুবিধা প্রতিষ্ঠা করা। পূর্ববঙ্গে কংগ্রেসের চাইতে মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা বেশি থাকায় মুসলিম লীগই পাকিস্তান সৃষ্টির নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। পূর্ববঙ্গের মুসলমান জমিদার, পুঁজিপতি ব্যবসায়ীরা ছিলেন মুসলিম লীগের সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র কৃষক সমাজের জীবন-মান উন্নয়নের জন্য মুসলিম লীগের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচিতে একটি অক্ষরও থাকতো না। দরিদ্র এই কৃষক সমাজকে শুধুমাত্র ধর্মের দোহাই দিয়ে, পরকালের ভয় দেখিয়ে নির্বাচনে তাদের কাছ থেকে ভোট নেওয়া ছাড়া তৎকালীন মুসলিম লীগের আর কোনো রাজনীতিই ছিল না। শুধুমাত্র শেরে বাংলা ফজলুল হকের 'কৃষক-প্রজা পার্টি'র ব্যানারে দরিদ্র কৃষক সমাজের সমস্যা সমাধানের জন্য কিছু কর্মসূচি থাকতো। শেরে বাংলা ফজলুল হক অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হয়ে দরিদ্র কৃষকের কিছু

দারিদ্র্য লাঘব করার চেষ্টা করেছিলেন। চাষী খাতক আইন, মহাজনি আইন তথা জমিদারি প্রথা বাতিলের আবেদনের মাধ্যমে কৃষক-প্রজা পার্টি কৃষক সমাজের কাছে কিছুটা গ্রহণযোগ্য হয়েছিল। কিন্তু তিনিও মুসলিম লীগের অপকৌশলের শিকার হয়ে ১৯৪০ সনে লাহোর প্রস্তাব করেছিলেন। তাঁর এই প্রস্তাবে বহুধা মুসলিম স্বায়ত্বশাসিত রাষ্ট্রের পরিবর্তে মোহাম্মদ আলি জিন্নাহর রাজনৈতিক দর্শন 'দ্বিজাতি তত্ত্ব'র ভিত্তিতে ধর্মভিত্তিক একটি মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চক্রান্ত চলতে থাকে।

ঐ সময়েই উত্তর প্রদেশ ও গুজরাট অঞ্চলে স্বল্প সংখ্যক মুসলমান পুঁজিপতি আত্মপ্রকাশ করেন। মুসলিম লীগের নেতৃত্বে পাকিস্তান সৃষ্টির আন্দোলনে অভিজাত শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতাই ছিল প্রধান। একসময় এই নবগঠিত পুঁজিপতিদের মানসিকতা গড়ে ওঠে পুঁজির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় না গিয়ে কিভাবে পুঁজিকে স্ফীত করা যায়– সে কৌশল অবলম্বন করা। তারই পরিপ্রেক্ষিতে সেইসব অবাঙালি মুসলমান পুঁজিপতি সম্প্রদায় অর্থনৈতিক কারণে পাকিস্তান দাবিকে সমর্থন করেছিলেন। অবশ্য এই প্রসঙ্গে এটাও স্মর্তব্য যে, ১৯৪০ সালে লাহোর অধিবেশনে মুসলীমলীগ পাকিস্তান সম্পর্কে যে প্রস্তাব পাশ করে তাতে উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের মুসলমান প্রধান অঞ্চলে একাধিক স্বায়ত্বশাসিত মুসলমান রাষ্ট্রের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। মোহাম্মদ আলি জিন্নাহর পরিকল্পনায় ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান নামক একটি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র গঠিত হয়।

আমাদের দারিদ্র্য মূলত উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া। দারিদ্র্যের এই ইতিহাস শুরু সেই ইংরেজ সৃষ্ট চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর থেকে। দেশীয় জমিদার, নবাবদের অবাধে বিলাসিতার খরচ মিটানোর লক্ষ্যে খাজনা আদায়ের নির্মমতা দেখে কৃষক প্রাণের ভয়ে সহায় সম্পত্তি বিক্রি করে দায় মেটাতেন। এভাবেই পূর্বপুরুষের অর্জিত দারিদ্র্য মাথায় করে পূর্ব বাংলার কৃষক ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হয়। এদেশের ভূমিহীন কৃষকের দারিদ্র্য অথবা বর্গাদার চাষীদের দারিদ্র্যই প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশের দারিদ্র্য। শহরের মুটে-মজুরদের মধ্যে দারিদ্র্য থাকলেও তা সংখ্যায় ছিল নিতান্তই কম। এদেশের দারিদ্র্যের ইতিহাসে আমরা যে দারিদ্র্যকে জানি এবং বুঝি সেটি হচ্ছে বৃহত্তর এ জনগোষ্ঠীর ভূমিহীন বর্গাদার অচ্ছল গৃহস্থ। ত্রিশ, চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকের এ দারিদ্র্যকে নিয়েই গবেষণা করেছেন অর্থনীতিবিদ এবং রাজনীতিবিদগণ। বিশাল এই জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনের জন্যে তৎকালীন সরকারগুলোর অস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি এবং দায়সারা কর্মসূচির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো।

আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলের অনেক নেতৃবৃন্দই জানেন না দারিদ্র্যের সংজ্ঞা, দারিদ্র্য বিমোচনের কৌশল ও পদক্ষেপ। তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল

দেশগুলোর মধ্যে অধিকাংশ দেশের রাজনীতি হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নয়নের এবং কূটনীতি হচ্ছে অর্থনৈতিক কূটনীতি। সেদিক থেকে বিচার বিশ্লেষণ করলে একবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের চলমান সরকারগুলো অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কতটুকু কৌশলী পদক্ষেপ নিয়েছে, তা ভেবে দেখার সময় এসেছে। অল্প কথায় রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নিতে হলে আর যাই হোক অর্থনীতি এবং দারিদ্র্য বিমোচনের কৌশল সম্বন্ধে ব্যাপক ধারণা থাকা অপরিহার্য এবং জানাটা কল্যাণকর।

অবস্থাদৃষ্টে যা বোধগম্য হয়েছে তা এই দেশে দলীয় সরকারের কিছু অদক্ষতা ও অপরিপক্বতার কারণে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি বাস্তবায়ন খুব ধীর গতিতে চলছে। একবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে একটি প্রতিযোগিতায় দৃশ্যমান– তা হচ্ছে, ব্যাপক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষের এই বঙ্গাঞ্চলের মানুষের জীবন-যাত্রা ছিল ব্যতিক্রম। নদীবিধৌত এই বঙ্গাঞ্চলে আদিকাল থেকেই এদেশের মানুষ জীবিকা উপার্জনের মাধ্যম হিসাবে চাষাবাদকে বেছে নিয়েছিল। জমিতে ফসল ফলিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতো। হাজার হাজার বছর ধরেই একমাত্র জীবিকার উৎসই ছিল কৃষি।

মধ্যযুগের মুসলিম দার্শনিক, জোতির্বিদ আলবেরুনী তাঁর 'ভারত তত্ত্ব' গ্রন্থে তৎকালীন ভারতের সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ১২ মাসের বিভিন্ন পুঁজার কথা উল্লেখ করেছেন। একটি উপাসনা ছিল "জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম দিনে অমাবস্যা রাতে বীজের প্রথম ফলকে পানির নিচে নিক্ষেপ করতো" যাতে চাষাবাদে ভালো ফসল হয় এবং ফল পাওয়া যায়। কৃষকের জীবনের বড় আরাধনাই ছিল কৃষিকাজে ভালো ফসল পাওয়া এবং শান্তিতে ও নিরাপদে জীবন-যাপন করা। শতাব্দীর বিবর্তনে এদেশের কৃষকের একসময় সুখ-সমৃদ্ধি থাকলেও অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকে শুরু হয় কৃষকদের ভাগ্যের কালো অধ্যায়।

ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বদৌলতে এদেশের জমিদারদের খাজনা আদায়ের সংস্কৃতি ছিল নির্মম ও বর্বরোচিত। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসল উৎপাদন ব্যাহত হলেও জমিদারদের খাজনা ঠিকই পরিশোধ করতে হতো। তখন হালের বলদ, অথবা থালা-বাসন, ঘটি-বাটি বন্ধক রেখে মহাজনদের নিকট হতে অর্থ নিয়ে খাজনা পরিশোধ করা হতো। পরিশোধ না করলে চলতো শারীরিক নির্যাতন। তাই ভয়ে কৃষকেরা জমি বিক্রি করেও খাজনা দিতে বাধ্য হতো। এভাবেই শেষে তারা ভূমিহীন, নিঃস্ব হয়ে পথে পথে ভিক্ষা করতো এবং

বিভিন্ন জোতদার গৃহস্থদের বাড়িতে চাকর হিসাবে জীবিকা নির্বাহ করতো। এ দুর্ভাগ্যের অধিকারী বেশির ভাগই ছিলেন বাঙালি দরিদ্র মুসলমান কৃষক। ধারাবাহিকভাবে এ অবস্থা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কৃষকদেরকে সংঘটিত হতে দেখা যায়। প্রথমে কৃষক প্রজা সমিতি, পরবর্তীতে রাজনৈতিক দল কৃষক প্রজা পার্টি গঠন করে দরিদ্র কৃষকের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য আন্দোলন শুরু করেন।

পূর্ববঙ্গে মুসলমান কৃষকরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। এইসব বাংলা ভাষাভাষী গ্রামের বাঙালি মুসলমান কৃষকগণ সবচেয়ে বেশি নিঃস্ব হতে থাকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বদৌলতে। এক শ্রেণীর হিন্দু জমিদারদের ধর্মবিদ্বেষী মনোভাবের ফলে দরিদ্র মুসলমান কৃষক নিষ্পেষিত ও অত্যাচারিত হতো। অন্যদিকে সংখ্যায় কম হলেও দুই একজন মুসলমান জমিদার যারা ছিলেন তারাও গরীব মুসলমান প্রজাদের অত্যাচার করতে দ্বিধা করতো না। অনেক মুসলমান জমিদারিতেই এক শ্রেণীর হিন্দু কর্মচারী থাকতো। অত্যন্ত ধূর্ত এসব কর্মচারি মুসলমান জমিদারকে কূটবুদ্ধির জোরে কৌশলে জমিদারির সকল কাজের দায়িত্ব নিয়ে তাদেরকে অলস জীবন-যাপনে সহায়তা করতো। তারা মুসলমান জমিদারের নাম বিক্রি করে অবৈধভাবে অর্থ উপার্জন করতো। জমিদারদের নাম নিয়ে গরীব মুসলমান প্রজাদের উপর নির্যাতন করতে দ্বিধা করতো না। আর মুসলমান জমিদারগণও নিজেদেরকে অভিজাত, খান্দানি ও আশরাফ বংশের লোক ভেবে অহমিকায় ভুগতো। অন্যদিকে গরীব বাঙালি মুসলমান কৃষক, তাদের চোখে ছিল আতরাফ বা আতরাফি মুসলমান মিসকিন জাতি।

ইতিহাসের এই বাঙালি দরিদ্র মুসলমান কৃষকের করুণ পরিণতির কিছু তথ্য পাওয়া যায় মোনায়েম সরকার সম্পাদিত 'বঙ্গবন্ধুর জীবন ও রাজনীতি' গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ২০ নং পৃষ্ঠায়। তথ্যটি নিম্নরূপ–

> "গরীব বাঙালি মুসলমানদের দুর্ভাগ্য, তারা কোন জমিদারদের নিকট হতে রেহাই পেত না। এ ভাবধারা চলতে থাকে। শেষে এমন অবস্থা হয় যে, গ্রাম বাংলার শতকরা ৯০ জন নিঃস্ব কৃষক, ৫৬% ভূমিহীন। বর্গাদার মাত্র কয়েকজন। জোতদার সমস্ত ভূমির মালিক। এ সমস্ত ভূস্বামী বা দরিদ্র চাষীর অর্থ দিয়ে শহরে বিলাসবহুল বাড়ী, একাধিক বিবাহ, মদ, জুয়া, বেশ্যালয়ে গমন করে হাজার হাজার টাকা খরচ করতেন। অথচ অন্যদিকে ভাতের অভাবে, ক্ষুধার জ্বালায় দরিদ্র মুসলমানদের ঘরে ঘরে কান্না। ক্ষুধার্ত শিশুদের আর্তনাদ।"

এরকম অনেক তথ্যই পাওয় যায়। এর বর্ণনা অনেক বিস্তৃত। অল্প কথায় বলা যায়, সে সময়টাতে বাঙালি জাতির অস্তিত্ব বিলোপ হবার উপক্রম হয়েছিল। একমাত্র ফজলুল হক-ই চাষি খাতক আইন, মহাজনি আইন, ঋণ সালিসি বোর্ড, এইসব আইন করে মুসলমান প্রজাদের রক্ষা করেছিলেন। ১৯৪৭ সালে বাংলা বিভক্তির পরও পূর্ববঙ্গে স্থানীয় মুসলিম মধ্যবিত্তের একক নেতৃত্বের পর্যায়ে উন্নতি হবার সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়। বর্ণ হিন্দুদের বড় অংশের বাস্তু-ভিটা ত্যাগ, প্রাক্তন অভিজাত শ্রেণীর অবনতি ইত্যাদি কারণে সে সম্ভাবনা দেখা দিলেও ভারত এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত অবাঙালি ব্যবসায়ী ও আমলা শ্রেণী এখনকার মূল নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠা পায়। নতুন রাষ্ট্রীয় কাঠামোর পৃষ্ঠপোষকতা সত্ত্বেও এর গঠিত বিত্তবান শ্রেণী বাঙালি মুসলিম সম্প্রদায়ের সঙ্গে নাড়ীর যোগ স্থাপনে ব্যর্থ হয়। তখন সামান্য কয়েকজন বঙ্গালী শিল্পউদ্যোক্তা পশ্চিমবঙ্গ, আসাম বাংলাদেশে এলেও তেমন কোন প্রভাবশালী হতে পারেনি।

১৯৪৭ সালে এই উপমহাদেশে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি পৃথক রাষ্ট্রের জন্ম হয়। পাকিস্তান সৃষ্টিতে পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ মুসলমানের সমর্থন ছিল। কারণ, বাঙালি মুসলমানরা ভেবেছিলেন পাকিস্তান সৃষ্টির মাধ্যমে নিজেদের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জিত হবে। তৎকালীন জমিদারদের খাজনা আদায়ের কৌশলগত কারণে দরিদ্র মুসলমান কৃষক সমাজ নির্মমভাবে নির্যাতিত হতো। পুরুষানুক্রমে জমিদারদের এই নির্যাতন থেকে চিরতরে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য ভোট দেয়। পূর্ববঙ্গের বাঙালি মুসলমানের ভোটেই ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। সেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়েই মুসলিম লীগ পাকিস্তান আন্দোলনের নেতৃত্বে আসীন হয়। মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান সৃষ্টির গুরুত্ব বুঝিয়ে দিতে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ সুকৌশলে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বাধিয়ে দেয়। এ দাঙ্গায় পশ্চিম বঙ্গের কলকাতা, পূর্ববঙ্গের ঢাকা ও নোয়াখালিতে বহু হিন্দু-মুসলমান হতাহত হয়।

মুসলিম লীগের নেতৃত্বে পাকিস্তান অর্জন ছিল অনেকটা আকস্মিক। পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের অধিকৃত হওয়ায় পূর্ববঙ্গের বর্ণ হিন্দু জমিদার বা জোতদার যারা ছিল তারা দেশ ভাগের পর ধীরে ধীরে ভিটে-মাটি, সম্পদ নাম মাত্র দামে বিক্রি করে দেশ ছেড়ে চলে যায় ভারতে। কিন্তু তাদের সেই সব বাস্তুভিটা যারা কম দামে ক্রয় করেছিল তারা এদেশের জমিদার, জোতদার, ব্যবসায়ী মুসলমানগণ। স্বাধীনতার নামে পাকিস্তান অর্জন এবং দাঙ্গায় দুই বাংলার হিন্দু-মুসলমানের বাস্তুভিটা ত্যাগের ফলে যা কিছু হয়েছে তার সবই ছিল এই বাংলার দরিদ্র এবং সাধারণ কৃষক সমাজের প্রতিকূলে।

দাঙ্গার ফলে বেশির ভাগই লাভবান হয়েছে নবাব, জমিদার এবং ধনাঢ্য মুসলমানগণ, যাদের বেশির ভাই ছিলেন মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ, কর্মী ও সমর্থক। নগদ অর্থ হাতে থাকায় এ সমস্ত নবাব-জমিদাররা হিন্দুদের সম্পদ কম মূল্যে ক্রয় করতে সমর্থ হয়। জোতদার মুসলমানদের সম্পদ বৃদ্ধি করবার লক্ষ্যে এক পর্যায়ে নিকটস্থ দরিদ্র মুসলমান কৃষকের জমিও হস্তগত করার ফন্দি ফিকির করে। ব্যাপারটি অনেকটা এরকম– দীর্ঘদিন একই দরিদ্র মুসলমান কৃষকের প্রতিবেশি ছিল একজন হিন্দু কৃষক। পাশাপাশি বাড়ি ও পাশাপাশি জমি ছিল। দুজনেই ছিলেন গ্রামের দরিদ্র কৃষক, গৃহস্থ পরিবার। ধর্মীয় ভিন্নতা থাকলেও সামাজিকভাবে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের ভাবটাই ছিল বেশি। দেশভাগের ভাঙা-গড়ার খেলার সময় দেখা গেল, প্রতিবেশী সেই দরিদ্র হিন্দু কৃষকের বাড়ি, জমি, পানির দামে ক্রয় করে কোনো বিত্তশালী মুসলমান। এবার সেই দরিদ্র মুসলমান কৃষকের প্রতিবেশী হলো জোতদার মুসলমান। কয়েকদিন পর দেখা গেল দরিদ্র কৃষকের জমিটুকু কিনে নেবার অপকৌশল শুরু করে। যেহেতু জোতদারের টাকা-পয়সা, লোকবল আছে সেহেতু ঐ দরিদ্র কৃষকের মাথা গুঁজবার ঠাঁইটুকু দখল করা মোটেই অসম্ভব নয়। এদেশে এরকম হাজার হাজার ঘটনা ঘটেছে। ফলে যে দরিদ্র মুসলমান কৃষক ছিল জোতদার মুসলমানদের ষড়যন্ত্রে তার সেই সামান্য ভিটে মাটিটুকু বিক্রি করে ভূমিহীন হতে হয়েছে।

এভাবেই অতীতের মুসলমান জোতদার ধনাঢ্য ব্যবসায়ীরা বিক্রি করা হিন্দুদের সম্পত্তি কিনে তারাও ভূস্বামীতে পরিণত হয়েছে। সাধারণ খেটে খাওয়া শ্রমজীবী বা কৃষকের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হয়নি। এক কালের জমিদার জোতদার, ধনাঢ্য ব্যবসায়ী তাদেরই যথার্থ লাভ হয়েছে। সেই সাথে জোরালোভাবে সমাজে সংক্রামক ব্যাধির মতো বাসা বেঁধেছে সাম্প্রদায়িকতা।

দাঙ্গা ও দেশভাগের কারণে, ক্ষমতাসীন সরকারের বা মুসলিম লীগের পোয়াবারো অবস্থা। মুসলিম লীগের নেতৃত্বে দেশভাগ হয়ে ক্ষমতার মসনদে মুসলিম জমিদার, জোতদার, মহাজনি ব্যবসায়ীরাই বেশি উৎসাহী হয়। এরা ভয় দেখিয়ে, ভালো করে সীমান্ত পার করে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দরা যারা থানা, প্রশাসনকে প্রভাবিত করে হিন্দুদের রেখে যাওয়া যাবতীয় সম্পদ ক্রয় করে। এভাবেই দেশ ভাগের পরে পূর্ব বাংলার যে সমাজ গঠিত হয়েছিল সে সমাজের ছিল আরেক নতুন রূপ।

পাকিস্তান সৃষ্টির সাথে সাথে জমিদারি প্রথা বাতিল হলেও ভূমিহীন, দরিদ্র কৃষকদের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হয়নি। দীর্ঘদিনের সামন্তবাদী সমাজ ব্যবস্থার সামান্য পরিবর্তন হলেও গ্রামের সামাজিক অবস্থা অতীতের মতো রয়ে গেলো।

কেউ শত বিঘা জমির মালিক, কেউ তিন বিঘা জমির মালিক। বেশির ভাগই ভূমিহীন কৃষক। মোঘল আমল থেকে শুরু করে ইংরেজ আমলে অবৈধ পথে অর্জিত অর্থ দিয়ে এক শ্রেণীর ভারতীয় ব্যবসায়ীরা জমিদারি ক্রয় করে। ইংরেজ আমলে জমিদারি ক্রয় করে একদিকে ব্রিটিশ শাসনকে সুদৃঢ় করা, অন্যদিকে এদেশের ভাগ্যাহত কৃষকের দেওয়া খাজনার অর্থ ইংল্যান্ডে পাচার করতে সহায়তা করা। এই অভিশপ্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বিশেষ করে বাঙালি মুসলমানদের নিঃস্ব করে দেওয়া হয়েছিল।

এ প্রসঙ্গে কামরুদ্দিন আহমদ 'পূর্ব বাংলা সমাজ ও রাজনীতি' গ্রন্থের ৪০নং পৃষ্ঠায় জমিদার-প্রজাদের অবস্থা বর্ণনা করছেন–

> "দেশের প্রজা, চাষী, আর ভূমিহীন শ্রমিকেরা কোলকাতা এবং অন্যান্য শহরবাসী জমিদারদের দ্বারা খুবই শোষিত ও অত্যাচারিত হচ্ছিল। এইসব জমিদারদের প্রজাদের জন্য কোন মায়া-মমতা ছিল না। প্রজাদের থেকে সাধ্যাতিরিক্ত খাজনা আদায় করে তারা কলকাতায় নারী, সুরা আর রেসের পেছনে ব্যয় করতো কাড়ি কাড়ি টাকা। জমিদারদের দাবী মিটানোর জন্য প্রজারা মহাজনদের কাছে গহনা, বাসনপত্র বন্ধক রাখতো। প্রায়ই তারা নামমাত্র দামে জমির ফসল মহাজনদের নিকট বিক্রি করতো। তাদের সুদের হার কখনও কখনও শতকরা একশত টাকা ছিল। স্বভাবতই সবই ঋণ চাষীদের পক্ষে শোধ করা তাদের গোটা জীবনে সম্ভব হতো না। পরিশেষে বাধ্য হতো জমি-জমা বেচে ফেলতে। এইভাবে বাংলাদেশে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। শতকরা আশিভাগ এইভাবে জমিদার মহাজন শ্রেণীর হাতে সর্বশান্ত হয়েছিল।"

এই হলো সংক্ষেপে, বাঙালি কৃষক প্রজাদের ভূমিহীন হওয়ার ইতিহাস। এভাবেই দিনে দিনে ভূমিহীনদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এই ভূমিহীনদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি ছিল বাঙালি মুসলমান কৃষক। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, ব্রিটিশরা এদেশ থেকে চলে গেলেও তাদের সৃষ্ট জমিদার-জোতদারদের দাপট এতটুকুও কমেনি। কারণ তাদের জামিদারি পাকিস্তান সরকার বেশ কয়েক বছর টিকিয়ে রেখেছিল। পাকিস্তান আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিল মুসলিম লীগ। মুসলিম লীগের বেশির ভাগ নেতাই ছিলেন এদেশের ছোট-বড় জমিদার। ঢাকার অবাঙালি উর্দুভাষী নবাব পরিবার ছিল তাদের মধ্যে অন্যতম। এই মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ মুসলমানদের জন্য নিরাপদ রাষ্ট্র পাকিস্তান সৃষ্টি করার জন্য ধর্মীয় অনুভূতিকে কাজে লাগায়। মুসলিম লীগ সরকার ১৯৫০ সালে জমিদারি প্রথা বাতিল করে। একটি ব্যাপার

বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, ব্রিটিশ আমলে মুসলমান জমিদারের সংখ্যা কম থাকলেও হিন্দু জমিদারের সংখ্যা ছিল বেশি। যে সমস্ত এলাকায় হিন্দু জমিদার ছিল সেখানে ধর্মীয় কারণে অপেক্ষাকৃত বেশি নির্যাতিত হতো মুসলমান প্রজারা। অন্যদিকে মুসলমান জমিদারি এলাকায়ও দরিদ্র মুসলমান কৃষকরা নির্যাতিত হতো। উভয় ধর্মের জমিদারদের দ্বারা দরিদ্র মুসলমান কৃষকরা নির্যাতিত হতো। হিন্দু জমিদাররা নির্যাতন করতো যবন ভেবে আর মুসলমান জমিদাররা করতো আতরাফ ভেবে। অথচ হিন্দু জমিদারদের শোষণ নিপীড়নের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য বাঙালি মুসলমানরা ১৯৪৬ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য নির্বাচনে হুজুগে ভোট দিয়েছিল মুসলিম লীগকে। পূর্ব বাংলার মুসলমানরাই ভোট দিয়ে বাংলায় মুসলিম লীগকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়েছিল। মুসলমানরা আশা করেছিলেন জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ হবে এবং চাষাবাদ করার মতো চাষিরা জমি ফিরে পাওয়া যাবে। খাজনা দেওয়ার জন্য আর সর্বস্ব বিক্রি করতে হবে না।

আসাদ চৌধুরী লিখিত 'সংস্কৃতির বিকাশ ধারা' প্রবন্ধে উপর্যুক্ত বিষয়ের অবতারণা তিনি এভাবেই করেন–

> "এ বিষয়ে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ ছিল না যে, ১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে ভারত বিভাগের সময় পূর্ববাংলার মুসলমান সমাজ নির্দ্বিধায় তাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। নব সৃষ্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রকে সানন্দে বরণ করে নিয়েছেন। সে সময়কার উন্মাদনা প্রকাশ পেয়েছিল, এক ধর্ম ইসলাম, এক রাষ্ট্র পাকিস্তান, এক নেতা জিন্নাহ– এই রণধ্বনিতে। অন্য কোন যুক্তি পূর্ববাংলার মানুষ শুনতেই চায় নাই। তাদের অভিজ্ঞতায় ছিল জমিদারদের, মহাজনদের ব্যবসায়ী অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু। উপরন্তু যুক্ত বাংলায় ফজলুল হকের মন্ত্রিত্বে প্রণীত বঙ্গীয় কৃষি ঋণ আইন সত্যিই ঋণগ্রস্ত কৃষকদের বেশ কিছু অংশের উপকারে লেগেছে। এমনকি ১৯৪৩ সালে মনন্তরকেও মুসলিম লীগ হিন্দু ব্যবসায়ীদের কারসাজি হিসাবে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিল। পূর্ব বাংলার অধিকাংশ মানুষ তথা কৃষকের চেতনায় ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তান মানেই ছিল সে এবারে চাষ করার জমি পাবে, ঋণের জাল থেকে মুক্তি পাবে, ছেলে মেয়েরা স্কুলে গিয়ে লেখাপড়া শিখতে পারবে, দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়বে– এক কথায় গড়তে উঠতে চলেছে স্বাধীন উন্নতিশীল দেশ।"

ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, ধর্মপ্রাণ, সরল ধর্মভীরু, নিরক্ষর, দরিদ্র মুসলমানদের ধোঁকা দিয়ে, ইসলামের দোহাই দিয়ে নামমাত্র জমিদারি প্রথা বাতি করা হলো। কিন্তু ভূমিহীনদের চাষ করবার মতো জমি দেওয়া হলো না, সেচ দেওয়ার মতো

নলকুপ দেওয়া হলো না, বেশি উৎপাদনের জন্য সার দেওয়া হলো না। দরিদ্র মুসলমানদের লেখাপড়ার সুযোগ দেওয়া হলো না। বরং উল্টো বাঙালির মুখের ভাষাকে কেড়ে নেওয়ার জন্য রাষ্ট্রভাষা উর্দু করার ষড়যন্ত্র শুরু হলো।

মুসলিম লীগ শুধুমাত্র পতাকার পরিবর্তন, মানচিত্রের পরিবর্তন ও দেশের নামের পরিবর্তন করতে পেরেছিল। পরিবর্তন হলো না পূর্ববাংলার দরিদ্র কৃষক সমাজের ভাগ্যের। পাকিস্তান সরকারে মুসলিম লীগ ক্ষমতাসীন হয়ে শাসন-শোষণ শুরু করলো ইংরেজদের মতো ভিন্ন নামে, ভিন্ন পদ্ধতিতে। এ যেন মরার উপর খাড়ার ঘা।

পূর্ববাংলার জনগণ আশা করেছিলেন নিজেদের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হবে। তৎকালীন সময়ে পূর্ববাংলায় শতকরা ৯৫ জন মানুষ গ্রামে বাস করতো। গ্রাম বাঁচলে দেশ বাঁচবে– এই মুখরোচক শ্লোগান ছিল রাজনৈতিক নেতাদের মুখে, কিন্তু পরিণামে দৃশ্যত যা হয়েছে– গ্রামের অবস্থাপন্ন কৃষকও দরিদ্র হতে লাগলো, সেই সাথে ভূমিহীনদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগলো।

দরিদ্র কৃষকরা রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে, আধাপেটা খেয়ে, উদোম গায়ে শুধু একটি গামছা পরে জীবন-যাপন করতো। তিন বেলা খাবারও জুটতো না তাদের। সন্তানদের ভরণপোষণ, লেখাপড়াতো দূরের কথা অন্ন-বস্ত্র, বাসস্থানের ব্যবস্থাই অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল। এরকম অবস্থা ছিল পূর্ববাংলার গ্রামের কৃষকদের জীবনচিত্র। এই দৃশ্যগুলোই গ্রামে দেখা যেত। অনেক রাজনৈতিক নেতা গ্রামের সন্তান হলেও এ সমস্যাকে গুরুত্বের সাথে দেখতেন না।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তরুণ বয়সেই এই অবস্থাটি সূক্ষ্মভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন গ্রাম বাংলার প্রতিটি জেলা, মহকুমা, থানা, ইউনিয়নে ঘুরেছেন, সভা-সমাবেশ করেছেন, জনগণের দুঃখ-দুর্দশার কথা শুনেছেন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই তিনি আন্দোলন-সংগ্রামে নিজেকে ব্যপৃত রাখেন। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের ছাত্র থাকা কালে ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে তিনি গ্রেফতার হন। ১৯৪৯ সনের ২১ জানুয়ারি তিনি মুক্তি পান। সে বছরের ৩ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হন। রাজনৈতিক জীবনের প্রথম থেকেই তিনি সাধারণ দরিদ্র মানুষের ন্যায্য দাবির পক্ষে সোচ্চার ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া একজন ছাত্র স্বভাবতই লেখাপড়া শেষ করে পেশাগত জীবনে যাওয়ার চিন্তা-ভাবনা করেন। ভবিষ্যতে নিজে আর্থিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার লক্ষ্যে সর্বদাই চিন্তা-ভাবনা এবং নানাবিদ কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু এক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন

ব্যতিক্রম। তিনি নিজে ভবিষ্যতে আর্থিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা চিন্তা-ভাবনা না করে তরুণ বয়সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের নুন আনতে পান্তা ফুরানো চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের জীবন-মানের উন্নয়নের কথা ভাবেন। এদেশের সাধারণ দরিদ্র মানুষের জীবন-যাপনের উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যেই কাজ করার ব্রত নিয়েছিলেন।

তিনি গ্রামের একটি সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্ত মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ব্রিটিশ শাসনের শেষের দিকে অর্থাৎ ত্রিশ-চল্লিশের দশকে এদেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা তিনি শৈশব, কৈশোরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দেখেছেন। পাকিস্তান সৃষ্টি ও সৃষ্টি উত্তর পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে যুগোপযোগী চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে তিনি সামনে অগ্রসর হয়েছেন। ভারতবর্ষের রাজনীতির নাটকে দেখেছেন, ধর্মের দোহাই দিয়ে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে কিভাবে একটি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। দুই অঞ্চল মিলে পাকিস্তানের ৫৬% বাঙালিকে, বাংলা ভাষার ভূখণ্ড পূর্ববাংলাকে ৩% উর্দুভাষী ভারতীয় মোহাজের রাজনৈতিক, কূটনৈতিক নেতৃবৃন্দ শুধুমাত্র ধর্মের দোহাই দিয়ে শাসন করা শুরু করলেন। সে শাসনে পূর্ববাংলার জনগণের কোনো লাভ হলো না। জমিদারি প্রথা বাতিল হলেও পদ্ধতিগত কারণে কৃষক দরিদ্রই রয়ে গেল। ভূমিহীন মুসলমান কৃষকও মুসলিম লীগকে ভোট দিয়েছিল পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য, যাতে গরীব মুসলমান কৃষকের চাষ করার মতো ভূমির ব্যবস্থা হয়। গায়ে খেটে, ফসল ফলিয়ে জীবিকা উপার্জন করা যায় সেই স্বপ্নেই বিভোর ছিল বাংলার মুসলিম দরিদ্র কৃষক সমাজ। কিন্তু তাদের এই স্বপ্ন সফল হয়নি।

তৎকালীন দিনমজুর ভূমিহীন কৃষক সমাজের জীবন-যাপনের কিছু দিক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে তুলে ধরেছেন বঙ্গবন্ধু তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থের ১০৩ পৃষ্ঠায়–

> "এই সময় খাদ্য সমস্যা দেখা দিয়েছিল কয়েকটি জেলায়। বিশেষ করে ফরিদপুর, কুমিল্লা ও ঢাকা জেলার জনসাধারণ এক মহা বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল। সরকার কর্ডন প্রথা চালু করেছিল এক জেলা থেকে অন্য জেলায় কোন খাদ্য যেতে দিত না। ফরিদপুর, ঢাকা জেলার লোক খুলনা ও বরিশালের ধান কাটার মৌসুমে দল বেঁধে দিনমজুর হিসাবে যেতো। এরা ধান কেটে ঘরে উঠিয়ে দিত, বিনিময়ে একটা অংশ পেতো। এদের দাওয়াল বলা হতো। সারা মৌসুমে ধান কেটে নিজেদের ভাগের ধান নৌকায় করে ঘরে ফিরতো। তারা সকলে ছিল দিনমজুর ভূমিহীন। বাড়ী থেকে যাওয়ার আগে মহাজনদের কাছে ঋণ নিয়ে কয়েক মাসের খোরাক ঘরে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের দিয়ে ঘর থেকে বের

হতো ভাগে ধান কাটার উদ্দেশ্যে। ফিরে এসে মহাজনদের টাকা পরিশোধ করবে। দাওয়ালদের নৌকা কমই ছিল। অন্য দিকে যাদের কাছ থেকে একটা নৌকা নেওয়া হতো নৌকার ভাড়া হিসাবে তাদেরকে এক ভাগ দিতে হতো। বহু বছর যাবৎ এই পদ্ধতি চলে আসছিল। দাওয়াল যখন ধান কাটতে অন্য জেলায় যায় তখন সরকার বাধা দিত না। যখন তারা দুই মাস পর্যন্ত ধান কেটে তাদের ভাগের ধান নৌকায় তুলে রওয়ানা করতো বাড়ির দিকে তাদের বুভুক্ষু মা, বোন, স্ত্রী ও সন্তানেরা খাওয়ার জন্য পথ চেয়ে আছে আর কোনমতে ধার করে সংসার চালাচ্ছে, অপেক্ষা করছে কখন তাদের স্বামী, ভাই, বাবা ফিরে আসবে ধান নিয়ে পেট ভরে কিছুদিন ভাত খাবে– এই আশায়। তখনই নৌপথ রোধ করে বলে, "ধান নিতে পারবা না, সরকারের হুকুম ধান জমা দিয়ে যেতে হবে নতুবা নৌকা সমেত আটক ও বাজেয়াপ্ত করা হবে।" এমন পরিস্থিতিতে সহজে কি নৌকা ছাড়তে চায়? শেষ পর্যন্ত সমস্ত ধান নামিয়ে রেখে লোকগুলোকে ছেড়ে দেওয়া হতো। এবার আমার পক্ষে চুপ থাকা সম্ভব নয়। আমি এর তীব্র প্রতিবাদ করলাম, সভা করলাম, সরকারী লোকদের সাথে কথা বললাম, কিন্তু কোন ফল হলো না। এই লোকগুলি দিন মজুর। দুই মাস পর্যন্ত যে শ্রম দিল তার মুজুরি তাদের মিলল না। মহাজনদের কাছ থেকে ধার এনেছিল দুই মাসের খরচের জন্য। খালি হাতে ফিরে দেনার দায়ে ভিটা মাটি ছাড়তে হলো।"

ঘটনাটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যেভাবে তুলে ধরলেন, মহাজনদের ঋণের কারণে গ্রাম বাংলার খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষেরা কিভাবে ভিটে ছাড়া হয়, তা তিনি সূক্ষ্মভাবে উপলব্ধি করেছেন। এরকম অনেক ঘটনাই ঘটেছে। তিনি যেভাবে ঘটনা গুলির বর্ণনা দিয়েছেন মনে হয় তাতে তিনি খুব দুঃখ পেয়েছেন। যৌবনে রাজনীতির পাঠ নেওয়ার সময়ই বঞ্চিত, প্রতারিত, নিরীহ, সরল খেটে খাওয়া মানুষদের জীবন মানের উন্নতির কথাই ভেবেছেন। পাকিস্তান সৃষ্টির প্রাক্কালে মুসলিম লীগাররা এভাবে ধর্মের দোহাই দিয়ে দেশ ভাগ করে শুধুমাত্র একটি পতাকা এবং পাকিস্তান নামক একটি সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র উপহার দিয়েছিল। রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে মুসলিম লীগের দলীয় গঠনতন্ত্র এবং নেতৃবৃন্দদের চরিত্র, বৈশিষ্ট্য ও ধ্যান-ধারণা সম্বন্ধে তিনি অবহিত ছিলেন।

তিনি উপলব্ধি করেছিলেন এদের দিয়ে এভাবে এদেশের সাধারণ মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হবে না। বিশেষ করে একটি ভাষা ভিত্তিক বিশাল জনসংখ্যার ভূখণ্ডে বেশির ভাগ মানুষই যদি দরিদ্র, ভূমিহীন, ক্ষুধার্ত থাকে তাহলে পৃথিবীর বুকে মাথা তুলে দাঁড়ানো সম্ভব নয়। ভূমিহীন ক্ষুধার্ত মানুষগুলো ক্ষুধার তাড়নায় বিভিন্ন

জায়গায় বিচ্ছিন্ন হয়ে ভাসমান যাযাবরের মতো এক স্থান হতে অন্য স্থানে ঘোরাফেরা করতে করতে এক সময় বিলীন হয়ে যাবে। জাতি হিসাবে কয়েক দশক পরে হয়তো তাদের কোনো অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যাবে না। অথচ এই ভূখণ্ডে চাষাবাদের জন্য যে জমি আছে তা যদি কতিপয় লোকের কাছে না থেকে প্রকৃত চাষীদের নিকট থাকতো, তাহলে পর্যাপ্ত শ্রম দিয়ে উন্নত প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অধিক ফসল ফলানো সম্ভব হতো। তাহলে এদেশের আর্থ-সামাজিক ইতিহাস অন্যরকম হতো।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে একটি দেশের কৃষির উন্নয়ন। ভারসাম্যমূলক কৃষি উন্নয়ন শিল্প ক্ষেত্রে কাঁচা মালের পর্যাপ্ত যোগান সহ দেশের জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। কৃষিতে অংশগ্রহণকারী শ্রমজীবী মানুষেরা পর্যাপ্ত মজুরি পেলে তাদের দারিদ্র্য দূর হবে এবং তাদের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করা সহজ হবে। আধুনিক পদ্ধতিতে কৃষিকাজ করার প্রয়োজনে নিজেরা লেখাপড়া করে কারিগরী প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে অধিক ফসল ফলাতে সক্ষম হবে। অন্যদিকে দেশ হবে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ।

অর্থনীতিবিদদের মতে, একটি দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ থাকলে সে দেশ দ্রুত শিল্প ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে পারে। ফলে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাস পায়। যদি বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়, কোনোরকম ভর্তুকি না দিতে হয় তাহলে রাষ্ট্র অন্যান্য গঠনমূলক কার্যক্রম সহজে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হবে। যদি অর্থকরি ফসল উচ্চ মূল্যে আমদানি না করতে হয়, তাহলে দেশের উন্নয়নে সরকার নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারবে। কিন্তু ঘটনাক্রমে তৎকালীন সরকার পরিকল্পিতভাবে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য কিছুই করেনি। সামাজিকভাবে খান্দানি, আশরাফ বংশের তথাকথিত বহিরাগত উর্দুভাষী মুসলমান আর কিছু ছিলেন এদেশীয় বাঙালি। এরা বাঙালি হলেও উর্দুভাষীদের সংস্কৃতিকে অনুসরণ করে খান্দানি বংশীয় সাজতে চাইত। এদের সমর্থক ছিলেন এক শ্রেণীর বাংলা ভাষাভাষী মোল্লা-মওলুভি। এরা বিত্তশালীদের মসজিদে ইমামতি করে এবং তাদের বাড়িতে মাঝে মধ্যে মিলাদ পড়িয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তারা দরিদ্র বাংলাভাষী মুসলমানদেরকে অবহেলার চোখে দেখতেন। দরিদ্র এই মুসলমানদেরকে খলিফা আমলের ইতিহাস শুনিয়ে, ধর্মের ভয় দেখিয়ে ভীত সন্ত্রস্ত করে রাখতেন। এদের দারিদ্র্যকে ভাগ্যের লিখন বলে সান্ত্বনা দিতেন। এরা সর্বদাই নবাব জমিদার, জোতদার মুসলমানদের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হতেন। তৎকালীন এই সমস্ত কতিপয় মোল্লা, মওলুভির বৈশিষ্ট্য মুসলিম রেঁনেসার কবি কাজী নজরুল ইসলামের কৃষকের ঈদ নামক কবিতায় ফুটে ওঠে–

জড়ির পোশাকে ঢাকিয়া ধনীরা এসেছে সেথা
এই ঈদ গাহে তুমি কি ইমাম, তুমি কি এদের নেতা
নিংড়ারি কুরান হাদিস ও ফেকাহ এই মৃতদের মুখে
অমৃত দিয়াছ কি তুমি হাত দিয়ে বল বুকে
নামাজ পড়েছ, পড়েছ কোরান– রোজাও রেখেছ জানি
হায় তোতা শক্তি দিতে পেরেছ কি একটু খানি?

ঐ সময় রাজনৈতিকভাবে বিত্তশালী জমিদার, জোতদারদের পক্ষ নিয়ে ভূমিহীন দরিদ্র মুসলমান কৃষকদের ধর্মের দোহাই দিয়ে সন্ত্বনা দেওয়া হতো। একাজটি করতেন মুসলিম লীগের সমর্থক একশ্রেণির আলেমগণ। সে অবস্থাটি তখন বেশ আলোচিত ছিল। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম ওনার খেদোক্তি প্রকাশ করেছিলেন এই কবিতার মাধ্যমে।

চল্লিশের দশক থেকেই পাকিস্তান আন্দোলন শুরু হয়। সেই আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ড. আবদুল লতিফ মাসুমের 'অসমাপ্ত রাজনৈতিক সংস্কার' গ্রন্থে সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে–

"লরকে লেঙ্গে পাকিস্তান– কায়েম হবে পাক কোরান"– শ্লোগানই থেকে যায়। British brain child রা স্ববিরোধীতায় ভোগে। ভাষাগত, সংস্কৃতিগত ও জাতিগত ধারণার ব্যাপারে জ্ঞানের দিক দিয়ে রাজনৈতিকভাবে মোল্লারা ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ। সুতরাং কাঙ্খিত জাতি গঠন প্রক্রিয়া ব্যর্থ হয়। ঈমান এং আবেগ বাস্তবিকতার কাঠিন্যে পরাজিত হয়। ধনী গরীব বা আশরাফ আতরাফের ব্যবধান বৃদ্ধি পায়। পশ্চিমা আশরাফরা পূর্বের আতরাফ ছাড়া আর কিছু দেখতে পায়নি। মার্কসীয় ভাষায় এখানে যেটি বুর্জোয়া আর ওখানো বুর্জোয়া শ্রেণীর বুৎপত্তি ঘটে। সিকি অতিক্রান্ত হলেও একটি সম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পাকিস্তানীরা ব্যর্থ হয়। নগরায়নের গণ্ডি সীমিত হয়ে পড়ে। সাংস্কৃতিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বন্ধ্যাত্ব সূচিত হয়।"

সরল উদার, ধর্মপ্রাণ, দরিদ্র বাঙালি মুসলমানদের এরকম ধর্মীয় আবেগপূর্ণ রসনা সম্পৃক্ত শ্লোগান দিয়ে মুসলিম লীগ ভোট নিয়ে পাকিস্তান সৃষ্টি করেছে। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির পর এদেশের সাধারণ মানুষ আশাহত হলেন।

পাকিস্তান সৃষ্টির কিছুদিন যেতে না যেতেই সেই উর্দুভাষী নেপথ্যের নায়কগণ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাস্তবায়নের জন্য ষড়যন্ত্র শুরু করে। ১৯৪৮ সন থেকেই ভাষা ও সংস্কৃতির উপর আঘাতের প্রথম থাবা হিসাবে হাজার বছরের

ঐতিহ্যবাহী বাংলা ভাষাকে আক্রমণ করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব দেন পাকিস্তানের জনক মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ। গুজরাটি বংশোদ্ভুত জিন্নাহর ভাষাই ছিল উর্দু। যদিও বেশির ভাগ সময় তিনি ইংরেজিতে কথা বলতেন, তবুও লন্ডনে ব্যারিস্টারী করা পশ্চিমা সংস্কৃতির অনুকরণে জীবন-যাপনকারী জিন্নাহ সাহেব রাজনৈতিক কারণে উর্দু ভাষাকেই বেছে নিলেন।

বাংলার পরিবর্তে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাবে পূর্ববাংলার ছাত্রসমাজ আন্দোলন শুরু করে। সর্বশেষ ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র হত্যার ঘটনায় বাঙালিদের চৈতন্যোদয় হয়। পরবর্তীতে পূর্ববাংলার ছাত্রসমাজ ভাষা ও সংস্কৃতির আন্দোলন থেকেই পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে সংগঠিত হতে থাকে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী ছাত্রদের সংগঠিত করতে থাকেন এবং পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে তখনকার যুবসমাজকে সংগঠিত করার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যের ব্যাপারটিও তিনি তুলে ধরেন। ১৯৫৩ সালের ১৬ নভেম্বর দলের কাউন্সিলে তিনি সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। সাধারণ সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পাওয়ার পর সারা দেশ সফর করে সাধারণ মানুষকে সংগঠিত করতে থাকেন। আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রতারিত, বঞ্চিত কৃষক সমাজের জীবন-মানের উন্নয়নকল্পে বিশেষ উদ্যোগ নেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্যোগে যুব নেতাদের প্রচেষ্টায় হক-ভাসানি-সোহরাওয়ার্দীর মতো সিনিয়র নেতাদের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট গঠন করা হয়। আসন্ন নির্বাচনের জন্য দরিদ্র কৃষক সমাজের উন্নয়নের দাবি যুক্তফ্রন্টের ২১ দফায় অন্তর্ভুক্ত করেন।

১৯৫৪-এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে '৫২-এর ভাষা আন্দোলনের একুশে ফেব্রুয়ারীর ২১ সংখ্যাকে প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করে একুশ দফা দাবি যুক্তফ্রন্টের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়। এই একুশ দফা দাবির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দাবি যা জনগণের হৃদয় কেড়ে নিল, সেই তিনটি হলো–

১. বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্র করা হবে।
২. বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি ও সমস্ত খাজনা আদায়কারী– স্বত্ব উচ্ছেদ ও রহিত করিয়া ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে উদ্ভুত জমি বিতরণ করা হবে এবং উচ্চ হারের খাজনা ন্যায়সঙ্গত হ্রাস করা হইবে এবং সার্টিফিকেটযোগ্য খাজনা আদায়ের প্রথা রহিত করা হইবে।
৩. কৃষি উন্নতির জন্য সমবায় কৃষি ব্যবস্থার প্রবর্তন করা। সরকারী সাহায্যে সকল প্রকার কুটিরশিল্প ও হস্তশিল্পের উন্নতি সাধন করা হবে।

তরুণ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র কৃষকের দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে উপরোল্লিখিত ২ ও ৩ নং দাবি সংযোজিত করার জন্য প্রস্তাব দেন। তারই প্রচেষ্টায় মুখ্য দাবি হিসাবে নির্বাচনী সভাগুলোতে প্রচার চালানো হয়।

পাট ব্যবসায়কে জাতীয়করণ করার উদ্দেশ্যে পূর্ববঙ্গ সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীন করিয়া পাটচাষীদের পাটের ন্যায্যমূল্য দেওয়ার ব্যবস্থা করার কথা ঘোষণা করেন।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিপুল ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করতে সক্ষম হয়। এই প্রথম পূর্ব বাংলার জনগণ ধর্মব্যবসায়ী পশ্চিম পাকিস্তানের দোসর রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দদেরকে ভোটের মাধ্যমে বর্জন করেন। সেই নির্বাচনে মুসলিম লীগের অনেক প্রবীণ বাঘা বাঘা নেতা যুক্তফ্রন্টের পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের তরুণ প্রার্থীদের নিকট জামানত হারান। যুক্তফ্রন্ট নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে পূর্ব বাংলায় প্রাদেশিক সরকার গঠন করেন। কৃষক-প্রজা পার্টির নেতা শের-এ বাংলা ফজলুল হক মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নেন। শের-এ বাংলা ফজলুল হক, মাওলানা ভাসানী, সোহরাওয়ার্দীর মধ্যে রাজনৈতিক মতপার্থক্য ছিল প্রকট। শের-ই বাংলা ফজলুল হককে মন্ত্রীসভা গঠন করতে দিলেও পরিপূর্ণ কার্যকরী মন্ত্রীসভা গঠন করতে পারেননি। তিনি নিজ দলের অনেক জমিদার এবং অভিজাত পরিবারের লোককে মন্ত্রীসভায় দায়িত্ব দিয়েছিলেন। বিশেষ করে সে কারণেই কৃষকদের দাবি-দাওয়া পূরণ করতে ব্যর্থ হয় যুক্তফ্রন্ট সরকার। সেই সময় সরকারের আমলাদেরও প্রভাব ছিল অপরিসীম। দেশ ভাগের সাথে সাথে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অবাঙালি উর্দুভাষি সরকারি আমলারা ইংরেজদের অধীনে চাকরির অভিজ্ঞতা নিয়ে জড়ো হলেন পাশ্চিম পাকিস্তানে।

এইসব আমলার পূর্ব বাংলার জনগণ সম্পর্কে ধারণা ছিল অদ্ভুত। এদেশের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, মানুষের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কোনো ধারণাই ছিল না। ব্রিটিশ শাসনের কোলে পরিপুষ্ট গোলামী মনোবৃত্তির এইসব আমলা বেশির ভাগই ছিলেন উর্দুভাষি। মুসলিম লীগের অভিজাত রাজনীতিবিদদের মতো তারাও অধস্তন কর্মচারীদের মধ্যে হিন্দুবিদ্বেষী মনোভাব সৃষ্টি করার চেষ্টা করতেন। যাদের শ্রম এবং আত্মত্যাগের কারণে নির্বাচনে মুসলিম লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে পাকিস্তান আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সেই সব বাংলা ভাষাভাষী মুসলমান দরিদ্র কৃষক সমাজের প্রতি ছিল আমলাদের বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি। অথচ পাকিস্তান সৃষ্টির পিছনে এসব আমলাদের কোনো অবদানই ছিল না। এরা বেশির ভাগই ছিলেন ইংরেজ প্রভুদের অনুগত সিভিল সার্ভিসের আমলা। এইসব আমলা এবং

রাজনীতিবিদের অপপ্রচারের সাথে এদেশীয় বাংলা ভাষাভাষী কতিপয় সুযোগ সন্ধানী তথাকথিত ইসলামী রেঁনেসার ধারক-বাহক বলে খ্যাত সাংবাদিক ও লেখকগণ একাত্ম হয়ে প্রচার চালাতেন। আর এদেরই পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ঢাকার নবাব পরিবারের নেতৃবৃন্দ এবং তাদের দোসররা। এব্যাপারে সুসাহিত্যিক অধ্যাপক, গবেষক সৈয়দ আলি আহসান ১৯৭১ সালের রক্তাক্ত বাংলা প্রবন্ধ গ্রন্থে স্বদেশ আন্দোলন ঃ সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রবন্ধে উল্লেখ করেন–

> "মুসলমানদের এই মানসিকতা নির্মাণের কাজে যে সব বাঙালি মুসলমান নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তারা ছিলেন সাধারণ বাঙালি সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন। এদের বেশি ভাগই উর্দুভাষি বিত্তবান মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক। যেমন– ঢাকার নবাব পরিবারের খাজা নাজিমুদ্দিন এবং সাধারণ বাঙালি নেতা ফজলুল হক। এই স্বাধীনতার পিছনে তাদের কোন আত্মত্যাগ, দেশপ্রেম ছিল না। ছিল না কোন অন্তর্দাহ। ছিল শুধু ধর্মান্ধতা এবং হিন্দু বিরোধিতা।"

ধর্মান্ধতা এবং হিন্দুবিদ্বেষী কালচারের রাজনৈতিক দর্শনে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলেও গ্রামাঞ্চলের কৃষক সমাজের সমস্যা আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিশাল গ্রামীণ সমাজের একদিকে ভূমিহীন কৃষক, অসচ্ছল কৃষক অন্যদিকে জোতদার, ভূস্বামী এবং ধনাঢ্য ব্যবসায়ীরা– এই দুই শ্রেণীর ব্যবধান ক্রমশই প্রকট হতে থাকে।

১৯৫০ সালে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ হলেও বর্তমানেও ভূমি বণ্টনে রয়েছে মারাত্মক অসমতা। একদিকে রয়ে গেছে মুষ্টিমেয় ভূস্বামী কৃষক এবং অন্যদিকে রয়েছে ব্যাপক সংখ্যক (প্রায় ৭০%) ভূমিহীন। সরকারিভাবে ভূমির মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করা হলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। তবে একথা সত্য যে, ভূস্বামী বলতে বাংলাদেশে যা বোঝায় তা খুব কম গ্রামেই আছে। কারণ বর্ধিত জনসংখ্যার চাপের কারণে বৃহত্তম কৃষি ক্ষেতের মালিকানা ইতিমধ্যেই সংখ্যালঘিষ্ঠ পুঁজিপতিদের হাতে চলে গেছে। এজন্য ভূসম্পত্তির অপর্যাপ্ততা গ্রামীণ অর্থনীতির অন্যতম একটা দিক। দীর্ঘদিনের এই পুঞ্জীভূত অসমতা থেকেই সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে নির্বাচনে। ১৯৫৪-এর যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে এদেশের মানুষের অতীতের ধ্যান-ধারণা থেকে মুক্ত হয়ে নতুন সমাজ গড়ার লক্ষ্যে যুবসমাজ সংগঠিত হয়। নির্বাচনে যুবসমাজের প্রাণপণ প্রচারের কারণে গ্রাম-বাংলার কৃষক সমাজও পাকিস্তানের মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে প্রস্তুত হয়।

যুক্তফ্রন্টের দাবির প্রতি সমর্থন দিয়ে সর্বস্তরের ভূমিহীন দরিদ্র কৃষক যুক্তফ্রন্টকে ভোট দেয়। যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করলেও মন্ত্রীসভা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। একদিকে নিজেদের অনৈক্য, ফ্রন্টের জ্যেষ্ঠ নেতাদের মধ্যে মতপার্থক্য, অন্যদিকে পাকিস্তান

সরকারের অগণতান্ত্রিক রূপ প্রকাশ পায়। গণতান্ত্রিক নির্বাচিত সরকার পাঁচ বছর স্থায়ী হবার কথা। কিন্তু ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকার পাকিস্তানের খান্দানী অভিজাত তন্ত্রের রাজনীতি টিকিয়ে রাখার অভিপ্রায়ে ষড়যন্ত্র করতে শুরু করে।

কেন্দ্রীয় সরকার সহজেই অনুধাবণ করলেন যে, যুক্তফ্রন্ট সরকারের কার্যক্রম পূর্ণ মেয়াদে টিকে থাকলে পাকিস্তান সরকারের পৃষ্ঠপোষক অবাঙালি পুঁজিপতি, ব্যবসায়ী, জোতদারদের পূর্ব বাংলায় ব্যবসায়ীক সুবিধা এবং ক্ষমতা দুটিই হারাতে হবে। অবাঙালি উর্দুভাষি বিহারী পশ্চিম পাকিস্তানিরা সরকারি লাভজনক চাকুরি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হতে হবে।

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, অধ্যাপক ড. আতিউর রহমান 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাংলাদেশের আরেক নাম' গ্রন্থের ৯৩ পৃষ্ঠায় লেখেন–

> "তখন পর্যন্ত পূর্ব বাংলয় মুসলিমলীগ বহিরাগত দল ছিল। অবাঙালি জমিদারদের প্রভাবে এটি চলতো। কিন্তু জমিদারি প্রথা উচ্ছেদে রাজী হবার সাথে সাথেই মুসলিমলীগ পূর্ব বাংলার বিপুল সমর্থন পেল। কৃষক প্রজা পার্টির নেতা এ.কে. ফজলুল হক মুসলিম লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতায় পরিণত হলেন এবং পাকিস্তান আন্দোলন তার লাহোর প্রস্তাব এক নতুন মাত্রা যোগ করল। পূর্ব বাংলার কৃষকরা জমিদারদের শোষণে প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তাই এ অঞ্চলে মধবিত্ত মুসলমানেরা সর্বান্তকরণে চেয়েছিল যাতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহলে জমিদারি প্রথাটি উচ্ছেদ হবে। পাশাপাশি তারা স্বপ্ন দেখছিল এমন একটি সভ্য-স্বাধীন রাষ্ট্র যাতে তারা অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে আগের চেয়ে ভাল থাকতে পারবে। এসব ক্ষেত্রে আরও বেশি স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবে। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর তাদের সে স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়নি। জমিদারি প্রথা সত্যিকার অর্থে তখনও লোপ পায়নি। এই ব্যবস্থার উচ্ছেদের ক্ষেত্রে যতটা না আইনের দুর্বলতা ছিল তারচেয়ে আইন বাস্তাবায়নের দুর্বলতা ছিল আরও বেশি। নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের প্রশাসন ঔপনিবেশিক শাসনের চেয়ে কম নির্মম কিছু ছিল না। পূর্ব পাকিস্তানের শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সদস্যরা তাদের উন্নয়নের ধারা নিয়ে তাই দারুণ অসন্তুষ্ট ছিল। তাদের আর্থসামাজিক বিকাশের পথ সংকুচিত হতে শুরু করেছিল। খাজা নাজিমুদ্দিন বরাবরই জমিদারদের পক্ষে ছিলেন। আর তিনিই হলেন পূর্ববাংলার মুখ্য মন্ত্রী। অল্প সময়ের মধ্যে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। তিনি কখনও পূর্ববাংলার মধ্যবিত্তদের ইচ্ছার মর্যাদা দেননি। বরং সারাজীবনই অবাঙালি আমলা, প্রকৌশলী, শিল্পপতিদের আশা-আকাঙ্খার প্রতীক হয়ে ছিলেন। পূর্ব বাংলারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গুরুত্বপূর্ণ অংশ ধনী হিন্দুরা দলে দলে ভারতে চলে গেল। ফলে ব্যবসায় ও প্রশাসনে শূন্যতা দেখা দিল। যে সব মুসলমানদের হাতে উদ্বৃত্ত পুঁজি ছিল তারা দেশান্তরী হিন্দুদের সম্পত্তি কিনতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তা ব্যবসা কি শিল্পে ও তাদের পুঁজি খাটালেন।"

ঘুরে ফিরে একটি কথাই আসে। পূর্ব বাংলার ভূমিহীন দরিদ্র গ্রামের ধর্মপ্রাণ মুসলমানের ভোটে মুসলিম লীগ ক্ষমতাসীন হলো, পাকিস্তান সৃষ্টি হলো। নির্বাচনে এই দরিদ্র মুসলমানগণই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। পাকিস্তান সৃষ্টির পর ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সুবিধা নিল– দাঙ্গার সময় এবং পরে হিন্দুদের সম্পদ ক্রয় করে। এই সব সম্পদের বেশির ভাগ ক্রেতা ছিলেন পুঁজিপতি ধনাঢ্য মুসলিম লীগ সমর্থক ব্যবসায়ী কর্মীরা। এভাবে তারা আরও ধনী এবং সম্পদশালীতে পরিণত হয়। অন্যদিকে গ্রামে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান আরও ক্রমশই বৃদ্ধি পেতে লাগল। অবৈধভাবে অর্জিত সম্পদের মালিক হয়ে দেশীয় কিছু বিত্তশালী ব্যক্তি সামাজিকভাবে আশরাফ শ্রেণীতে পরিণত হবার প্রতিযোগিতায় নেমে গেল। এভাবে পাকিস্তান সৃষ্টি হবার পরও আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বিশাল অসাম্য রয়েই গেল।

পাকিস্তানের আমলাতান্ত্রিক রাজনীতির বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে গণতন্ত্র অবরুদ্ধ হয়ে গেল। জনগণের ভোটের কোনো মূল্য রইল না। এমনিতেই দুর্বল রাজনৈতিক ভিত্তির কারণে সরকারের আমলারা প্রশাসনে টেবিলে বসে ষড়যন্ত্রের গুটি চালাতেন। সেনাবাহিনী ও সিভিল সার্ভিসের আমলারা মিলে পাকিস্তান সরকারের প্রতিভু হয়ে রইল। অবাঙালি আমলা, সেনাবাহিনী ও ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের বোধগম্য হয়নি যে, সাধারণ বাঙ্গালি মুসলমান জনগণের ভোটে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছে। সময়ের বিচারে এই সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের চাহিদা কী– তা মনেপ্রাণে জানতে হবে এবং তা বিবেচনা করতে হবে। এই জনগোষ্ঠীর প্রধানতম সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের জন্য গ্রহণযোগ্য নেতা-কর্মীদের সমন্বয়ে জনগণকে সংগঠিত করতে হবে। এদের ভাষা, সংস্কৃতি, জীবন-যাপনকে ভালোবাসতে হবে এবং তাদের সাথে মিশে যেতে হবে। সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করে, সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের লক্ষ্যে সংগঠিত জনগণকে নিয়ে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এর কোনোটাই এই তিন শ্রেণীর চিন্তা-চেতনার অভিধানে ছিল না।

নব্য স্বাধীন পাকিস্তানের জনগণের দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য যুগোপযোগী যে সব কৌশল অবলম্বন করা প্রয়োজন ছিল, মুসলিম লীগ সরকারের প্রথম দিকে এধরনের কোনো কর্মকাণ্ড লক্ষ্য করা যায়নি। মুসলিম লীগ সরকার শুধুমাত্র জমিদার, পুঁজিপতি ধনাঢ্য পশ্চিম পাকিস্তানি শিল্পপতিদের পৃষ্ঠপোষকতায়ই ব্যস্ত

থাকতেন। অন্যদিকে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা সেনাবাহিনীতে কিভাবে অবাঙালিদের পুনর্বাসান করা যায়, তার অর্থ সংগ্রহ করার কাজে ব্যস্ত থাকতেন। দুই দেশের সাধারণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ কোনো কর্মসূচি প্রণয়ন করার চিন্তা-ভাবনা ছিল গৌণ।

তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোতে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে রাজনীতিবিদরা কিভাবে কাজ করবেন, তারই একটি বর্ণনা পাওয়া যায় ড. আবদুর রশিদ অনূদিত বিশ্ববরেণ্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হার্বার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্যামুয়েল পি. হান্টিংটন-এর বিখ্যাত গ্রন্থ 'পলিটিক্যাল অর্ডার ইন চেঞ্জিং সোসাইটিজ'-এর ৪৭৭ থেকে ৪৮৩ নং পৃষ্ঠায়–

> "গ্রামীণ এলাকায় মানুষজনকে আত্মীকরণ কর্মসূচির জন্য চাই সময়ে সময়ে তাদের চাহিদা মোতাবেক কৃষি ও গ্রমীণ এলাকার উন্নয়ন ও সংস্কারের জন্যে কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা। এজন্য ভূমি সংস্কারের প্রয়োজন হতে পারে। প্রয়োজন হল সরকারী বরাদ্দ বৃদ্ধির। এ অর্থে দলগুলি ভোটারদের কাছে প্রতিশ্রুতি অনুসারে গ্রামীণ এলাকার প্রত্যাশা যদি তাদের এসব প্রত্যাশা যৌক্তিকভাবে পূরণ করা যায় তাহলে তারা তাদের গতানুগতিক রক্ষণশীল অবস্থান থেকে সরে আসতে পারেন।"

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের আগে জাতীয়তাবাদী এলিটগণ গ্রামীণ জনসমর্থন অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এই কারণে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে শোচনীয়ভাবে মুসলিম লীগ প্রার্থীরা পরাজিত হয়। প্রকৃতপক্ষে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের সামাজিক, সাংস্কৃতিক অবস্থার সঠিক চিত্র পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগণের রক্ত-মাংসে, অস্থি-মজ্জায় প্রোথিত হতে পারেনি। বিশেষ করে পূর্ব বাংলায় ধর্মের দোহাই দিয়ে উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিল ঠিকই, কিন্তু গঠনমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে জনগণকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। উভয় অঞ্চলের মধ্যে ভাষা, সংস্কৃতি ও আর্থিক অবস্থার ভিন্নতা ছিল অনেক বেশি। যার জন্য শ্রেণীবৈষম্য সৃষ্টি হয়েছিল।

সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন বৈষম্যমূলক নীতির কারণে পূর্ব বাংলার মানুষ আশাহত হয়। ধাপে ধাপে বিভিন্ন বৈষম্যমূলক আচরণ ও নির্যাতনের কারণে মানুষের মোহ ভাঙতে শুরু করে। '৪৮ ও ৫২-এর ভাষা আন্দোলনের নির্যাতিত তরুণ সমাজ মুসলিম লীগ সরকারবিরোধী একটি সরকার গঠন করার প্রয়াস পান। এরই মধ্যে নিম্নমধ্যবিত্ত, গ্রামের কৃষক পরিবার থেকে উঠে আসা এক শ্রেণীর তরুণ সাহসী, মেধাবী রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিকাশ লাভ করে। এই শ্রেণীটির বিশাল

একটি অংশ পঞ্চাশের দশকেই কেন্দ্র থেকে জেলা ও থানা পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদর্শী নেতৃত্বে সংগঠিত হতে থাকে। ১৯৫৪ সনে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে তাঁরই নেতৃত্বে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষাকারী যুবসমাজের নির্বাচনী প্রচার কৌশলে পূর্ব বাংলার সাধারণ জনগণের ধ্যানধারণা পরিবর্তন হতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। উল্লেখ্য যে, নির্বাচনের পরে যুক্তফ্রন্টের রাজনৈতিক সফলতার চেয়ে বেশি সফলতা অর্জিত হয়েছিল অভিজাত মুসলিম লীগ এবং তাদের দোসর ধর্মান্ধ গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী প্লাটফর্ম গঠিত হওয়ার মাধ্যমে।

পূর্ব বাংলার জনগণের এ ধরনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের অনুরূপ একটি তথ্য পাওয়া যায় কূটনীতিক এবং গবেষক কমরুদ্দিন আহমদের লেখা 'পূর্ব বঙ্গ সমাজ ও রাজনীতি' গ্রন্থের ৯৫ পৃষ্ঠায়–

> "পূর্ব পাকিস্তানে একটি ক্ষুদ্র অথচ শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী আছে যারা সেখানে তথাকথিত মোল্লা, পীর দূর্নীতিপরায়ন ষড়যন্ত্রকারী, বক্তৃতাবাগীশ রাজনীতিক আর দেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রে নানাবিদ শোষণকারীদের চিরাচরিত প্রভাব নষ্ট করে দিয়ে গড়তে চায় এক আধুনিক সমাজ। সমাজের এই সমস্ত সচেতন অংশটি ঊর্দুভাষী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির মধ্যে নিজ সত্তা বিলীন না করে বাংলা ভাষার রক্ষণ ও আধুনিকীকরণের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। নিজস্ব ইতিহাস, সাহিত্য ও কলার সাথে সম্পর্কে পূর্ববাংলা বাসীরা গর্বিত।"

পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ জনগণ তেমন রাজনীতি সচেতন ছিলেন না। বিশেষ করে পাঞ্জাব, সিন্ধু প্রভৃতি অঞ্চলের কৃষকরা ছিল প্রকৃতপক্ষে ভূমিদাস। তাই রাজনীতির ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব কোনো মতামত বা মতাদর্শ গড়ে ওঠেনি। ভূস্বামী এবং অভিজাত রাজনৈতিক ব্যক্তিদের মতামতই ছিল তাদের মত। সেদিক থেকে পূর্ববঙ্গের কৃষক সমাজের অবস্থা ছিল ব্যতিক্রম। মুসলিম লীগ সরকার কর্তৃক জনগণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বঞ্চিত ও প্রতারিত হওয়ায় এখানকার নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত জনগণের মধ্যে রাজনীতি সম্পর্কে এক তীব্র অনুসন্ধিৎসু মন সৃষ্টি হয়। নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে তারা সচেতন হয়ে ওঠে। তাই ১৯৪৬ সালে মিথ্যা প্রলোভনে মুসলিম লীগকে ভোট দিলেও স্বল্প সময়ের ব্যবধানে ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে সচেতন কৃষক সমাজ মুসলিম লীগকে বর্জন করে। ৩০৯টি আসনের মধ্যে মাত্র ৯টি আসন মুসলিম লীগ পায়। ১৯৪৮ ও ১৯৫২ সালের ভাষা-সংস্কৃতির উপর আঘাত এবং কৃষক সমাজের আকাঙ্ক্ষীত উন্নয়ন না হওয়ায় সারা পূর্ব পাকিস্তানের বাংলাভাষী জনগণের মাঝে ব্যাপক মানসিক পরিবর্তন ঘটে। মুসলিম লীগের ধর্মীয় অজুহাত এবং হিন্দুবিদ্বেষী প্রচারণায় এবার পূর্ব বাংলার জনগণ বিভ্রান্ত হয়নি।

উল্লেখ্য যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ধর্মের দোহাই দিয়ে যেভাবে বাঙালিদের বঞ্চিত করা হতো, সেভাবে কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাবী, সিন্ধি, বালুচ সীমান্ত প্রদেশে ধর্মের দোহাই দেওয়া হতো না। পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নে রাষ্ট্রীয় বাজেটের বড় অংশই ব্যয় করা হতো। অন্যদিকে পূর্ব বাংলার জনসংখ্যা বেশি থাকা সত্ত্বেও উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হতো পশ্চিমের তুলনায় অনেক কম। পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে বাঙালিদের উপর সবেচেয়ে বেশি আঘাত এসেছিল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই অবর্ণনীয় বৈষম্য, বঞ্চনা, অবহেলা শরু হয়। পূর্ববঙ্গে উৎপাদিত পণ্যের রফতানির অর্জিত অর্থ পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হতো। ফুলে ফলে ফসল সমৃদ্ধ পূর্ববঙ্গকে বঞ্চিত করে পশ্চিম পাকিস্তানকে সমৃদ্ধ করতে শুরু করে। এই বৈষম্যের চিত্রটি নিম্নরূপ–

১৯৫১-৫২ এবং ১৯৫৯-৬০-এ পূর্ব পাকিস্তানের চেয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের মাথাপিছু সরকারি উন্নয়ন মূলক ব্যয় ছিল ৩.৫ থেকে ৫গুণ বেশি। ১৯৬০-৬১ সালে ও ১৯৬৯-৭০ সালে ছিল ২.২ থেকে ২.৬ গুণ বেশি। এদিকে ১৯৬৪-৬৫ সালে মোট উন্নয়নমূলক সরকারি খরচে পূর্ব পাকিস্তানের অংশ ছিল ৩১ অংশ।

বেসরকারি খাতে বিনিয়োগের নিয়ন্ত্রকও ছিল কেন্দ্রীয় সরকার। শিল্প বিনিয়োগের লাইসেন্স ও বৈদেশিক মুদ্রার বণ্টনের মাধ্যমে বেসরকারি বিনিয়োগে ১৯৬০ দশকের শুরুতে পূর্ব পাকিস্তানের অংশ ছিল মাত্র ১৩ অংশ এবং ১৯৬০-এর মাঝামাঝি গিয়ে দাঁড়ায় ২০ শতাংশে।

বেসরকারি, সরকারি কোনো খাতই পূর্ব পাকিস্তান ঐ দুই দশকে ৩৬% অংশের বেশি বিনিয়োগ পায়নি।

ফলাফলে দেখা গেছে পশ্চিম পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় পূর্ব পাকিস্তানের চেয়ে ১৯৪৯-৫০-এ ১৭ শতাংশ, ১৯৫৯-৬০-এ ৩২ শতাংশ এবং ১৯৬৯-৭০-এ ৬১ শতাংশ বেশি ছিল।

১৯৫০ দশকের শুরু থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল ভৌত অবকাঠামো ও মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রচুর বিনিয়োগ করার মাধ্যমে। তখন থেকেই এসব ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান তুলনামূলকভাবে বঞ্চিত হতে থাকে। বৈষম্যমূলক বাণিজ্য এবং বৈদেশিক মুদ্রানীতির ফলে পূর্বের সম্পদকে পশ্চিমে ব্যাপকভাবে স্থানান্তরের পথ সুগম হয়। ১৯৫০-৬০ দশকে সম্পদ পাচার পুরোদমে শুরু হয়। রপ্তানি বাণিজ্যে পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বৃত্ত অংশ অধিক হারে পশ্চিমে পাকিস্তানে ব্যবহৃত হতো। এভাবে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় পূর্ব বাংলায় উৎপাদিত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে উপার্জিত নগদ অর্থ পশ্চিমে পাচার হতে থাকে। অথচ পূর্ববঙ্গের কৃষকের হাড়ভাঙা খাটুনির উৎপাদিত পাটের আশাতীত মূল্য ভাগ্যে

জুটতো না। এভাবেই পূর্ব বাংলার কৃষক সমাজের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে নিপতিত হতে থাকে।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে এদেশের মানুষ যখন ক্রমান্বয়ে অর্থনৈতিকভাবে বৈষম্যের শিকার হচ্ছিলেন তখন তরুণ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান দারিদ্র্য পীড়িত জনগণের কল্যাণের কথাই ভেবেছেন। তিনি দারিদ্র্য পীড়িত, মৃত্যুপথযাত্রী অনাহারক্লিষ্ট মানুষকে যেমন দেখেছেন ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষের সময় তেমনি ১৯৪৬-এ ছাত্রাবস্থায় কলকাতায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সময় নিগৃহীত হতে দেখেছেন গরীব শ্রমজীবী মানুষদের। নিম্নমধ্যবিত্ত, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, তাঁতি, জেলে, কামার, কুমার সমস্ত পেশাজীবী যারা পাকিস্তান সৃষ্টির পর বিভিন্ন বৈষম্য ও ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন সে শ্রেণীর জনগণকে বুঝতে ও চিনতে তাদের সাথে হৃদয় দিয়ে মিশেছেন। তাদের সমস্যার কথা শুনেছেন ও সমাধান করার জন্য তাদের দাবি-দাওয়া নির্বাচনী ইশতেহারে সংযোজন করেছেন।

পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষের মোহভঙ্গ হয়েছে, ধর্মান্ধতা কেটেছে, চিন্তাধারার পরিবর্তন হয়েছে। রাজনীতির এই পালাবদলে মুসলিম লীগ বা পাকিস্তান সরকার গ্রাম বাংলার এই সাধারণ জনগণের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের অবস্থাটি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে। সেজন্য তারা তাদের রাজনৈতিক কৌশল ও পরিবর্তন করতে পারেনি। বরং পূর্বের মতোই রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার অক্ষুণ্ন রাখে।

গ্রামাঞ্চলে কৃষকের কৃষিই ছিল জীবন-জীবিকার প্রধান উপায়। কৃষক আজও হাজার হাজার বছরের পুরাতন লাঙ্গল, জোয়াল ও হালের বলদ দ্বারা চাষ করে। নিম্নমানের বীজ, গোবর সার, অতি বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, শস্যে মড়ক ইত্যাদি এদেশের চাষ পদ্ধতির অন্যতম দিক। চাষাবাদের সাথে জড়িত বেশির ভাগ কৃষকই ছিল নিরক্ষর, ভগ্ন স্বাস্থ্য ও কুসংস্করাচ্ছন্ন। আধুনিক চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই ছিল না। এসব অবস্থার ফলে কৃষিতে উৎপাদনশীলতার মাত্রা ছিল খুবই নিম্নমানের। সরকারের অপর্যাপ্ত বাজেটের ফলে সেচকার্য, রাসায়নিক সার, কীটনাশক, উন্নত বীজ খুব কমই পেয়েছে কৃষক সমাজ।

তবে পূর্ব পাকিস্তানের কৃষক সমাজ বঞ্চিত হলেও অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের যোগাযোগ ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য স্বল্প সময়ে বরাদ্দের ব্যবস্থা করা হতো। অথচ রপ্তানি আয়ের বেশির ভাগই অর্জিত হতো পূর্ব বাংলার অর্থকরী ফসল থেকে। কিন্তু উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিনিময়ে জুটতো শুধুই বৈষম্যের সূচক। যেমন– ১৯৪৯-৫০ সালে পূর্ব পাকিস্তানের বার্ষিক উৎপাদন হয়েছিল ১২৩৭ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার আর পশ্চিম পাকিস্তানের ১২০৯ কোটি ১০ লক্ষ টাকা– অর্থাৎ, পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে পূর্ব পাকিস্তানের ২৮ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা বেশি ছিল।

কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের লোকসংখ্যা বেশি থাকায় মাথাপিছু আয়ের হিসাবে পূর্ব পাকিস্তানের আয় কিছু কম ছিল– অর্থাৎ, মাথা পিছু আয় প্রায় ১৭% কম ছিল কিন্তু এই পার্থক্য ক্রমান্বয়ে বেড়ে ১৯৬৯-৭০ সালে গিয়ে দাঁড়ায় মাথা পিছু ৭০%। সবচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার ছিল ১৯৪৯-৫০ থেকে ১৯৫৯-৬০ এই এক দশকে পশ্চিম পাকিস্তানের মাথাপিছু উৎপাদন যখন বেড়ে গেছে তখন পূর্ব পাকিস্তানে তা ১৯৪৯-৫০ সালে যা ছিল তার থেকে আরও কমে গেছে।

প্রাদেশিক ও মাথাপিছু উৎপাদনের এই যে বৈষম্য দিন দিন বেড়েছে তার কারণ এই নয় যে, পূর্ব পাকিস্তান বা ৪৭ উত্তর বাংলাদেশের সম্পদ ছিল অপ্রতুল। এই বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়েছিল ঔপনিবেশিক শোষণের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশের সম্পদ নানাভাবে, নানা পথে পশ্চিম পাকিস্তানে পাচারের মাধ্যমে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শোষকদের পরিবর্তে পাকিস্তানের শোষকদের হাতে বাংলাদেশের এই লুণ্ঠন বঞ্চনার ইতিহাস, দেশী-বিদেশী অনেক পণ্ডিত বহু তথ্য-উপাত্ত দিয়ে উপস্থাপন করেছেন।

রবিনসন এবং এম.কিন্দ্রন-এর 'ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট ইন সাউথ এশিয়া' গ্রন্থের ৭০ পৃষ্ঠায়–

> "পাক পরিকল্পনা কালে (১৯৫০-৫৫) উন্নয়নের লক্ষ্যে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ হয়েছিল মাত্র ২০ শতাংশ। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে এই অংশ কিছুটা বাড়লেও কোন সময়েই তা ৪০ শতাংশ অতিক্রম করেনি। রাজস্ব খাতেও বাংলাদেশ থেকে যে আয় হতো তার বেশ বড় একটা অংশ নির্ধারিত থাকতো কেন্দ্রের ব্যয়ের জন্য। বস্তুত এই ব্যয় পশ্চিম পাকিস্তানে হতো। কারণ পাকিস্তানের রাজধানি বা কেন্দ্র ছিল প্রথমে করচি, পরে রাওয়ালপিন্ডি ও সর্বশেষ ইসলামাবাদ। ১৯৬০ সালে থেকে ৭০-এর দশকে পরিকল্পনার বাইরে বিপুল অঙ্কের সম্পদ বিনিয়োগ করা হয়। এই বিনিয়োগের সিংহভাগই ব্যয় করা হয় সিন্দিদের জল সম্পদ ব্যবহার করে পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে, শিল্পের জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদন বহুগূণ বৃদ্ধি করতে, কৃষির জন্য বিপুল অঞ্চলে জলের যোগান নিশ্চিত করতে। উন্নয়ন ও রাজস্বখাতে বিপুল বিনিয়োগের ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের রাস্তা-ঘাট, রেলপথ, বিদ্যুৎশক্তি, যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি ভৌত কাঠামোর বিপুল অগ্রগতি সাধিত হয়। যার উপর ভিত্তি করে শিল্পায়নের পথ সুগম হয়। শিল্পায়ন দ্রুততর করতে ষাটের দশকে পাকিস্তানে কয়েকটি সংস্থা সৃষ্টি করা হয় যার মধ্যে পাকিস্তান শিল্পঋণ ও বিনিয়োগ কর্পোরেশন ও পাকিস্তান শিল্প ব্যাংকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৬১-৬৭ সালের সময়ের মধ্যে পূর্বপাকিস্তানে বিনিয়োগের পরিমাণ ১৯.৯%। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে বিনিয়োগের পরিমাণ ৬৯.৭% কোটি টাকা। ১৯৫০-৭০– এই দুই দশকে প্রায় ৬৫০ কোটি ডলার বিদেশী ঋণ পেয়েছিল। এর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে খরচ করা হয় ১৯৪.২ কোটি ডলার ও পশ্চিম পাকিস্তানে ৪৫৫.৮ কোটি ডলার।"

পূর্ব বাংলায় উৎপাদিত পাটই ছিল পাকিস্তানের প্রধান রপ্তানিজাত অর্থকরী ফসল। পাকিস্তানের বার্ষিক আয় ৬০/৭০ ভাগই আয় হতো পূর্ব পাকিস্তান বা আজকের বাংলাদেশ হতে। বিনিময়ে পেত বৈষম্য বা অবহেলা।

এত বৈষম্য বঞ্চনার নাটক সংঘটিত হলেও খোদ পাকিস্তানেরই কিছু কর্তা ব্যক্তির কাছে তা ছিল অগ্রহণযোগ্য। চোখের সামনে এই ধরনের বৈষম্যমূলক নীতি দেখে সৎ ন্যায়পরায়ন যে কোনো ব্যক্তিই অবাক হয়ে যেত। এই ধরনের নেতিবাচক নীতি অবলম্বন করতে দেখে অনেক আন্তর্জাতিক নেতৃবৃন্দ হতবাক হয়েছেন। তেমনই একজন ব্যক্তিত্ব পাকিস্তানের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ মাহবুবুল হক তার 'ইকনমিক সার্ভে অব পাকিস্তান' গ্রন্থে স্বীকার করেছেন পূর্ব পাকিস্তানের কৃষিতে অবহেলা না করলে পূর্ব পাকিস্তান কৃষির প্রবৃদ্ধির হার পশ্চিম পাকিস্তানকে ছাড়িয়ে যেত। বাঙালিরা উন্নতির শিখরে পৌঁছে যেত এভাবে বাঙালিদের বঞ্চিত করে কৌশলে লুট-পাট করেছিল বলে আর বৈদেশিক সাহায্যই বেশি নিয়ে যেত পশ্চিম পাকিস্তানীরা।"

জন পাওয়ার হিসাব কষে দেখিয়েছেন ১৯৪৮ থেকে ৬১ সাল পর্যন্ত চৌদ্ধ বছরে ২৫০ কোটি টাকা পাকিস্তানে পাচার করেছে। ২৫০ কোটি টাকা পরিকল্পিতভাবে ব্যয় করলে তখন সাড়ে পাঁচ কোটি জনগণের জীবন মান অনেক উন্নত করা সম্ভব হতো। আজকের বাংলাদেশের যে সীমাহীন নিরক্ষরতা ও দারিদ্র্য তা অনেকাংশেই হ্রাস পেতো। অথচ অর্থাভাবে এদেশের আধুনিক কারিগরি প্রযুক্তি, শিক্ষা বিস্তারের জন্য পর্যাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়নি এবং গুরুত্বপূর্ণ কৃষিখাতকে অবহেলা করা হয়েছে।

একটি ব্যাপার ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে উৎপাদিত অর্থকরী ফসল ও শিল্পপণ্য তথা রাজস্ব খাতে অর্জিত অর্থ দিয়ে যদি পরিকল্পিতভাবে উন্নয়ন করা হতো, তাহলে আজকে আমাদের অর্থনৈতিকভাবে এ করুণ অবস্থার সৃষ্টি হতো না।

উল্লেখ্য যে, ১৯৪৭ সনে পাকিস্তান সৃষ্টির পর কলকাতায় অবস্থানরত পূর্ববঙ্গের ছাত্রনেতা এবং মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ ঢাকায় চলে আসেন। পাকিস্তান সরকারের বিভিন্ন বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিবাদ তথা পূর্বপাকিস্তানের জনগণের অর্থনৈতিক

উন্নয়নের জন্য তারা একটি রাজনৈতিক দল গঠনের অনুভব করেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তারা ১৯৪৯ সনের ২৩ জুন ঢাকার রোজ গার্ডেন-এ মিলিত হয়ে আওয়ামী মুসলিম লীগ নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠনের ঘোষণা দেন।

মাওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিমের অনুসারী মুসলিম লীগের তরুণ এম.এল.এ সহ বেশ কিছু তরুণ নেতৃবৃন্দের সমাহার ঘটেছে আওয়ামী-মুসলিম লীগে। তাদের রাজনৈতিক চরিত্র ছিল সরকারের বৈষম্যমূলক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা। একদল তরুণ নেতাকর্মী সংগঠনটিকে গতিশীল চরিত্র দিয়েছে। তারা জেল-জুলুমকে ভয় করে না। এরা পূর্ব বাংলার নিম্নমধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আসা, যাদের পূর্বপুরুষ কৃষক হিসাবে অতীতে ছিল জমিদারদের প্রজা। নির্যাতিত প্রজাদের সন্তানগণ এখনকার মুসলিম পুঁজিপতি মুৎসন্ধি, জোতদার, ব্যবসায়ী চরিত্রের সরকারের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিপক্ষের ভূমিকায় অবস্থান নিয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী একদল তরুণ সাহসী নেতৃবৃন্দকে বিভিন্ন জেলায় জেলায় ঘুরে সংগ্রহ করলেন। তেজোদ্দীপ্ত সেই সব তরুণ নেতৃত্বই আন্দোলনকে তীব্রতর করার জন্য প্রস্তুত হয়।

কামরুদ্দিন সাহেবের লিখিত 'পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি' খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বই। এ গ্রন্থের ১১৩ পৃষ্ঠায় তিনি বর্ণনা করেছেন–

> "নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েও আওয়ামী লীগ একটি প্রতিবাদকারী দলে পরিণত হলো। জাতির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের প্রতিনিধি স্থানীয় হবে যে দল তা স্বাভাবিকভাবেই পরস্পর বিরোধী মতাবলম্বীদের নিয়ে গঠিত হয় এবং সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী মনোভাবকে একই পথে পরিচালিত করে। তিক্ততা, ক্ষোভ আর বিরোধিতা প্রকাশের মুখপাত্র তাকে হতে হয়। আওয়ামীলীগের ঘাঁটি পূর্ব বাংলায় হওয়ার দরুন পশ্চিম পাকিস্তান ভিত্তিক মুসলিম লীগের তুলনায় ইহা বেশি আঞ্চলিক ভাবাপন্ন হলো। যে স্থলে মুসলিম লীগের সমর্থক হল শিল্পপতিরা, ভূস্বামীরা, ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকপালরা আর ক্ষমতাসীন সরকার যেখানে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক সমর্থনের উৎস হলো বাঙালি মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। যদিও আওয়ামীলীগের উদ্দেশ্য ছিল তার সংগ্রাম হবে প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্ব আর কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে, কিন্তু তা ক্রমেই পূর্ব বাংলা এবং পাকিস্তানের মধ্যে দ্বন্দ্বের আকার ধারন করলো।"

এদের নেতাই হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, যিনি শৈশব, কৈশোর পেরিয়ে এসেছেন কৃষি ও কৃষক অধ্যুষিত ফরিদপুরের গোপালগঞ্জ থেকে। তিনি নিজেও

এইসব উচ্চবিত্ত চরিত্রের মানুষ সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। তিনি সাথে নিয়েছিলেন একদল তরুণ– যারা শৈশব-কৈশোরে জমিদারদের অত্যাচার, নির্যাতন দেখেছেন। দেখেছেন গ্রাম-বংলার খেটে খাওয়া মানুষকে। অবহেলা, বৈষম্য, বঞ্চনা পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে নির্যাতিত পরিবার থেকে আসা তরুণদের আগমনে আওয়ামী-মুসলিম লীগের চরিত্রই পাল্টে যায়। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে জনগণের রায় দেখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের মনোভাবকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেন। তরুণ সমাজের সাথে আলোচনা করে ভবিষ্যৎ রাজনীতিকে সার্বজনীন করার জন্য দলকে অসাম্প্রদায়িক দলে পরিণত করার উদ্যোগে গঠনতন্ত্র পরিবর্তন করার চিন্তা করেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দলের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে সারা দেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন। মুসলিম লীগের জমিদার, জোতদার, নবাব, ধনাঢ্য ব্যবসায়ীদের অর্থনৈতিক বৈষম্য ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে গ্রামের মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের তরুণদেরকে দলে যোগদানের জন্য আকৃষ্ট করেছেন। তখন পূর্ব বাংলায় এই শ্রেণীটির সংখ্যাই ছিল বেশি। এরাই বেশি মুসলিম লীগ সরকার কর্তৃক বঞ্চনা ও অবহেলার শিকার হয়েছেন। তাদের দিয়ে দলকে সুদৃঢ় করবার লক্ষ্যে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করলেন। বঙ্গবন্ধু কৈশোর, যৌবনই বেড়ে উঠেছেন যেভাবে যে পরিবেশে তার অভিজ্ঞতাই কাজে লাগালেন জীবনের চূড়ান্ত সময়ে। তিনি আরও একটি ব্যাপার উপলব্ধি করলেন যে, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দই ক্ষমতার রাজনীতি করেন তারা বেশির ভাগই ক্ষেত্রেই নিজের এম.এল.এ অথবা মন্ত্রী হওয়ার জন্য সময় দিতেন। জনগণের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য তাদের কেউ চিন্তাও করতেন না। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম থেকেই উপলব্ধি করলেন সহজ কথার রাজনীতি দিয়ে বাঙালির অধিকার আদায় হবে না। এদের ভয় পেলে নিজেদের অধিকার আদায় হবে না। বাঙালিদের শক্ত পায়ে দাঁড়াতে হবে।

বিলাসিতা, ক্ষমতার লোভ, জেল-জুলুমের ভয়– এইসব চিন্তা করে এক শ্রেণীর নেতৃবৃন্দ দলবদল করলেন মন্ত্রী হবার জন্য। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কোনো দল বদল করলেন না। তিনি তরুণ বয়সে আওয়ামী মুসলিম লীগের সেক্রেটারির হাল ধরলেন এবং দলকে সুসংগঠিত করে গ্রাম পর্যন্ত ছড়িয়ে দিলেন। তিনি মন্ত্রী হওয়ার চাইতে সংগঠনের সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করাকে শ্রেয় মনে করতেন। তারপরেও যুক্তফ্রন্টে নির্বাচিত সংসদ সদস্য হিসাবেও গ্রাম বাংলার দরিদ্র মানুষের দারিদ্র্য দূরীকরণের কথা ভেবেছেন, সরকারি বৈষম্যমূলক সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেছেন।

প্রাদেশিক গভর্নরদের বেতন প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ১৯৫৫ সালের ২৪ ডিসেম্বর সংসদে দাঁড়িয়ে বললেন– "আমরা সারা বিশ্বে ঘোষণা করছি যে, আমাদের একটি

ইসলামী রাষ্ট্র এবং আমরা ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করবো। এটি এখন কোন ইসলামী আদর্শ যে, আপনি গভর্নরকে ৬,০০০ রুপী বেতন দিচ্ছেন। যেখানে দেশের গরীব মানুষেরা অনাহারে, ক্ষুধায় মৃত্যুবরণ করছে।"

তিনি প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রী হলেও দরিদ্র বঞ্চিত কৃষকের কথা ভোলেননি। তিনি বলেন, "এদেশের গরীব কৃষক পাটচাষী আর তুলাচাষীদের অর্থ এবং সাধারণ লোকের ট্যাক্সের পয়সা থেকেই আমরা গভর্নরকে মাসে ৬,০০০ রুপী বেতন দিচ্ছি।"

তিনি তাঁর বক্তৃতায় আরও বলেন, "আপনারা বেতন কম নিয়ে দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য কিছুটা হলেও আত্মত্যাগ করেন।"

দরিদ্র জনগণের সমস্যার কথা, কৃষকের সমস্যার কথা সুযোগ পেলেই তুলে ধরতেন তিনি। ১৯৫৬ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারির সংসদে বলেন, "আপনারা ইসলামের নামে রাজনীতি করেন। জনগণকে ধোঁকা দিয়ে অর্থ উপার্জন করবেন না। জনগণের সেবার কথা বলে জনপ্রতিনিধি হয়ে আসবেন তখন গরীব মেরে ধনী হতে পারবেন না। গরীবরা ট্যাক্স দেয়। এটা তাদের অর্থ। তাদের অর্থ ভোগ করার অধিকার আপনার নেই।"

তিনি ভূস্বামী, জমিদারদের শোষণের চিত্র তুলে ধরে বলেন– "জমিদাররা ভূমিহীন কৃষকদের দেওয়া অর্থ দিয়ে বিলাসী জীবন-যাপন করছেন। আর এই কৃষকরা উদয়াস্ত পরিশ্রম করে না খেয়ে মরছে।" তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, "আমরা পাকিস্তান এনেছি ধনীদের জন্য নয়। বরং দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য।"

তিনি ধনিক শ্রেণীর প্রতি আবেদন জানান– "দয়া করে দরিদ্রদের আর শোষণ করবেন না। তাদেরও কিছু ভাগ দেন। তাদের সাথে ভাইয়ের মতো আচরণ করেন। আর যদি নিপীড়ন চালান তাহলে সামনে এমন দিন আসবে যেদিন তারা আপনাদের বিরুদ্ধে জেগে উঠবে।"

গভর্নর জেনারেলের মাসে ৬,০০০ রুপী বেতন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আপনি গভর্নর জেনারেল। আপনি এত পারিশ্রমিক নেবেন না। কিছু অর্থ গরীবদের কাছে যাক, যারা ক্ষুধায়, অনাহারে মারা যাচ্ছে। আপনাদের মনে রাখা উচিৎ, এই গরীব লোকগুলিই পাকিস্তান সৃষ্টি করেছে। তারাই আত্মত্যাগ করেছে।"

বঙ্গবন্ধুর রাজনীতির মূল লক্ষ্যই ছিল দরিদ্র মানুষের কষ্টের কথা ভেবে তাদের দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

১৯৫৬ সনে পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়নের সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শ্রমিক কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার, সরকারি চাকরিতে

বাঙালিদের সমান অধিকার এবং জমিদারদের উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টনের নীতি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব দেন।

তিনি পাকিস্তানকে একটি সহজ সরল পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য আহ্বান জানান। তিনি ছাত্র অবস্থায় লক্ষ্য করেছেন যে, মুসলিম লীগ ১৯৪৬-এর নির্বাচনে পূর্ব বাংলায় বেশি আসন পেয়েছিল এদেশের অতি সাধারণ গ্রাম-বাংলার কৃষকদের ভোটে। সেদিন মুসলিম লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল। অথচ অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের ভৌগলিক সীমারেখার মধ্যে অবিভক্ত ভারতের যে অংশটুকু আজকের পাকিস্তান, সেখানে মুসলিম লীগ কোনো সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। পশ্চিম পাকিস্তানের ভূখণ্ডের মাটি থেকে মুসলিম লীগকে বর্জন করা হয়েছিল। শুধুমাত্র পূর্ববাংলার আসন দিয়ে মুসলিম লীগ জয়লাভ করে ব্রিটিশদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অকপটে সরকারের পুঁজিপতি, বিলাসী চরিত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে সংসদে ঝড় তুললেন। দরিদ্র মানুষের কল্যাণের জন্য সোচ্চার তিনি। সংসদের নির্বাচিত প্রতিনিধি হয়েও সংসদের ভেতরেও দরিদ্র শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। দরিদ্র বাঙালিদের দারিদ্র্য নিরসনের জন্য কর্মসূচি নেওয়ার জন্য সরকারের নিকট আবেদন জানান।

সমগ্র পাকিস্তানের জনসংখ্যার ৫৬% জনগণ বাস করে পূর্ব পাকিস্তানে। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের জীবন-মানের উন্নয়নের জন্য আর্থিক বরাদ্দ আনুপাতিক হারে বেশি রাখা উচিত ছিল, সেখানে কত বৈষম্যমূলক বরাদ্দ বাঙ্গালিদের দেওয়া হতো তা বর্ণনা করার মতো নয়। কত প্রতিহিংসামূলক চিন্তা-ভাবনা থাকলে পাকিস্তান সরকারের অবাঙালি কর্মকর্তাগণ এই ধরনের বৈষম্য করতেন! তারা তড়িঘড়ি করে পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ কিভাবে পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার করা যায় সে কৌশল নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। পশ্চিম পাকিস্তানের কোনো প্রদেশেই বিদেশে রপ্তানি করার মতো অর্থকরী ফসল উৎপন্ন হতো না।

ঐতিহাসিক অধ্যাপক ড. মহসিনের মতে, "বৃটিশ আমল থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের বেশিরভাগ অঞ্চল ছিল অর্থকরী ফসলহীন মরু এলাকা। তখন পাকিস্তানের উষর মরু পার্বত্য এলাকা প্রদেশগুলিতে ধান-পাট কিছুই হতো না।"

পূর্ব পাকিস্তানের মতো পশ্চিম পাকিস্তানের কোথায়ও অর্থকরী ফসল উৎপাদিত হতো না। জনগণও ছিল বিভিন্ন ভাষা ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত। একেক প্রদেশে একেক ভাষা ছিল। জনগণের শিক্ষার হার ছিল কম। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা বা কারিগরি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা ছিল না বললেই চলে। তাদের জীবিকা উপার্জনে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের নবাব, জমিদারদের সৈন্য বাহিনী, দেহরক্ষী,

দারওয়ান, লাঠিয়াল, পাইক-পেয়াদার কাজ করতো। যারা একটু লেখাপড়া জানতেন তারা ব্রিটিশ সেনাবাহিনী ও পুলিশ বাহিনীতে কাজ করতেন। কিছু সংখ্যক লোক ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন।

মূর্খ, বর্বর, গোঁয়ার প্রকৃতির লোকগুলির ছিল না কোনো রাজনৈতিক সচেতনতা। তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি তেমন উন্নত ছিল না। পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে নিজস্ব স্বজাতি বোধ, সংস্কৃতির প্রতি সচেতনতা থাকলে উত্তর ভারতের রাজনীতিকদের উর্দু ভাষাকে নিজেদের ভাষা হিসেবে গ্রহণ করতেন না। উর্দু পাকিস্তানের বিশেষ কোনো ভৌগলিক এলাকার ভাষা ছিল না। ছিল না কোনো জাতির ভাষা। তবুও আলীগড় কলেজকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু উর্দুভাষী উত্তর ভারতের মুসলমান আমলা, সৈনিক, রাজনীতিবিদ, আইনজীবীর সৃষ্টি হয়েছিল। ১৯৪৭ সালে দল বেঁধে মোহাজের হয়ে করাচি শহরে হাজির হয়ে সংখ্যা বৃদ্ধি করতে থাকে। পরবর্তীতে তারাই তাদের ভাষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি দ্বারা সারা পশ্চিম পাকিস্তানকে প্রভাবিত করে। ধীরে ধীরে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ক্ষমতা চলে যায় পাকিস্তানের এলিট শ্রেণীর হাতে। তারা নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী জীবন ব্যবস্থার প্রয়োজনে সব কিছু গ্রহণ করতে থাকে।

দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পর শুধু বাঙালিদেরই নয় পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের স্থানীয় নেতৃবৃন্দও উপলব্ধি করতে শুরু করেন যে, পাকিস্তান আসলে যতটুকু না ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র, তার চেয়ে বেশি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত এবং উর্দুভাষি ব্যবসায়ী রাজনীতিবিদ এবং আমলাদের মনগড়া নয়া সাম্রাজ্য।

উপর্যুক্ত অবস্থার যথার্থ তথ্য পাওয়া যায় ১৯৭১ সালে গাফফার চৌধুরী লিখিত 'দ্বিজাতি তত্ত্বের অপঘাত মৃত্যু' প্রবন্ধে–

> "পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অতি অল্প দিনের মধ্যেই বিভ্রম ও কুয়াশা কাটতে শুরু করে। পাকিস্তান শাসিত বাঙালি, সিন্ধু, পাঠান ও বালুচ জাতীয় নেতারা বুঝতে পারেন আসলে এটা ধর্ম রাজ্য না, বহিরাগত মুসলমানদের শোষণ ও শাসনের নয়া সাম্রাজ্য। এই বহিরাগত মুসলমানদের কেউ এসেছেন ইরান ও তুরস্ক থেকে, কেউ বা আফ্রিকার কোন দেশে থেকে। বেশিরভাগ উত্তর ও মধ্য ভারত থেকে। এই বহিরাগত মুসলমান ব্যবসায়ীদের সাথে পশ্চিম পাঞ্জাবের সমস্ত স্বার্থ আমলাচক্র ও বৃটিশ আমলে তৈরী সামরিক চক্রের যোগসাজশে পাকিস্তান প্রকৃত শাসক শ্রেণী তৈরী হলো।"

পাকিস্তানের কথিত আমলাতন্ত্রের ষড়যন্ত্রও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উপলব্ধি

করতে পেরেছিলেন। পাকিস্তানের ধর্মভিত্তিক মুসলিম লীগের রাজনীতিবিদ ও আমলাদের সমন্বয়ে শুধুমাত্র পশ্চিম পাকিস্তানকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করার গোপন ছক আঁকা হয়। সরকারি ও বেসরকারিভাবে এইসব নেতৃবৃন্দ অবৈধ আর্থিক সুযোগ-সুবিধা নিতে থাকে। পাকিস্তানের ক্ষুদ্র পুঁজিপতিদের সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে শিল্পায়ন করার জন্য সুযোগ দেওয়া হয়। অন্যদিকে ক্ষমতাসীন সরকারের দায়িত্বে আসীন ব্যক্তিরাও আর্থিক সুবিধা লাভের চেষ্টা করে। অথচ পাকিস্তানের জনগণের শতকরা ৫৬ জন পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসী হলেও তাদের আর্থ সামাজিক উন্নতিকল্পে বড় ধরনের কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হতো না। পাকিস্তান সরকারের এই বৈষম্যমূলক কর্মকাণ্ড উপলব্ধি করে শেখ মুজিবুর রহমান প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রী থাকা অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তানের দরিদ্র কৃষকদের দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার চিন্তা করেন। তাই ১৯৫৬ সালের ২১ জানুয়ারিতে সংসদ অধিবেশনে পূর্ব পাকিস্তানের দরিদ্র ভূমিহীন কৃষকের জন্য জমিদারদের অতিরিক্ত জমি বণ্টন করে দেওয়ার সুপারিশ করেন। তিনি পাকিস্তানের ইসলামী প্রজাতন্ত্রের সংবিধান প্রণেতাদের চ্যালেঞ্জ করে বললেন, "ইসলামের কোন আইনে আছে যে একজন মুসলমান ১০/১৫ হাজার একর জমির মালিক হবে? তার পাশাপাশি আরেক মুসলমান না খেয়ে ঢাকা বা করাচির রাস্তায় মরে পড়ে থাকবে?" তিনি বাংলার জনগণের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা এবং চাকুরির নিশ্চয়তা বিধানের জন্য জোর দাবি জানান।

এরকম একটি ধারণায় ইসলাম ধর্মকে ব্যবহার করে পাকিস্তান সরকারের সমর্থিত পুঁজিপতিদের ধন-সম্পদ কুক্ষিগত করার বিরুদ্ধে শেখ মুজিবুর রহমান ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬ সালে সংসদ অধিবেশনে বলেন–

> "পূর্ব বাংলার ৩০ বছর আগে এক আন্দোলন হয়। এটা ছিল কৃষক আন্দোলন। আমার নেতা মাওলানা ভাসানী সেই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ১৯৩৩ সালে বেঙ্গল আসাম সম্মেলন হয়। তখন জমিদার ছিল ৯০% হিন্দু। মালিক ফিরোজ খাঁন ঠিকই দিয়েছেন এ তথ্য। তবে হিন্দু হোক আর মুসলিম হোক– গরীব মানুষের শোষক ও শাসক হিসাবে তাদের পরিচয় একই। এজন্যেই আমরা পূর্ব বাংলার জমিদার ও জায়গিরদারদের বিরুদ্ধে। হিন্দু জমিদারগণ কলকাতা, রাজশাহী, মধুপুরে ফূর্তি করছিলেন। এবং মুসলমান জমিদাররা দার্জিলিং ও শিলংয়ে একই কাজ করছিলেন। উভয়ে গরীবদের শোষণ করছিলেন। আমরা তাই এদের ক্ষতিপূরণ দিতে চাই না দেশের গরীব কৃষকদের মাঝে জমি আমরা বণ্টন করার পক্ষে।"

একই দিনে ক্ষতিপূরণের প্রশ্নে ইসলামী অনুশাসনের প্রসঙ্গে তার মতামত ব্যক্ত করে তিনি বলেন–

> "স্যার, তারা ইসলামের কথা বলেন। কোথায় মাওলানা আতাহার আলী– আমি তাকে প্রশ্ন করতে চাই, যে ব্যবস্থায় একজনের মালিকানায় থাকবে ৫০ হাজার একর জমি এবং তিনি তা ভোগ করে আরামে ঘুমাবেন। অন্যদিকে তারই বাড়ীর পাশে একজন ক্ষুধার জ্বালা সইতে না পেরে মারা যাবে তাকে কি ইসলামী গণতন্ত্র বলে? এটাই কি ইসলাম? দয়া করে ইসলামের অমর্যাদা করবেন না।"

সব সময়ই ধর্মের নামে ভণ্ড প্রতারকদের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন তিনি। ক্ষুধার্ত দরিদ্র মানুষের ক্ষুধা নিবারণের জন্য চিন্তাতেই মগ্ন থাকতেন সর্বদাই। ক্ষুধার্ত মানুষের দাবি আদায়ের জন্য ১৯৫৬ সালে ৪ আগস্ট, মাওলানা ভাসানী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ভূখা মিছিল করেন। এই বিশাল মিছিলটি চক বাজার এলাকা প্রদক্ষিণকালে পুলিশ গুলি চালালে তিনজন শহীদ হয়। এভাবেই প্রকাশ পায় পাকিস্তান সরকারের স্বৈরাচারী রূপ। দরিদ্র ও ক্ষুধার্ত মানুষের অন্ন সংস্থানের লক্ষ্যে দাবি জানাতে গিয়ে এভাবেই প্রাণ হারাতে হয়। পূর্ব পাকিস্তানের পত্র-পত্রিকায় এ সংবাদ ক্ষোভের সহিত পরিবেশিত হলে পাকিস্তানের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকারের পতন হয়।

যুক্তফ্রন্টের নেতৃবৃন্দদের মধ্যে রাজনৈতিক মতপার্থক্য এবং কতিপয় ক্ষমতালিপ্সু নেতৃবৃন্দের কারণে সরকারের জোট ভেঙে যায়। সেই সুযোগে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে মুসলিম লীগের যাদের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছিল সেই সমস্ত নেতৃবৃন্দের প্রতিহিংসামূলক ষড়যন্ত্রে সরকার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ঘটনার অবতারণা করতে লাগলেন।

এককালের সুখী মানুষগুলো, অবস্থাপন্ন গৃহস্থ সমাজ ও জমিদারদের আঁচড়ে দরিদ্র, নিঃস্ব, ভূমিহীন হতে থাকে। পূর্ব বাংলার ভৌগলিক আয়তনের এই ভূখণ্ডটির জনগণের মধ্যে মুসলমানই বেশি ছিল। এই দরিদ্র মুসলমান কৃষকরাই ধীরে ধীরে নিঃশেষ হতে থাকে।

বারবার এই দুঃখজনক ঘটনাটির অবতারণা করেছেন লেখক, গবেষকগণ। ভেলামভ্যান সোন্ডল 'আ হিস্টরি অব বাংলাদেশ' আলোচনায় লেখেন–

> "১৯৫০-এর দশকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উঠিয়ে দেওয়া হলেও ভাগ চাষীদের কোন ভূমির অধিকার দেওয়া হয়নি। ফলে ১৯৬০ সাল নাগাদ ২০ শতাংশ ভূমিহীন দিনমজুরে পরিণত হয়। বিদেশী সাহায্য চালিত আধুনিকায়ন

> পরিস্থিতির কোন উন্নতি ঘটায়নি বরং বিদেশি সাহায্য সিক্ত অভিজাত গোষ্ঠীর বিকাশ ঘটেছে আর দেশীয় সম্পদের গতিহীনতার ভূমিকা রেখেছে।"

কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনায় যারা ছিলেন, তাদের পরিকল্পনায় পূর্ব বাংলার কৃষকের জীবন-মান উন্নয়নের ব্যবস্থা ছিল গৌণ। বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন মানসিকতার কেন্দ্রবিন্দু ছিল পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের দরবার। কতিপয় অবাঙালি রাজনীতিবিদের প্রাধান্য থাকলেও এরা সর্বদাই আমলা ও সেনা কর্মকর্তাদের সিদ্ধান্তকেই প্রাধান্য দিতেন।

দেশ বিভাগের সময় পাকিস্তানের অর্থনীতি ছিল অত্যন্ত দুর্বল। তবুও যে পাকিস্তানে অর্থনীতি ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে যাওয়ার শক্তি অর্জন করছিল, তার কারণ নিহিত ছিল কোরিয়ার যুদ্ধ। কোরিয়ার যুদ্ধের ফলে বিশ্বের বাজারে পূর্ব বঙ্গের পাটের চাহিদা বেড়ে যায়। কিন্তু এতে পূর্ব বঙ্গের গরীব পাটচাষীদের কোনো উপকার হয়নি। ব্যবসায়ীরাও লভ্যাংশের অতি সামান্যই পেত। পাট বিক্রি করে যে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জিত হতো তার প্রায় সম্পূর্ণটাই আত্মসাৎ করে পশ্চিম পাকিস্তানের বণিকশ্রেণি।

পাকিস্তানের ব্যবসায়-বাণিজ্য সব সময় ছিল সরকার নিয়ন্ত্রিত। পাকিস্তানে এমন এক অদ্ভুত অবস্থা বিবর্তিত হয়েছিল। আমলাদের দ্বারা যে ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত পুঁজিকে একচেটিয়া নিয়ন্ত্রিত বাজারের মাধ্যমে প্রচুর সুবিধা দেওয়া হয়েছিল সে সব শিল্পকে সরকারি অর্থে গড়ে তুলে পরে ব্যক্তিগত পুঁজির কাছে হস্তান্তর করা হতো। এই সব সুযোগ-সুবিধা বন্টনের ভার ন্যস্ত ছিল আমলাদের উপর। তাই আমলাতন্ত্র ও পুঁজিপতি শ্রেণীর মধ্যে একে অপরকে রক্ষায় মৈত্রীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

এভাবে পূর্ববঙ্গের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে সঞ্চিত হয় এবং তা বিনিয়োগ করেই পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পোন্নয়নের সূচনা হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের এই শিল্পোন্নয়নের ফলে সেখানকার বিভিন্ন অঞ্চলের জনসাধারণের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে উপকার হয়েছিল। অধিকন্তু পূর্ববঙ্গকে পশ্চিম পাকিস্তানের উৎপাদিত দ্রব্যের একচেটিয়া বাজারে পরিণত করা হয়। পূর্ববঙ্গের গরীব মানুষ বাধ্য হয়ে বিশ্বের খোলা বাজারে যে জিনিসের দাম এক টাকা তা দুই টাকা, তিন টাকায় এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাঁচ টাকায় কিনতো। এভাবে পূর্ববঙ্গকে পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশে পরিণত করা হয়। বাঙালিদের অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত করে অবাঙালি শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, আমলাদের সুযোগ-সুবিধা দীর্ঘতর করার লক্ষ্যে সেনাবাহিনীর চক্রান্ত শুরু হয়।

ড. অনুপম সেনের 'বাংলাদেশঃ রাষ্ট্র ও সমাজঃ সামাজিক অর্থনীতি' নামক গ্রন্থের ৬৪ পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়–

> "দীর্ঘ দু'দশক ধরে এভাবে পূর্বপাকিস্তানকে শোষণ করে পশ্চিম পাকিস্তানে এক ধরনের পরনির্ভরশীল স্থুল শিল্পায়ন সম্ভব হয়েছিল এবং এর জন্য পূর্ব পাকিস্তান থেকে এই দুই দশক ধরেই বিপুল পরিমাণ সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে স্থানান্তর করা হয়। পশ্চিম পাকিস্তানী অর্থনীতিবিদ পূর্বোল্লিখিত মাহবুবুল হকের হিসাব অনুযায়ী ১৯৫৭/৫৮ অর্থ বছর পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রতিবছর গড়ে ২০ কোটি টাকার সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে স্থানান্তরিত হয়েছে। জন পাওয়ারের হিসাব অনুযায়ী ১৯৪৮ থেকে ১৯৬১-এই চৌদ্ধ বছরে স্থানান্তরিত সম্পদের পরিমাণ ২৫০ কোটি। এই সম্পদ মূলতঃ আহরণ করা হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানের কৃষি থেকে। এই বিপুল সম্পদের কিছুটা প্রবৃদ্ধির জন্য নিয়োগ করা সম্ভব হতো। তাহলে ষাটের দশকের প্রথমেই হয়তো পূর্ব পাকিস্তানবাসীর জীবন-মান অনেকখানি উন্নত করা সম্ভব হতো। অন্তত আজকের বাংলাদেশের প্রায় আশি শতাংশ লোকের যে অবর্ণনীয় সীমাহীন দারিদ্র্য তা হয়তো বেশ কিছুটা এড়ানো যেত।"

পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাবী শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের শিল্পায়নে একচেটিয়া প্রাধান্য বিস্তার ও ব্যবসা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পাঞ্জাবের সেনা কর্মকর্তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পাকিস্তানের সেনা কর্মকর্তা আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করেন। তিনি ক্ষমতা গ্রহণের পর পরই পাকিস্তানের রাজনীতির দৃশ্যপট পাল্টাতে শুরু করে। এ সময় পূর্ব পাকিস্তানের গণতন্ত্রকামী রাজনীতিকদের গ্রেফতার করা শুরু হয়। ১২ অক্টোবর শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এক রকম বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৫৯ সালের ৫ অক্টোবর শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তি লাভ করেন। মুক্তি পেয়ে তিনি লক্ষ্য করলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অবাঙালি ব্যবসায়ীরা দলে দলে পূর্ব পাকিস্তানে এসে ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে শুরু করেছে। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় এসব ব্যবসায়ীরা পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে শিল্পকারখানা স্থাপন করা শুরু করে। কয়েক বছরের মধ্যেই পূর্ব পাকিস্তানের ব্যবসা এবং অর্থনীতির বেশির ভাগ অবাঙালি ব্যবসায়ীদের হাতে চলে যায়। এসব অবাঙালিদের সহযোগী ব্যবসায়ী হিসাবে পূর্ব পাকিস্তানের বেশ কিছু বাঙালি ব্যবসায়ীকে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় ব্যবসা করার সুযোগ দেওয়া হয়। স্থানীয় বাঙালি পুঁজিপতিরা ব্যবাসায়িক সুবিধা লাভ করে আইয়ুব খানের ক্ষমতাকে পাকা-পোক্ত করার লক্ষ্যে রাজনৈতিক

প্রচারণার অর্থ দান করতেন। বিশেষ করে তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের ২২ পরিবার বলে খ্যাত আইয়ুবী শাসনের অন্ধ ভক্ত একটি শিল্প পরিবার গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। কতিপয় এই শিল্প পরিবারের আনুকুল্য ছাড়া কারও পক্ষে ব্যবসা-বাণিজ্য স্থাপন করা সম্ভব হতো না।

ষাটের দশকের আইয়ুবী আমলের এ অবস্থার বর্ণনা পাওয়া যায় এস.এস. বারানভ রচিত 'পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য' নামক গ্রন্থের ৯৬ পৃষ্ঠায়–

> "পাকিস্তান পরিকল্পনা কমিশনের প্রাক্তন প্রধান অর্থনীতিবিদ মাহবুবুল হক যথার্থই বলেছেন, পাকিস্তানের শুধু ২২ পরিবারের অনুমতি বা পৃষ্ঠপোষকতায় বৃহৎ ব্যবসায়ের সংস্পর্শে আসা সম্ভব ছিল। কোন কোন উৎস মতে, পূর্ব বাংলায় অবাঙালি বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিরা সব ব্যাংক ডিপোজিটের ৭৫ ভাগ দেয় ঋণের ৬৫ ভাগ ও ব্যাংক জমাকৃত বৈদেশিক মুদ্রার ৭৫ ভাগের বেশির উপর নিজেদের সরাসরি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল।"

আইয়ুব খানের শাসনামলেই পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনীতিতে দ্রুত উন্নতি লাভ করতে থাকে। পশ্চিম পাকিস্তানে বিদেশি বিনিয়োগের লক্ষ্যে বাজেটের বৃহৎ অংশই ব্যবহৃত হতো। বিশেষ করে যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং বিদ্যুতায়নের ক্ষেত্রে প্রভুত উন্নতি সাধিত হয়।

এস. এস. বারানভের উক্ত গ্রন্থের ১২২ পৃষ্ঠায় এ অবস্থার বর্ণনা দেন এভাবে–

> "বিশেষজ্ঞদের মতে, ষাটের দশকের শেষ দিকে যোগাযোগ ব্যবস্থার দিক থেকেও পশ্চিম পাকিস্তান এগিয়ে ছিল। রেল পথে পশ্চিম পাকিস্তানে পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় প্রতি বছর ২ গুণ বেশি যাত্রী ও ৩ গুণ বেশি মালামাল পরিবহন করা হতো। জনপথের দিক থেকেও পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পিছিয়ে ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের হাইওয়ের দৈর্ঘ্য ছিল ২,৩৮৮ মাইল আর পশ্চিম পাকিস্তানের ছিল ১০,৬০৯ মাইল।"

মিলিটারি শাসনের পৃষ্ঠপোষকতায় কয়েক বছরের মধ্যেই পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থা স্ফীত হয়ে ওঠে, অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থা নিম্নমুখী হতে থাকে। কতিপয় বাঙালি শিল্পপতি থাকলেও এরা পাকিস্তানের আইয়ুব খানের শাসনকে পাকাপোক্ত করার জন্যই অর্থ দান করতেন। এদেশের সাধারণ দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা সামগ্রিক বাঙালি জাতির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য তাদের চিন্তা-ভাবনা বা পরিকল্পনা থাকতো না। বরং এ প্রসঙ্গ উঠলেই তা ভারতের চক্রান্ত বলে আখ্যায়িত করে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেন।

১৯৬৫ সালে পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধে এদেশের মানুষ লক্ষ্য করলো আইয়ুব সরকার পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের জানমাল রক্ষার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি সৈনিকদের স্থানান্তরিত করে পশ্চিম পাকিস্তানের ভারত সীমান্তে নিয়োগ করলেন। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জান-মাল রক্ষার জন্য বড় ধরনের কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন না। ধর্মীয় রাজনীতির আড়ালে এভাবে বৈষম্যমূলক আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে আওয়ামী লিগ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গ্রহণযোগ্য কিছু দাবি ও কর্মসূচি প্রণয়নের কাজ শুরু করেন। ১৭ দিন ব্যাপী পাক-ভারত যুদ্ধে অনেক বাঙালি সৈন্য শহীদ হলেও তাদের সম্মানি বা আর্থিক সুবিধার ক্ষেত্রে যথাযোগ্য সম্মান দেওয়া হয়নি। যুদ্ধ বন্ধে রাশিয়ার তাসখন্দে উভয় সরকারের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তি নিয়ে পাকিস্তানের উভয় অংশে বিতর্কের সূচনা হয়।

১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে লাহোরে তাসখন্দ চুক্তিবিরোধী এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক আলোচনায় প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনকে এজেন্ডাভুক্ত করার দাবি তোলেন। কিন্তু তার দাবি সেখানে অগ্রাহ্য হলো। সম্মেলনে যাওয়ার আগেই আওয়ামিলীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে ৬ দফা দাবি কর্মসূচি সাথে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি সম্মেলন বর্জন করে ৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে একটি সংবাদ সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তানের দাবি হিসাবে ৬ দফা কার্যক্রম নিজে বাঁচাও অপরকে বাঁচতে দাও-এর ঘোষণা দেন। প্রস্তাবিত ৬ দফা ছিল বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ। প্রত্যক্ষ নির্বাচনে ফেডারেল সংসদীয় সরকার– শুধু প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয়ে ফেডারেল সরকারের দায়িত্ব। দুটি এলাকার জন্য স্বতন্ত্র মুদ্রা ব্যবস্থা অঙ্গরাজ্যের যথোপযুক্ত দেশ রক্ষা, ক্ষমতা ও সেনা বাহিনী বা আধাসামরিক বাহিনীর গঠনের ক্ষমতাই ছিল ৬ দফার মূল দাবি। ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক শোষণের ফলে তখনকার পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। একদিকে ব্যবসা-বাণিজ্যে অবাঙালিদের প্রাধান্য অন্যদিকে সরকারি চাকুরির ক্ষেত্রেও বৈষম্যমূলক আচরণের ফলে বেকারত্বের সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকে। সারা পূর্ব পাকিস্তানেই অবাঙালি ব্যবসায়ীরা এমনভাবে জেঁকে বসেছিল যে, প্রতিটি জেলা শহরেই তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা সুদৃঢ় ছিল। মোদ্দা কথা পূর্ব পাকিস্তানের সার্বিক অর্থনীতিই ছিল অবাঙালি ব্যবসায়ী এবং কতিপয় ২২ পরিবার বলে খ্যাত বাঙালি ব্যবসায়ীদের হাতে।

এস.এস. বারানভের গ্রন্থের ৭৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে নিম্নোক্ত অবস্থার কথা–

> ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বাংলাদেশে ২৬ হাজার অবাঙালি শিল্পপতি ব্যবসায়ী ও তাদের পরিবারবর্গ বাস করতো অথবা সাময়িকভাবে অবস্থান করছিল। তারা প্রদেশের বিভিন্ন শহরে ছয় হাজারেরও বেশি বাড়িতে বাস করতো। ষাটের দশকের শেষের দিকে পূর্ব বাংলার অর্থনীতিতে অবাঙালি বুর্জোয়াদের উপস্থিতির ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়।"

আইয়ুব খানের তথাকথিত মৌলিক গণতন্ত্রের শাসনের আড়ালে শুধুমাত্র শিল্প-কারখানা প্রসারের ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্বই করেননি, অবহেলা করা হয়েছিল পূর্ব বাংলার কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নেও। পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য গোপনে কৃষি উন্নয়নের কৌশলী পদক্ষেপ নিলেও পূর্ব পাকিস্তানের বেলায় ছল-চাতুরীর আশ্রয় নেওয়া হতো। সংবাদ মাধ্যমে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে কর্মসূচি প্রণয়ন করলেও কোনো এক অদৃশ্য হস্তের ইঙ্গিতে তা আবার স্থগিত হয়ে যেত। এরকম ছল-চাতুরির তথ্য পাওয়া যায় মো. সাদেক ও আ. রহমান রচিত বাংলাদেশের সমষ্টিক উন্নয়ন ও পল্লী পুনর্গঠন গ্রন্থের ৭৭ পৃষ্ঠায়–

> "পল্লী কৃষি ও শিল্প উন্নয়ন কর্মসূচির আয়ু প্রায় নয় বছর ছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথমার্ধে অর্থাৎ ১৯৬১ সালের দিকে এত করে যে কর্মসূচি শুরু করা হয়েছিল যথার্থরূপে পরীক্ষিত হবার পূর্বেই তা তুলে দেওয়া হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এসব ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল যে, এ কর্মসূচি আমাদের চির অবহেলিত কৃষককুলকে দারিদ্র্য ও দুর্গতির হাত থেকে রক্ষা করবে। কিন্তু ৯ বছর অতিক্রান্ত না হতেই এর অপমৃত্যু ঘটে। চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী ভি-এইড কর্মসূচি তুলে দেওয়ার আগে ১৯৫৯ সালে খাদ্য ও কৃষি কশিন গঠন করা হয়। এই কমিশন ১৯৬০ সালের জানুয়ারী মাসে যুক্তরাষ্ট্রের কারিগরি মিশন ভি-এইড কর্মসূচি দিয়ে সমস্ত সাহায্য বন্ধ করে দেয়। তারও আগে ১৯৬১ সালে এই মিশন পল্লী কৃষি ও শিল্প উন্নয়ন কর্মসূচিকে প্রদত্ত দ্রব্য সাহায্য না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তারা এর কারণ হিসাবে যে ভি-এইড এর পরীক্ষামূলক পর্যায়ে শেষ হয়ে গেছে। অবিভক্ত বাংলার পল্লী পূনর্গঠনের বিভাগের মতো সাবেক পাকিস্তনের পল্লী, কৃষি ও শিল্প উন্নয়ন কর্মসূচিকেও গ্রাম পর্যায়ের কল্যাণে নিয়োজিত একটা পৃথক সংস্থা হিসাবে টিকে থাকতে পারলো না। কিন্তু কি কারণে এটা তুলে দেওয়া হলো দেশবাসীর পক্ষে তা জানা সম্ভব হলো না। তৎকালীন সরকার তার প্রয়োজনও উপলব্ধি করতে পারেনি। তবে ভি-এইড কর্মসূচি প্রনয়নের সময়েও এর ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা যাবে।"

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফার দাবি প্রকৃতপক্ষে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ হিসাবে গ্রহণযোগ্য হয়েছিল ছাত্র জনতার কাছে। অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত বাঙালিকে শক্ত পায়ে উঠে দাঁড়ানোর লক্ষ্যেই সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিখুঁতভাবেই এই ছয়টি দাবি প্রণয়ন করা হয়। ছয় দফাকে অস্ত্রের ভাষায় জবাব দেওয়া হবে বলে আইয়ুব খান হুঁশিয়ার করে দেন। এদিকে ছয় দফার সমর্থনে সারা বাংলার ছাত্র-জনতা আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। ছয় দফার চুল-চেরা বিশ্লেষণ করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সারা বাংলার মানুষকে বোঝাতে সক্ষম হন যে ছয় দফাই প্রকৃতপক্ষে বাঙালির অর্থনৈতিক মুক্তির সনদ। বাঙালিদের দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক দীনতা বিমোচনের লক্ষ্যে প্রকৃতপক্ষেই তিনি ছয় দফা কর্মসূচি প্রণয়ন করেছিলেন। ছয় দফার পাঁচ নং দফাতেই নিহিত ছিল বঞ্চিত বাঙালিদের ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নৈতিক প্রাপ্তির কথা। অর্থনৈতিকভাবে বৈষম্যের শিকার পূর্ব বাংলার মানুষের ন্যায্য অর্থনৈতিক প্রাপ্তি এবং পূর্ব বাংলার মানুষের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচনের মন্ত্রই ছিল এই দফায় নিহিত। দফাটি সংক্ষেপে সংযোজিত হলো–

১. দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক হিসাব রাখিতে হইবে।
২. পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের এখতিয়ার এবং
৩. পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের এখতিয়ারে থাকিবে।
৪. ফেডারেশনের প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা দুই অঞ্চল হইতে সমান ভাবে অথবা শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত হারাহারি মতে আদায় হইবে।
৫. দেশজাত দ্রব্যাদি বিনা শুল্কে উভয় অঞ্চলের মধ্যে আমদানী-রফতানী চলিবে।
৬. ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে বিদেশের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং আমদানী-রফতানী করিবার অধিকার আঞ্চলিক সরকারের হাতে ন্যাস্ত করিয়া শাসনতান্ত্রিক বিধান করিতে হইবে।

তিনি স্বজাতির অর্থনীতির সমৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য বিমোচনের উপরই অধিক গুরুত্ব দিতেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে পাঁচ নং দফায় এমন শর্ত আরোপ করেন, যা অর্জিত হলে এদেশের মানুষ কৃষি উন্নয়ন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও কর্মসংস্থানের মাধ্যমে ধীরে ধীরে দারিদ্র্য মুক্ত হয়ে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হবে।

পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুর এই ছয় দফার আন্দোলনকে স্তব্ধ করার লক্ষ্যে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' নামে তথাকথিত একটি রাষ্ট্রদ্রোহী মামলায় তাঁকে

গ্রেফতার করে ফাঁসি দেওয়ার চক্রান্ত শুরু করে। সারা পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র-জনতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মুক্তির লক্ষ্যে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। আন্দোলনের উত্তাপে ১৯৬৯ সালে আইয়ুব খান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে মুক্তি দিয়ে পদত্যাগ করেন। আইয়ুব খানের পদত্যাগের পর জেনারেল ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা গ্রহণ করে আবার সামরিক শাসন জারি করেন। ইয়াহিয়া খান শর্ত সাপেক্ষে নির্বাচনের ঘোষণা দেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্তি লাভ করে সারা দেশ সফর করেন। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল ঘুরে দরিদ্র মানুষের ক্ষত-বিক্ষত অর্থনৈতিক অবস্থা প্রত্যক্ষ করেন। সর্বস্তরের মানুষের সাথে কথা বলে দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি কিভাবে আনয়ন করা যায় তার একটি কর্মসূচি প্রস্তুত করেন।

২৮ অক্টোবর ১৯৭০-এ বঙ্গবন্ধু তাঁর বেতার ভাষণে বলেন–

"ভূমি রাজস্বের চাপে নিষ্পিষ্ট কৃষককুলের ঋণভার লাঘবের জন্য অবিলম্বে আমরা ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা বিলোপ এবং বকেয়া খাজনা মওকুফের প্রস্তাব করেছি। আমরা বর্তমানে ভূমি রাজস্ব প্রথা তুলে দেবার কথা ভাবছি। প্রাকৃতিক সম্পদ সর্বাধিক উন্নয়নের জন্য বৈজ্ঞানিক তৎপরতা চালাতে হবে। প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের গোটা কৃষি ব্যবস্থাতে বিপ্লবের সূচনা অত্যাবশ্যক। পশ্চিম পাকিস্তানে জমিদারি, জায়গীরদারগীরি, সরদারি প্রথার অবশ্যই বিলুপ্তি সাধন করিতে হইবে। প্রকৃত কৃষকের স্বার্থে গোটা ভূমি-ব্যবস্থার পূণর্বিন্যাস সাধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। ভূমি দখলের সর্বোচ্চ সীমা অবশ্যই নির্ধারণ করে দিতে হবে। নির্ধারিত সীমার বাইরে জমি এবং সরকারী খাস জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে হবে। কৃষি ব্যবস্থাকে অবশ্যই আধুনিকীকরণ করতে হবে। অবিলম্বে চাষিদের বুহুমূখী সমবায়ের মাধ্যমে ভূমি সংহতি সাধনে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। সরকার এজন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। অতীত বর্তমান– বহু অর্থনীতিবিদ সমালোচনা, আলোচনা করেন। একটি উপলব্ধি সুক্ষ্মভাবে সবাই করেন। একটি উপলব্ধি সুক্ষ্মভাবে সবাই করেন হবে– ষাটের দশকের গ্রাম-বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা বহুলাংশেই কৃষি ভিত্তিক, বিশেষ করে পাট মিল ছিল, কৃষকের জীবন-জীবিকার অন্যতম উৎস মুদ্রাভিত্তিক নগদ উপার্জন।"

তখন গ্রামে-গঞ্জের বাঙালিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রভেদ অবাক করার মতো উঁচু-নিচু ছিল। সমাজের এই অর্থনৈতিক প্রভেদের কথা একাধিক বার উল্লেখ হয়েছে। তবে এটা ষাটের দশকে এসে বেশি জোরালো হয়েছে। কারণ, গ্রামের জোতদার, ধনাঢ্য পরিবারগুলো শত শত বিঘা জমির মালিক। তারা এসব জমি

রেখে লেখাপড়া করে আধুনিক জীবন-যাপন করার লক্ষ্যে শহরে বাস করতেন। বছরে একবার হয়তো ঈদ উৎসবে বাড়িতে যেতেন। তাদের মতো ভূস্বামীদের জমি কিছু বর্গাদারের কাছে বর্গা দেওয়া হতো আর বেশির ভাগ জমি পতিত থাকতো। হয়তো বাড়িটাকে বাগানবাড়ির মতো করে ভাবতো। বছরে একবার পরিবার-পরিজন নিয়ে বনভোজন করতে আসতো। ছোট বড় জোতদারদের মধ্যে বেশির ভাগ এ অবস্থা চলে আসছিল। এরা নিজেরা জমি চাষাবাদ করবে না অন্যদিকে পছন্দ মতো হলে কোনো বর্গাদারকে দিবে, না হলে পতিত থাকবে। তবে কিছু ফসলি জমি বর্গাদারদের দিত যাতে করে পরিবারের সারা বছরের চাল কিনতে না হয়।

বাঙালিদের শতবর্ষের এই দারিদ্র্যকে পর্যায়ক্রমে ধীরে ধীরে বিমোচনের লক্ষ্যে শেখ মুজিবুর রহমান কিছু পদক্ষেপ নেওয়ার চিন্তা-ভাবনা করেন। তিনি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, সমগ্র বাঙালি জাতি যেহেতু সংগঠিত হয়েছে– এ সুযোগেই পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ভাণ্ডার থেকে অর্থনৈতিক সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে কৌশল প্রণয়ন করতে হয়। জনগণের আর্থিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে জনগণের বোধগম্য হওয়ার জন্যে স্পষ্ট ভাষায় তাঁর সিদ্ধান্ত জানাতেন।

মোনায়েম সরকার সম্পাদিত 'শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও রাজনীতি' গ্রন্থের ১৬০ ও ১৬৯ পৃষ্ঠায় বর্ণনা পাওয়া যায়-

"১৯৭০ সালের সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পাকিস্তানের সাধারাণ নির্বাচনের প্রাক্কালে পাকিস্তান টেলিভিশন সার্ভিস ও রেডিও পাকিস্তান কর্তৃক আয়োজিত "রাজনৈতিক সম্প্রচার" শীর্ষক বক্তৃতামালা অনুষ্ঠানে পাকিস্তান আওয়ামী লীগ-এর প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান বক্তা ছিলেন। ২৮শে অক্টোবর ১৯৭০ সালে বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে অর্থনীতি, শিল্প-কারখানা স্থাপন, বিনিয়োগ, বৈদেশিক সাহায্য ও সম্পদের বন্টনে বৈষম্য এবং পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য বিশেষ করে মুদ্রা পদ্ধতির পার্থক্য ইত্যাদি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেন। তিনি ব্যাপক বীমা ও বিভিন্ন কোম্পানীসহ অর্থনীতির যাবতীয় মূল চাবিকাঠি জনগণের মালিকানায় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন।

তিনি কর ব্যবস্থাকে গণমুখী করা, ক্ষুদ্রায়তন,ও কুটির শিল্পকে সমর্থন দেওয়া, এই শিল্পে উৎপাদিত পন্যের বাজারজাতকরণ এবং একে ঋণ সুবিধা দেওয়ার দাবী করেন। সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্রাকৃতির শিল্প গড়ে তোলা, শিল্প-কারখানাকে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে দিয়ে পল্লীর মানুষের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার উপর জোর দেন। এছাড়া তিনি পাট ব্যবসায় জাতীয়করন, পাটের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতকরন এবং পাট গবেষণার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

তিনি চা, তামাক, আলু, তুলা সহ অন্যান্য অর্থকরী ফসলের উৎপাদন, মানোন্নয়নের উপর জোর দেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্যের কথা তুলে ধরেন। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে অসহায় দরিদ্র কৃষক বাঁচার তাগিদে, অভিবাসী জনসাধারণ এবং শ্রমজীবী জনসাধারণ নিদারুণ কষ্টের কথা।

তিনি বলেন, দেশের মোট শ্রমশক্তির এক পঞ্চমাংশ শ্রমজীবী মানুষ আজ বেকার, জীবন যাত্রার দ্রুত ব্যয় বৃদ্ধির জন্য সম্পূর্ণ চাপ এসে পড়েছে শিল্প শ্রমিক মেহেনতি মানুষের উপর।

আওয়ামীলীগের ৬ দফা কর্মসূচি– যে কর্মসূচি ১১ দফা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, সে কর্মসূচি আঞ্চলিক অন্যায়, অবিচার নির্মূলের বাস্তব সমাধানের পথ নির্দেশ করেছে। বঙ্গবন্ধু তাঁর বক্তব্যে কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার-পরিকল্পনা প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর দলের গণমুখী পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন এবং প্রত্যয়দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন– জাতি হিসাবে আমাদের সামনে যে চ্যালেঞ্জ এসেছে আমরা সাফল্যের সাথে তার মোকাবেলা করবোই। প্রকৃত ও প্রাণবন্ত গণতন্ত্র দেশে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তিনি অর্থনৈতিক বঞ্চনার, নানা বৈষম্যের কথা উল্লেখ করেন এবং পূর্ব বাংলার আর্থসামাজিক উন্নয়নে বিভিন্ন দাবী তিনি উপস্থাপন করেন। বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে না পারলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সাধিত হবে না। গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে হবে। এর দ্বারা পল্লীঅঞ্চলে ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারে।"

"পল্লী, কৃষি ও শিল্প উন্নয়নে পাঁচ বছরে আমরা পাঁচশত কিলোওয়াট বিজলি উৎপাদন করতে চাই। রূপপুর আনবিক শক্তি এবং জামালগঞ্জে কয়লা প্রকল্প অবিলম্বে বাস্তবায়ন করতে হবে। প্রাকৃতিক গ্যাস অবিলম্বে পুরোপুরি কাজে লাগাতে হবে। অর্থনৈতিক গুরুত্বের বিষয় হবে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা। যমুনা নদীর সেতু নির্মাণ করে উত্তর বঙ্গের সাথে সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন করতে হবে।"

স্বল্প সময়ে তিনি অনেক কর্মসূচি হাতে নিয়েছিলেন। তিনি স্বপ্ন দেখতেন এবং তা বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করতেন। তিনি যে সুখী-সমৃদ্ধশালী সোনার বাংলা তৈরী করতে চেয়েছিলেন তা ছিল বহুদিনের স্বপ্ন। বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে গ্রামে ক্ষুদ্র কুটির শিল্প এবং কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপন করার আকাংখা ছিল ওনার।

তিনি শিক্ষার সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বলেন, "শতকরা ১৮জন বালক ও ৬জন বালিকা প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেছে। জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ৪ ভাগ

সম্পদ শিক্ষা খাতে ব্যয় করা প্রয়োজন বলে মনে করি। কলেজ ও স্কুল বিশেষ করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে হবে। নিরক্ষরতা অবশ্যই দূর করতে হবে। পাঁচ বৎসরে বয়স্ক ব্যক্তিদের বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা দানের জন্য একটি "ওয়ার্কস প্রোগ্রাম" চালু করতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষার দ্বারা সকল শ্রেণীর জন্যে খোলা রাখতে হবে। দ্রুত মেডিক্যাল ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় সহ নয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দারিদ্র্য যাতে উচ্চশিক্ষার জন্য মেধাবী ছাত্রদের অভিশাপ হয়ে না দাঁড়ায় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।"

আইয়ুবী শাসনের সময়, ব্যাংক ঋণের সুযোগ-সুবিধা নিয়ে সুযোগ-সন্ধানী পাঞ্জাবী ব্যবসায়ীরা পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যাপক কলকারখানা গড়ে তোলে। পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের বাজার হিসাবে পূর্ব পাকিস্তানকে পরিণত করে। সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় এদেশের বাজারে বিভিন্ন উৎপন্ন জিনিস বিক্রি করে প্রচুর অর্থবিত্তের মালিক হয়ে যায় পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পপতিরা। বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের বাজারে কাপড় বিক্রি করে প্রচুর অর্থ উপার্জিত হতো। সেই অর্থের কানাকড়িও পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের কল্যাণে এমনকি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যয় করা হতো না।

১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর দেশের দক্ষিণাঞ্চলে ঘটে যায় এক মহা প্রলয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার নির্বাচনী সফর অসমাপ্ত রেখে ছুটে যান দুর্গত অঞ্চলে। ফেরেন ২৬ নভেম্বর। ঢাকায় ফিরেই তিনি এক সাংবাদিক সম্মেলনে উদ্ধার ও ত্রাণ কাজে সরকারের ঢিলেঢালা অপর্যাপ্ত পদক্ষেপের কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্যোগ থেকে জনসাধারণের জানমাল রক্ষায় উপদ্রুত এলাকায় ব্যাপক ভিত্তিতে বাঁধ নির্মাণ, আশ্রয়কেন্দ্র স্থাপন ও উন্নতর হুঁশিয়ারী সংকেত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

তিনি পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার এবং পশ্চিম পাকিস্তানি এলিট শ্রেণীর উভয়ের সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, "ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, যে সময় পশ্চিম পাকিস্তানে বাম্পার ক্রপ উপভোগ করছে, সে সময় দুর্গত এলাকায় প্রথম খাদ্যবাহী জাহাজ এসেছে বিদেশ থেকে। তিনি বলেন পশ্চিম পাকিস্তানে যে সমস্ত বস্ত্র শিল্পে এ যাবৎকাল বাংলাদেশকে তাদের প্রধান বাজার হিসাবে ব্যবহার করছে তাদের কেউ এ পর্যন্ত মৃতের সৎকারের জন্য এক গজ কাপড়ও দেয়নি।"

তিনি প্রশ্ন করেন, "এজন্য কি বিগত দু'দশক ধরে আমরা আমাদের সম্পদের শতকরা ৭২ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানে খরচ করেছি?"

তিনি সূক্ষ্মভাবে উপলব্ধি করেছেন, পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক যেহেতু গ্রামে বাস করে এবং এরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জমি চাষ করে। আষাঢ়, শ্রাবণ মাসের বৃষ্টিতে ভিজে এবং ফাল্গুন, চৈত্র মাসে রৌদ্রে পুড়ে অমানুসিক পরিশ্রম করে যে ফসল ফলায় তাতে পরিবারের ভরন-পোষন বছরান্তে সম্ভব হয় না। কোনো রকম আধ পেটা খেয়ে জীবন-যাপন করে। মাঝে মাঝে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসলহানি ঘটে। এই ফসল মার খাওয়া সময়ে কৃষকের ভাগ্য পোড়ে। কারণ তখন ছেলে-মেয়েদের ভরন-পোষণ করতে গিয়ে হালের গরু বিক্রি করতে হয়। অথবা সন্তানদের বিয়ে-শাদিতে জমি বিক্রি করতে হয়। এভাবেই বেশির ভাগ দরিদ্র কৃষকের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে এবং তারা ভূমিহীন হতে থাকে। এই শ্রেণীর কৃষকের উপর মরার উপর খাঁড়ার ঘা হচ্ছে নগদ অর্থে খাজনা। এই খাজনা দিতে গিয়ে অনেক কৃষককে হিমশিম খেতে হয়। ঠিক এই জায়গাটাই গ্রাম-বাংলার কৃষক সমাজের স্পর্শকাতর বিষয়। তা দীর্ঘদিন ধরে তিনি প্রত্যক্ষ করে আসছেন। উপলব্ধিতে, বুদ্ধিতে ধরা পড়েছে সর্বহারা কৃষক সমাজের খাজনা নামক দুষ্ট গ্রহ। তাই তিনি এককভাবে গ্রামবাংলার কৃষকদের কথা ভাবতেন।

১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারিতে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে আনুমানিক ২০ লাখ লোকের এক সমাবেশে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ দলীয় নির্বাচিত সদস্যের শপথবাক্য পাঠ করান। বঙ্গবন্ধু সেদিন ৫০ মিনিট ভাষণে বলেন, 'আমরা সুযোগ পেলে সাথে সাথে ২৫ বিঘা পর্যন্ত খাজনা মওকুফ করে দেব। আর দশ বছর পর কাউকে জমির খাজনা দিতে হবে না।'

এর একটা বিশেষ কারণ ছিল, আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্র বা মতাদর্শের সাথে সাধারণ কৃষকের কথা কতটুকু সঙ্গতিপূর্ণ তা তিনি দেখতে চাননি। বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক জীবনে প্রথম থেকেই লক্ষ্য স্থির করেছিলেন এদেশের সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ, বঞ্চিত-দরিদ্র কৃষকের কল্যাণ সাধন করা। এই সাধারণ শ্রমজীবী মানুষদের এক সময় এদেশের নবাব, জমিদার, চৌধুরী, মিয়া, ভূঁইয়া, সৈয়দ নামের উপাধিধারীরা আতরাফ বা আতরাফী হিসাবে আখ্যায়িত হতো। আশরাফ বংশের লোক ছিল অভিজাত, জমিদার শ্রেণীর, অথবা তাদের দোসররা নিজেদেরকে খান্দানী বংশের লোক ভাবতো। এরা সর্বদাই ধর্মান্ধতাকে পুঁজি করে পাকিস্তান সরকারকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করতো। অন্যদিকে গ্রাম বাংলার খেটে খাওয়া কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, তাঁতি, কামার, কুমার, জেলে সংখ্যাগরিষ্ঠ নিরক্ষর মানুষ যারা বাংলা ভাষায় কথা বলতেন তারা নিজেদের মনের অজান্তেই বাঙালি সংস্কৃতিকে বুকের গভীর লালন করতেন। এবার ভাষা-সংস্কৃতিতে বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী বাঙালিরাই অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ

মুজিবুর রহমানের একক নেতৃত্বে সংগঠিত হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারিতে প্রাদেশিক পরিষদ ভবন প্রাঙ্গণে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দেয়া সংবর্ধনা সভায় রাষ্ট্র পরিচালনা, শাসনতন্ত্র প্রণয়নে দলমত নির্বিশেষে বাঙালির অর্থনৈতিক মুক্তির প্রসঙ্গে বেশ কিছু নৈতিক বক্তব্য উপস্থাপন করেন। বাঙালিদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথে অন্তরায়ের সে জায়গাটায় তিনি বারবার আঘাত করার চেষ্টা করেছেন এবং সে জায়গাটা চিহ্নিত করেছেন। পাকিস্তানি পুঁজিবাদী শোষণের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, "বাংলার ক্ষুদে ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতিদের তারা গ্রাস করে ফেলেছে। তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকা ব্যাংক, বীমা শোষণের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। আর সে কারণেই তিনি সে সময়ে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন।" তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন বাংলাকে ঐসব পুঁজিপতির সংরক্ষিত বাজার হিসাবে ব্যবহার করতে গিয়ে পাকিস্তানের সরকার বাঙালির পাট ও চা-এর রফতানি বাজার নষ্ট করে ফেলেছে। আর সে কারণেই তিনি বাংলার হাতে বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক মুদ্রার নিয়ন্ত্রণভার দিতে চান। বাংলা এই নিয়ন্ত্রণ ভার পেলে আর এখানে ২২ পরিবারের সৃষ্টি হবে না। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের ২৩ বছরের শোষণের উল্লেখ করে বলেন, "বাংলার মানুষের উদারতার সুযোগ নিয়ে সারা বাংলাদেশকে লুট করা হয়েছে। যাদের ৫ লাখ ছিল তারা এখন ৫ কোটি টাকার মালিক হয়েছে। এই টাকা আসমান থেকে আসেনি। পাকিস্তানের নামে দরিদ্র জনসাধারণকে সর্বশান্ত করে পুঁজি সৃষ্টি হয়েছে।"

এদেশের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ গ্রামে বাস করেন। গ্রামে বসবাসকারীদের মধ্যে কৃষিজীবী মানুষই অধিক। কৃষির উপর নির্ভরশীল এ মানুষগুলো ভাষা ভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বের প্রতি অনুগত। যে স্বপ্ন সারাজীবন বুকে ধারণ করে ছিলেন তাহলো কৃষকের অর্থনৈতিক মুক্তি। একটি দেশকে অর্থনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে, অর্থনীতিবিদদের মতে উন্নয়নের পূর্ব শর্ত হিসাবে অনেক উপাদানই বিদ্যমান। সময়ের বিচারে তৎকালীন সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালিদের দারিদ্র্য বিমোচন বা অর্থনৈতিক মুক্তি মানেই গ্রাম-বাংলার কৃষকের কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পদক্ষেপ নেওয়া। তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোতে কৃষি উন্নয়নের উপর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়। সেই দিক থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের কৃষকের কথা ভেবেই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েই তাঁর কর্মসূচি ব্যাখ্যা করেন। কারণ, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে প্রথমেই কৃষকের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে পদক্ষেপ নেওয়াকে তিনি সমীচীন মনে করেন। দারিদ্র্য বিমোচনের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে কৃষি উন্নয়নে গুরুত্ব দেওয়াটাই তিনি এদেশের প্রকৃত রাজনীতি হিসাবে ভাবতেন।

গ্রাম বাংলার মানুষের জীবন মানের উন্নতির কথা সব সময়ই ভাবতেন বঙ্গবন্ধু। ওনার সারাজীবনের সাধনাই ছিল গ্রাম-বাংলার গরীব মানুষ, বিশেষ করে গ্রামের কৃষকদের মাঝে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান কমিয়ে আনা। কৃষক যেন ভূমিহীন না থাকে, এই ভাবনাই ছিল ওনার।

১৯৭২ সালে মে দিবস উপলক্ষ্যে তিনি জাতির উদ্দেশে ভাষণে বলেন, অতীতের ব্রিটিশ আমলের সামন্তবাদী জমিদারি সমাজ ব্যবস্থা, পরবর্তীতে পাকিস্তানের আইয়ুবী আমলেও জোতদার,পুঁজিপতি ব্যবসায়ী শিল্পপতি, বাইশ পরিবারের অর্থনৈতিক শোষণ তথা তাদের পোষ্য পুঁজিপতি জোতদার সমাজ ব্যবস্থা থেকে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান হ্রাস করে এত উঁচু-নিচু নয় এমন একটি ভারসাম্যপূর্ণ সমাজব্যবস্থা কায়েমের লক্ষ্যে সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

তিনি বলেন, "আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে পুঁজিবাদী শোষণের বাধা পেরিয়ে জনসাধারণের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন।" এপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, "এই ব্যবস্থায় দেশের সমুদয় উৎপাদিত ও প্রাকৃতিক সম্পদ কৃষক, শ্রমিক ও সর্ব শ্রেণীর মানুষের মধ্যে সুষমভাবে বণ্টন করা।"

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, আমাদের পরিশ্রম করতে হবে। উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে। দেশের সম্পদ বাড়িয়ে আমরা জীবন যাত্রার প্রকৃত মান উন্নয়ন করতে সফল হবো।

বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতি ঐতিহাসিকভাবেই পশ্চাদপদ দেশী-বিদেশী শাসন শোষণের অধীনে গ্রামীণ সমাজ দীর্ঘদিন শোষিত হয়েছে। কৃষিনির্ভর গ্রামীণ অর্থনীতি আজও প্রকৃতিনির্ভর। প্রকৃতির উপর নির্ভরশীলতা ও আদিম চাষ পদ্ধতি এদেশের কৃষির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

যেহেতু কৃষিই গ্রামীণ অর্থনীতির চালিকা শক্তি, সেহেতু কৃষকের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশের কৃষকের অবস্থা অধিক ফসল উৎপাদনের অনুকূল নয়। এদেশের সিংহভাগ কৃষকই নিরক্ষর ও ভগ্নস্বাস্থ্যের অধিকারী। অশিক্ষা ও অসচেতনতার কারণে তারা উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারে না। অধিক জন্ম ও মৃত্যুহার, অপুষ্টি ইত্যাদি কারণে স্বাস্থ্যবান কৃষকের সংখ্যা খুবই কম। এর ফলে তারা সঠিকভাবে পর্যাপ্ত শ্রম দিতে পারে না। উপর্যুক্ত কৃষকদের মধ্যে রয়েছে অশিক্ষা, কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা ইত্যাদি। যেগুলো কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এদেশের কৃষকদের আধুনিক চাষপদ্ধতি সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান নেই। অনেকেই বরং পরিবর্তনকে ভয় পায়। এসব অবস্থার ফলে কৃষি খাতের উন্নয়ন সাধন হয় না।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রয়োজন। কিন্তু গ্রামের অর্থনীতির অবকাঠামো খুবই দুর্বল। গ্রাম এলাকায় রাস্তা-ঘাট খুবই অনুন্নত। পাকা রাস্তা নেই বললেই চলে। বরং অনেক জায়গায় কাঁচা রাস্তাও নেই। টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা প্রায় একেবারেই অনুপস্থিত। জলসেচের জন্য নেই পর্যাপ্ত মেশিন ও ড্রেনের ব্যবস্থা। গ্রামের সব এলাকায় বিদ্যুতের সরবরাহ নেই। যে সব এলাকায় আছে সেখানেও লোডশেডিংয়ের কারণে বিদ্যুৎ অনিয়মিত। শিক্ষিত স্বাস্থ্যবান ও প্রশিক্ষিত কৃষক নেই বললেই চলে। বাজার ব্যবস্থা খুবই অনুন্নত। উপরন্তু প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাদিও খুবই নিম্নমানের। ফলে কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হয় না।

ব্যাপক সংখ্যক মানুষের সীমাহীন দারিদ্র্য গ্রামীণ অর্থনীতির অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য। জাতিগতভাবেই এদেশের মানুষ দরিদ্র। ১৯৭১ সালে এদেশে দরিদ্রের সংখ্যা ছিল ৭০%। বর্তমানে মোট জনসংখ্যার ৪৫% ভাগ দরিদ্র সীমার নিচে বসবাস করছে বলে মনে করা হয়। তবে দারিদ্র্যের ক্ষেত্রে গ্রাম ও শহরের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। শহরের তুলনায় গ্রাম এলাকায় দরিদ্রের হার অধিক।

জনসাধারণের খাদ্যাভাব, শিক্ষার দূরাবস্থা দেখে নিজের অসহায়ত্ব প্রদর্শন করে তিনি বলেন, আমার তো কিছুই নেই। আমি গরীব মানুষের উপর ট্যাক্স বসাতে পারি না। আজ পর্যন্ত তো আমি এক পয়সাও ট্যাক্স বাড়াইনি। তাহলে চলবে কি করে? পরক্ষণেই তিনি নিজেই এর সমাধান দেন। আপনাদের কাজ করতে হবে। ছেলেদের কাজ করতে হবে। তিনি শর্তাধীন বিদেশী সাহায্য এনে দেশকে দাসত্বের শৃঙ্খল পরাতে চাননি। ভবিষ্যৎ বংশধরদের গোলাম বানিয়ে রাখতে চাননি।

তিনি খুব কৌশলে পা ফেলতে চেষ্টা করতেন। এদেশের মানুষ যাতে প্রতারিত না হয় সেদিক চিন্তা করতেন বেশি। পাকিস্তানি সৈন্যরা অসংখ্য সেতু, রাস্তা-ঘাট ও রেলপথ বিনষ্ট করে। এমনকি ঢাকার সঙ্গে চাটগাঁর সংযোগ রক্ষাকারী দীর্ঘ সেতু ভৈরব ব্রীজটিও তারা ধ্বংস করেছিল। দখলদার বাহিনীর পোড়ামাটি নীতি অনুসরণ করেছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের মানুষ যেন অর্থনৈতিকভাবে উন্নতি করতে না পারে। পাকিস্তানি বাহিনীর নয় মাসব্যাপী ধ্বংসযজ্ঞের সময়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা, কলকারখানা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যুদ্ধ-বিধস্ত বাংলাদেশ দেখে শংকিত হয়ে বিদেশি অর্থনীতিবিদ ও বিশেষজ্ঞরা ভবিষ্যদ্বানী করেছিল যে, বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষে মৃত্যুবরণ করবে। কিন্তু তা হয়নি। ১৯৭২ সালে কোনো লোক অনাহারে মারা গেছে বলে জানা যায়নি। মৃত্যু ও ধ্বংসের বিরুদ্ধে জীবনই জয়ী হয়েছিল।

বঙ্গবন্ধু শুধু মুখে মুখে পত্রিকার বিবৃতি বা টেলিভিশনে নয়, বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কথা ভেবে অর্থাৎ গ্রামীণ জীবনের কথা ভেবে যাদের জন্য সারাজীবন সংগ্রাম করেছেন যেই ভূমিহীনকে ভূমি দেওয়ার স্বপ্ন দেখেছেন। দরিদ্র কৃষককে আধুনিক কৃষি চাষ পদ্ধতি শিক্ষার মাধ্যমে, যন্ত্রপাতি অনুদান, বিনামূল্যে সার বিতরণ ও সেচের ব্যবস্থাসহ কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নের অঙ্গীকার স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানে সংযোজন করেন। এটি রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব হিসাবে সহকর্মীদের প্রচার করে জনগণকে সচেতন করার জন্য তাগিদ দিতেন।

আমাদের সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের ১৬নং অনুচ্ছেদে পরিষ্কারভাবে লিখিত আছে, "নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবন-যাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করিবার উদ্দেশ্যে কৃষি বিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিকরণের ব্যবস্থা, কুটির শিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষার উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তর সাধনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।"

আমাদের এই কৃষি অর্থনৈতিক উন্নততর ব্যবস্থার উন্নতির জোরদার করার জন্য কৃষি বিপ্লবের বিকাশ সাধন করতে হবে। তার জন্য সংবিধানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয় নাই। কৃষি বিপ্লবের বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে কৃষকের যে মৌলিক কৌশলগত শিক্ষার প্রয়োজন সে শিক্ষা দেয়ার জন্য তাগিদ রয়েছে সংবিধানে।

সংবিধানের ১৬নং অনুচ্ছেদে ভূমি ব্যবস্থা এবং কুটির শিল্পের বিকাশ সাধন করার জন্য সমবায় ভিত্তিতে যৌথ খামার বা কৃষি খামার গড়ে তোলার কথা আছে। সে ব্যাপারে সংবিধানে কোনো বাধা নাই।

ঐতিহাসিক ৭ জুন তারিখে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধু স্মৃতিচারণ করে এক বক্তৃতা দেন। তাতে তিনি ব্যাংক, বীমা, শিল্প-কারখানা, জাতীয়করণের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে বলেন– "আমি তাদের জন্য কোন কাজে হাত দিয়ে কখনও হাল ছাড়ি না।"

তিনি ব্যাংক, বীমা ও শিল্পকারখানা জাতীয়করণের যৌক্তিকতা প্রসঙ্গে বলেন, "এগুলো জাতীয়করনের অর্থ হলো শোষণের চাবিকাঠি ধ্বংস করে দেওয়া।"

তিনি শোষণহীন সমাজ ও সম্পদের সুষম বণ্টনের জন্য সমাজতন্ত্র কায়েমের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে বলেন, "সমজতন্ত্র আমি অন্য দেশ থেকে ভাড়া করে আনতে চাই না। এ সমাজতন্ত্র হবে বাংলার মাটির সমাজতন্ত্র।"

তিনি গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষার কথা বলেন– "সমাজতন্ত্র যে দেশে আছে সে দেশে গণতন্ত্র নেই। দুনিয়াকে আমি বাংলার মাটি থেকে দেখাতে চাই যে, গণতন্ত্রের মাধ্যমে আমি সমাজতন্ত্র কায়েম করবো।"

এম. আমিনুল ইসলাম রচিত 'উন্নয়ন চিন্তার পালা বদল' গ্রন্থের ৪১ নং পৃষ্ঠায়

জনগণের অর্থনৈতিক সমতার যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা নিম্নরূপ–

পাকিস্তানি অর্থনীতিবিদ মাহবুব-উল হক তার মানব উন্নয়ন প্যারাডাইস বিকাশের ইতিহাস বলতে যেয়ে লিখেছেন, তিন দশকের উন্নয়ন অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেল অনেক দেশে প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও সামাজিক সংকট তৈরি হলো। মাহবুব-উল হকের মতে, উন্নয়নের মূল লক্ষ্য মানুষের পছন্দের সম্প্রসারণ। তিনি মানব উন্নয়নের উপাদান হিসাবে চারটি বিষয় দেখিয়েছেন। (১) সমতা (২) টেকসই উন্নয়ন (৩) উৎপাদনশীলতা (৪) ক্ষমতায়ন।

সমতার সংজ্ঞায় বলেছেন– সমতাকে বাদ দিয়ে উন্নয় সম্ভব নয়। তবে এটি মার্কসীয় সমতা নয়। এ সমতা হচ্ছে সম্প্রসারিত সুযোগের সমতা, ক্ষমতার কাঠামো এবং আইনগত বিধানকে কিছুটা পরিবর্তন করে মানুষের সামনে দরিদ্র, বঞ্চিত এবং অধঃস্তন মানুষের সামনে আরও সুযোগ তৈরি করা যাতে তাদের মানবিক সম্ভাবনার বিকাশ ঘটতে পারে।

তিনি নিজেদের মতো করে দেশীয় পদ্ধতিতে জনগণের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনয়ন করতে অর্থনৈতিক সমাজতন্ত্রের কথা ভেবেছেন। যে সমাজতন্ত্রের দর্শন বাইরে থেকে ধার করা নয়, সম্পূর্ণ নিজেদের প্রয়োজনে সময়-কাল বিবেচনা করে।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পরই রাষ্ট্রের দায়িত্ব নিয়ে প্রথমেই এদেশের ভাগ্যাহত কৃষকের জীবন-মানের উন্নয়নের জন্য বঙ্গবন্ধু বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৭২ সালে অর্থমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহমদ ৫০১ কোটি টাকার বাংলাদেশের প্রথম বাজেট পেশ করেন। এ বাজেটে ৬৬ কোটি ৯৫ লাখ টাকা রাজস্ব খাতে উদ্বৃত্ত রেখে ৫০১ কোটি টাকার বাজেট পেশ করেন। সে বছর বাজেটে জোর দেওয়া হয়েছে কৃষি ও শিক্ষা খাতে। শিক্ষা খাতে বরাদ্দ ৪৩ কোটি টাকা। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে এদেশের কৃষকের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য ৩১৮ কোটি টাকার উন্নয়ন বাজেটের মধ্যে ১০৩ কোটি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে কৃষি খাতে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, এই বাজেটে কোনো কর আরোপ হয় নাই। অনেক আমদানি শুল্ক হ্রাস করা হয়েছে।

সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে কৃষকদের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো, ধ্বংসপ্রাপ্ত কৃষি অবকাঠামো পুনর্গঠন, কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ (১৯৭৩ সালের মধ্যেই হ্রাসকৃত মূল্যে ৪০ হাজার শক্তিচালিত লিফট-পাম্প, ২,৯০০টি গভীর নলকূপ ও ৩,০০০টি অগভীর নলকূপের ব্যবস্থা করা হয়)। ১৯৭২ সালের মধ্যেই জরুরি ভিত্তিতে বিনামূল্যে এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে নাম মাত্র মূল্যে অধিক কৃষিপণ্য উৎপাদনের জন্য ১৬,১২৫ টন ধান বীজ, ৪৫৪ টন পাট বীজ ও ১,০৩৭ টন গম বীজ সরবরাহ করা

হয়। দখলদার পাকিস্তানি শাসনকালে রুজু করা ১০ লক্ষ সার্টিফিকেট মামলা থেকে কৃষকদের মুক্তি দেওয়া হয় এবং তাদের বকেয়া সকল ঋণ সুদ সহ মাফ করে দেওয়া হয়। ২৫ বিঘা পর্যন্ত খাজনা চিরতরে রহিত করা হয়। ধান-পাট, তামাক ও আখ সহ গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে ন্যূনতম মূল্য বেঁধে দেওয়া হয়। গরীব কৃষকদের বাঁচানোর তাগিদে সুবিধাজনক নিম্নমূল্যের রেশন সুবিধা তাদের আয়ত্বে নিয়ে আসা হয় এবং গরীব কৃষক পরিবারের ছেলেমেয়েদের বিনা খরচে লেখাপড়ার ব্যবস্থা হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রণীত প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সামাজিক ন্যায়বিচার ও দারিদ্র্য বিমোচনের তাগিদে কৃষি উন্নয়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পর্যায়ে নিয়ে আসা হয়। এ সময় দেশে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা ছিল শতকরা ৩৫ ভাগ। বিরাজমান খাস জমির সাথে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিতরণযোগ্য জমির সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পরিবার পিছু জমির সিলিং ১০০ বিঘায় নির্ধারণ করে দেন। তাৎক্ষণিক আমদানির মাধ্যমে এবং স্বল্প মেয়াদে উন্নত পদ্ধতির চাষাবাদ, উন্নত বীজ, সেচ ও অন্যান্য কৃষি উপকরণ সরবরাহের জন্য এবং কৃষি ঋণ মওকুফ, সার্টিফিকেট মামলা প্রত্যাহার, খাস জমি বিতরণ করে কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা ও উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে স্বনির্ভরতা অর্জনের চেষ্টা করা হয়।

বিশেষ করে ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি রাষ্ট্রকে পুনর্গঠন করার সময়ের অবস্থা একরকম আর চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর পরের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম। সময়ের প্রেক্ষিতে সহজেই উপলব্ধি করা যায়, যে সাধনা, স্বপ্ন ও লক্ষ্য নিয়ে তিনি স্বল্প সময়ের মধ্যে পরিকল্পিতভাবে দেশ গঠনের কাজ শুরু করেছিলেন, তা বাস্তবায়নের জন্য যদি সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তারা সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করতেন তাহলে মনে হয় দশ বছরের মধ্যেই গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনে অনেকটাই অগ্রগতি সাধিত হতো।

সোজা কথায় সমাজের যে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা বিরাজ করতো তা অনুপাতিক হারে যা হবার কথা ছিল তা আর হলো না। অনেক কিছু হলেও গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য নির্দিষ্ট করে কিছুই করা হলো না।

যে ব্যবস্থায় গ্রাম-বাংলার কৃষকের মধ্যে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান অধিকতর হয়েছিল সে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারি প্রথার বিলোপ হলেও কৃষিভিত্তিক সমাজে আবাদি জমি অসমই থেকে যায়। এভাবে অসমভাবে বন্টিত কৃষি জমির মাধ্যমে কৃষক সমাজের জীবনের উন্নয়ন যে হতে পারে না তা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। বৃহত্তর এ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন

করার চিন্তা থেকেই কৃষক সমাজের ভূমিহীনতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। শুধু কৃষকের উন্নয়নের জন্যই কৃষিজমি সমবণ্টন নয়, এই সমবন্টনের প্রভাব পড়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও রাজনীতিতে। সম বা অসম বন্টনের ফলে রাষ্ট্র ও রাজনীতিতে কি ধরনের নেতিবাচক ও ইতিবাচক প্রভাব পড়ে তার একটি বক্তব্য পাওয়া যায় 'রবার্ট ডাল' নামক একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর লিখিত 'মডার্ন পলিটিক্যাল এ্যানালাইসিস গ্রন্থের' ৯৩ পৃষ্ঠায়–

> "একটি কৃষিভিত্তিক সমাজে যদি আবাদি জমি অসমভাবে বন্টিত হয় তাহলে সকল রাজনৈতিক সঙ্গতি ও দক্ষতাও অসম হবে। ফলে ক্ষমতার বণ্টনও হবে খুব অসম।"

বঙ্গবন্ধু ২৬ মার্চ ১৯৭২ সালে টিভি ভাষণে বললেন, 'সম্পদের বণ্টন ব্যবস্থায় সমতা আনতে হবে।"

শুধু কথায় নয় কাজেও তিনি তাঁর এই চিন্তার প্রতিফলন ঘটালেন। ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মাফ করে দিলেন।

গ্রামীণ জনসাধারণের শিক্ষা, চিকিৎসা, বস্ত্র, বাসস্থানের প্রয়োজন মিটলেই দারিদ্র্য বিমোচনের গতি বৃদ্ধি করা সম্ভব। উর্বর জমি অধ্যুষিত বাংলাদেশের মতো জনবহুল একটি উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রেই ভূমি সংস্কারের প্রয়োজন বেশি। যুগোপযোগী চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণার মাধ্যমে পরীক্ষিত কর্মসূচি নিয়ে ভূমি সংস্কার করা যেতে পারে। কর্মসূচির বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে ভুল-ত্রুটি সংশোধন করা যেতে পারে। যখন যেখানে যেমন প্রয়োজন, সেখানে তেমনি তা বাস্তবায়নের জন্য ভূমি সংস্কারের বিকল্প নেই। বিশ্ব বরেণ্য অর্থনীতিবিদগণ দারিদ্র্য বিমোচন গবেষণার ফলাফলে ভূমি সংস্কারের অধিকতর প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। অমর্ত্য সেনের 'তর্ক প্রিয় ভারতীয়' গ্রন্থের ১৯০ পৃষ্ঠায় তিনি বিশ্লেষণ করেছেন–

> "অসম্পূর্ণ ভূমি সংস্কার দারিদ্র্য দূরীকরণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। দারিদ্র্য দূরীকরণের বিশেষত চরম দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ব্যাপক ভিত্তিতে অধিকতর অংশগ্রহণমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রয়োজন আছে। কিন্তু অশিক্ষা, বেহাল স্বাস্থ্য পরিসেবা, অসম্পূর্ণ ভূমি সংস্কার এবং অন্যান্য চরম সামাজিক বৈষম্যের বাধা ভেঙে এই সার্বিক উন্নয়ন অর্জন করা খুব সহজ কাজ নয়। বৃহত্তর পরিসরে সামাজিক সুযোগ সৃষ্টি করাও তাকে বাড়িয়ে তোলার কাজ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটতে পারে না।"

বঙ্গবন্ধুর সারাজীবনের ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা চেতনায় ছিল এদেশের জনগণের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি। তার জন্যই বঞ্চিত, অবহেলিত, বৈষম্য নিপীড়িত বাঙালিদের জন্য প্রথমে স্বাধীন দেশ গঠন করলেন। পরবর্তীতে সবাইকে নিয়ে এদেশের মানুষের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য ভূমিহীনদের সংখ্যা দ্রুত হ্রাস করার লক্ষ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, বাসস্থান এবং কর্মসংস্থানের জন্য আন্দোলন কৌশল অবলম্বন করেন। সর্বশেষে যে কৌশল তা হলো অশিক্ষা, ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

অর্থনৈতিক ভাবনা প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল যে, আনুমানিক দশ বছরের মধ্যেই বাস্তবসম্মত পরিকল্পনার মাধ্যমে সারা গ্রমাবংলায় বিশেষ গ্রাম-সমবায় গড়ে উঠবে এবং সারা দেশে সর্বমোট পঞ্চাশ হাজার সমিতি জন্ম লাভ করবে। তবে কালক্রমে একত্রীকরণের মাধ্যমে এর সংখ্যা বারো/তেরো হাজারে নেমে আসবে বলেও তিনি মনে করতেন।

অর্থনৈতিক খাতে ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে দেশের সর্বোচ্চ চাহিদা মিটিয়েও প্রায় ১০০ লাখ টন চাউলের উদ্বৃত্ত ধরা হয়েছিল, যার তৎকালীন বাজার মূল্য ছিল ৩,৬০০ কোটি টাকা। এর ফলে জাতীয় আয়ও সমানুপাতে বেড়ে যাওয়া, জাতীয় আয়ে ও বৈদেশিক মুদ্রায় সঞ্চয়ের পরিমাণ দাঁড়াতো ৪,১০০ কোটি টাকা। বাড়তি ফসল উৎপাদনের ফলে দেশের স্থায়ী খাদ্য ঘাটতি মিটে যাবে, যার ফলে দেশের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও বৈদেশিক নীতিতে বিদ্যমান অসুবিধাগুলোও দূর হবে, এমন আশা করা হয়েছিল। সারা দেশে গ্রাম-সমবায় সমূহের দশ লক্ষ শিক্ষিত ও অর্ধ-শিক্ষিত লোক নিয়োগ করার পরিকল্পনা করা হয় ব্যবস্থাপনা, তদারকি ও সক্রিয় কর্মতৎপরতায়। সমবায়-ব্যবস্থায় গ্রামীণ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, যোগাযোগ, গৃহস্থালি ভিত্তিক পেশা, আইন-শৃঙ্খলা ও গ্রাম-প্রশাসন ক্ষেত্রেও সর্বাত্মক অগ্রগতি সাধিত হবে এমন আশা বঙ্গবন্ধু করতেন।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যে রূপরেখা দেওয়া হয় তাতে সারাদেশে এক অভাবিতপূর্ব উৎপাদনমুখী রাজনৈতিক তৎপরতা ও সৃজনশীল রাজনৈতিক সমন্বয় ও সংহতি সৃষ্টি হবে বলে মনে করা হয়। এ ব্যবস্থায় নেতা-কর্মী ও জনগণের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য এক সম্পর্ক সৃষ্টি হওয়ার ফলে সংগৃহীত হবে গোষ্ঠী-চেতনায় অনুপ্রাণিত অসংখ্য কর্মীদল। সারাদেশে গড়ে উঠবে গণমুখী ও উৎপাদনমুখী এক রাজনৈতিক পরিবেশ এবং কালক্রমে দেশের ৫০ হাজার গ্রাম-সমবায়ে তৈরি হবে অন্যূন ২৫ লাখ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, আদর্শ উদ্বুদ্ধ, সুশৃঙ্খল ও আত্মনির্ভরশীল কর্মীদল। এমন ধরনের উচ্চাশা পোষণ করা হয়েছিল।

বাংলাদেশের সমাজ-জীবনেও এ সমবায়-ব্যবস্থা যুগান্তকারী পরিবর্তন আনবে বলে বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন। এতে সামাজিক শ্রেণী-বিন্যাসের পার্থক্য কমে যাবে, সবল কর্তৃক দুর্বলের ওপর অত্যাচারের সুযোগ হ্রাস পাবে, দুস্থ ও পশ্চাৎপদ গোষ্ঠীসমূহের ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় বৃদ্ধির সুযোগ দিতে হবে বলে পরিকল্পনায় উল্লেখ করা হয়। উদাহরণ হিসেবে বিদ্যুৎ ও পরিবহন খাতের উন্নয়নের উপর সার্বিক প্রবৃদ্ধি নির্ভরশীল বলা হয়, কিন্তু এই দু'টি খাতই পুঁজিঘন খাত। পরিকল্পনায় এই দুটিসহ আমদানি-নির্ভরতা কমানোর জন্য সার, সিমেন্ট, ইস্পাত ইত্যাদির মতো পুঁজিঘন খাতে অবশ্যই বিনিয়োগ করতে হবে বলে মন্তব্য করা হয়েছে।

কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য শিল্প-খাত, কৃষি-খাত ইত্যাদির ব্যাখ্যা করে পরিকল্পনায় অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য সমতাভিত্তিক আয় বণ্টন ব্যবস্থার জন্যে দুটি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। দরিদ্রতম মানুষদের ন্যূনতম মূল্যে অপরিহার্য দ্রব্যাদি পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে দারিদ্র্য রেখার উর্ধ্বে তুলে আনার বিষয়েও পরিকল্পনায় বলা হয়। যেসব দ্রব্য-সামগ্রীর চাহিদা প্রচুর এবং যা দরিদ্র মানুষের অধিকতর প্রয়োজন, সেইসব দ্রব্য সামগ্রীর যেমন নিম্ন-আয়ের মানুষের গৃহনির্মাণ সামগ্রী, কম মূল্যের কাপড় এবং কম মূল্যের ভোগ্যপণ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। অতীতে গ্রামীণ এলাকায় যেসব উন্নয়ন কর্মসূচি পরিচালিত হয়েছে তা গরিবদের তুলনায় ধনী কৃষককেই লাভবান করেছে। সরকারকে এটা করতে হবে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে। এই লক্ষ্যে প্রাথমিক কাজ শুরু হয়। পরিকল্পনা কালেই অনুপার্জিত আয় এবং উচ্চ আয়ের উপর রাজস্ব নির্ধারণের তাগিদ দেওয়া হয়। পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত ভোগের পরিমাণ ও উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অংশে বলা হয়েছে, ন্যূনতম পরিমাণ ভোগ্যপণ্য আমদানির বিকল্প দ্রব্য-সামগ্রী এবং নির্ধারিত কিছু রপ্তানি সামগ্রী উৎপাদনই এ পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য। লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে ১৯৭২-৭৩ বর্ষের তুলনায় ১৯৭৭-৭৮ সালে চালে ব্যবহার ১১ শতাংশ এবং অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে বলা হয়েছিল। কাপড়ের ব্যবহার দুই-তৃতীয়াংশ বৃদ্ধি পাবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাইতে দ্রুত হারে গৃহায়ন পকিল্পকনা করা হয়।

সামাজিক ভোগ (Social Consumption)-এর আওতায় স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হয়। হাসপাতালের বেডের সংখ্যা ৮০ শতাংশ বাড়িয়ে ২২,২০০-তে উন্নীত করা হবে, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বলা হয়।

বঙ্গবন্ধুর সরকার প্রণীত পরিকল্পনায় স্বীকার করা হয় যে, ১৯৭৭-৭৮ সালেও গড় ভোগ অবর্ণনীয় দারিদ্র্যকেই প্রকাশ করে। কিন্তু যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে যে গুণগত পরিবর্তনশীল অবস্থার সৃষ্টি হবে, তা পরবর্তীকালে সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের বুনিয়াদ হিসেবে অবদান রাখবে। একটি উচ্চতর ভোগ অর্জনের লক্ষ্যে পরিকল্পনার শেষ দিকে বৈদেশিক ঋণের ওপর নির্ভরশীলতা কিছুটা বৃদ্ধি করা হয়েছিল, অভ্যন্তরীণ সম্পদের প্রকট সীমাবদ্ধতার কারণে। কতকগুলো ক্ষেত্রে আমদানি নির্ভরতা বৃদ্ধি পাকিস্তানি আমলের আঞ্চলিক বাণিজ্যের কারণে হয়েছিল বলে উল্লেখ করা হয়।

বঙ্গবন্ধুর সরকার কয়েকটি ক্ষেত্রে রপ্তানি সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর চেষ্টা করে। এ রকম সামগ্রী হচ্ছে কাঁচা পাট, চামড়াজাত সামগ্রী ইত্যাদি। গম, কাঁচা তুলা ইত্যাদির ক্ষেত্রে অতি উচ্চ প্রবৃদ্ধির হার প্রাক্কলিত হয়, কারণ প্রতি বছরে এর উৎপাদন হার ছিল অতি নিম্ন। স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মতো সামাজিক খাতে অতি উচ্চ প্রবৃদ্ধি ধরা হয়। অবকাঠামোগত কিছু ক্ষেত্রেও যেমন ডাক ও টেলিফোন, নেট এবং সড়ক পরিবহন খাতে জিডিপির চাইতে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে আর রেলওয়ে খাতে কমবে বলে পরিকল্পনায় উল্লেখ করা হয়েছিল। পরিবহন খাতে বিশাল উন্নয়নের সম্ভাবনার বিশ্বাস থেকে এই খাতে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। পাঁচশালা পরিকল্পনায় প্রধান প্রধান খাত যেমন গম, তুলা, ইস্পাত এবং সার, বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন, জাহাজ নির্মাণ ও ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যাদি, তৈলবীজ, টেক্সটাইল, সূতা, কাপড়, চামড়া, টেলিফোন, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, তামাক কাগজমন্ড, সিনেমা হাউস, নতুন পোস্ট অফিস স্থাপন, হাসপাতাল বেড ইত্যাদি খাতে সার্বিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল।

১৯৬৯-৭০ এর তুলনায় ১৯৭২-৭৩ সালে ধান উৎপাদন ১৫ শতাংশ কমে আর এই সময়ে জনবৃদ্ধির কারণে এই হ্রাস দাঁড়ায় ২০ শতাংশে। ২৮ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানি সত্ত্বেও বিপুল ঘাটতি থেকে যায়। একই সময়ের প্রেক্ষাপটে পাট-শিল্পে ২৮ শতাংশ, সূতা উৎপাদন ২৩ শতাংশ, কাপড় উৎপাদন ৩ শতাংশ এবং চিনি উৎপাদন ৮০ শতাংশ হ্রাস পায়। এই সময়কালে সার, ইস্পাত এবং জাহাজ নির্মাণ-খাতের উৎপাদন ১৯৬৯-৭০ সাল অপেক্ষা বৃদ্ধি পায়, এ ছাড়া সব ক্ষেত্রেই হ্রাস পায়। শিল্প-উৎপাদন হ্রাস পাবার কারণ হিসেবে (ক) ব্যবস্থাপনার অপর্যাপ্ততা এবং (খ) শ্রমিকদেরকে শৃঙ্খলা ও দক্ষতাপূর্ণ কাজে উৎসাহিতকরণে ব্যর্থতার কথা বলা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত সেতু ও সড়কের কারণে মালামাল পরিবহন ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়। এই সূত্রের সমন্বয়ের অভাব এবং দক্ষ ব্যবস্থাপনার অভাব ও পরিবহন খাতের সামর্থ্য হ্রাস করার কথা প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়নে

বিবেচিত হয়। স্থানীয় উৎপাদিত সামগ্রীর ক্ষেত্রে ফ্যাক্টরি মূল্য এবং আমদানিকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে বন্দর মূল্যের সাথে পাইকারি বিক্রেতা, পাইকার এজেন্ট এবং লাইসেন্সধারীদের দ্বারা অধিক হারে মূল্য আরোপ করার কথা উল্লেখ করে। সরবরাহ সমস্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, যদিও পাবলিক সেক্টর কোম্পানি এবং স্টেট ট্রেডিং করপোরেশন বিরাজমান, তথাপি এ ক্ষেত্রে সরকারের সামর্থ্য সীমিত। আমদানি রপ্তানি বিষয়ে বলা হয় যে, ১৯৭২-৭৩ সালে যে পরিমাণ পণ্য আমদানি করা হয় তা প্রয়োজনের চাইতে ৩০ শতাংশ কম। বৈদেশিক সম্পদের ঘাটতি ছিল, তথাপি আমদানি নীতি ও আমদানি বাণিজ্য কার্যক্রম সময়ের চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ হওয়ার কথা এবং অর্থ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বলা হয়েছে। স্বাধীনতার পরে ১৯৭৩-এর মার্চ পর্যন্ত টাকার সরবরাহ ৮৩ শতাংশ বৃদ্ধি করা এবং ১৯৭৭-৭৮ সালে মূল্যমান ১৯৭৩-এর চাইতে সামান্য নিম্নে রাখার সতর্ক সংকল্প ব্যক্ত করা হয় পরিকল্পনায়।

সরকার কৃষকের কাছ থেকে তাদের অতিরিক্ত খাদ্য-শস্য ক্রয় এবং ঘাটতি এলাকায় তা বিতরণের ব্যবস্থা করবে বলে পরিকল্পনায় উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া রেশনশপ এবং ন্যায্য মূল্যের দোকানগুলোতে পর্যাপ্ত পণ্য সরবরাহের এবং এসবের ব্যয়-সাশ্রয় ও দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছিল।

বঙ্গবন্ধু এদেশের মেহনতি মানুষের অবস্থার উন্নয়নের জন্য বিশেষভাবে ভেবেছেন। তাঁর মাথায় সর্বদাই কৃষক-শ্রমিকের মুক্তির চিন্তা ক্রিয়াশীল ছিল। এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ বাস করে গ্রামে। ভূমি সংস্কার ও গ্রামে সমবায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কৃষক-জনতার কল্যাণ নিশ্চিত হবে এবং শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্যসহ সেবা-কাঠামো গড়ে উঠবে এবং বিশেষ করে জন্মনিয়ন্ত্রণের ওপরেও এর ইতিবাচক প্রভাব পড়তে বাধ্য বলেও বঙ্গবন্ধুর গভীর বিশ্বাস ছিল।

বঙ্গবন্ধু প্রস্তাবিত ব্যবস্থা প্রশাসনিক বিবর্তনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারতো। এর ফলে প্রশাসনিক জটিলতা কমে যেত, কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় প্রশাসন হতো পরিপূরক, সর্বোপরি প্রশাসনের গণমুখিতা বৃদ্ধি পেতো বলে বিশ্বাস করা চলে।

কৃষক সমাজ তথা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবী ভূমিকায়ও বিশ্বাসী ছিলেন বঙ্গবন্ধু। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে তিনি ঘোষণা করেছিলেন শ্রমিক কর্মচারীদের যথাযথ ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের কথা–

> সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি পুরোপুরিভাবে গড়ে তোলার কাজে শ্রমজীবীদেরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয়। এই নয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কয়েমে

> শ্রমিকদের বিশেষ ভূমিকা পালন করতে হলে তাদের বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হয়। তখন আর পুঁজিপতি প্রভুদের ভোগের জন্য সম্পদ উৎপাদন করা চলে না। তখন যা উৎপাদন হয় তা শ্রমিক-কৃষক এবং বাংলাদেশের সব মানুষের কল্যাণের জন্য। সমাজতন্ত্রের শত্রুরা এই লক্ষ্য অর্জনে বাধা এবং জাতীয়করণ কর্মসূচির সাফল্যের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করতে চায়।

তিনি আরও বলেছিলেন যে, শ্রমিকরা সরকারের সঙ্গে একযোগে কাজ করে সমাজতন্ত্রের শত্রুদের ধ্বংস করতে পারেন। কিন্তু এটা করতে হলে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় শ্রমিকদের ভূমিকা, দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণে আমূল পরিবর্তন আনার কথা বলেন। শিল্পোৎপাদনের সুফল সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষকে বিশেষ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ চাষী ভাইদের ভোগ করতে দেওয়া প্রয়োজন। সুতরাং জাতীয় স্বার্থের প্রতিকূল দাবি-দাওয়া পেশের মনোভাব ত্যাগ করে সমাজতান্ত্রিক শৃঙ্খলা এনে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি কায়েম করা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করতেন।

শ্রমিকদের রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের পরিচালনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের ব্যাপারে একটি স্কীম প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন। তিনি বলেন, নতুন ভূমিকা পালনের জন্য শ্রমিকদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টানোর সঙ্গে সঙ্গে সরকারি প্রশাসনযন্ত্রকেও নতুন করে ঢেলে সাজানো দরকার। সরকারের উচ্চ ও নিম্ন বেতনভোগী কর্মচারীদের বেতনের ক্ষেত্রে বিরাট ব্যবধান কমিয়ে আনার জন্য বেতন কাঠামোর পুনর্বিন্যাস করার উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু একটি 'জাতীয় বেতন কমিশন' গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন।

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম চালিকাশক্তি ছিল পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক আমাদের শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ। 'দুই অর্থনীতি' তত্ত্ব আমাদের মুক্তিযুদ্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। সুতরাং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পেছনে সাধারণ মানুষের মধ্যে একটি অর্থনৈতিক আকাঙ্ক্ষা কাজ করে। সে আকাঙ্ক্ষার মূল কথা ছিল সব রকমের অর্থনৈতিক শোষণের অবসান, অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এবং সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি। অর্থনৈতিক এ আকাঙ্ক্ষাকে সামনে রেখে বাংলার মানুষ স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। যে কোনো জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মতো বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের প্রতি ভবিষ্যৎ বাঙালি পুঁজিপতিদেরও সমর্থন ছিল। কিন্তু সেটা এ কারণে যে, পাকিস্তানি বিশাল পুঁজির প্রতিযোগিতা করার মতো ক্ষমতা তাদের ছিল না এবং তাদের ক্ষুদ্র পুঁজির বিকাশের জন্য একটি আলাদা সার্বভৌম ভূখণ্ডের প্রয়োজন ছিল।

১৯৭১ সালে ভৌত ও সামাজিক অবকাঠামো ধ্বংসকারী একটি রক্তক্ষয়ী মুক্তিসংগ্রামের পর বাংলাদেশের মতো একটি জনবহুল সম্পদ-অপ্রতুল ও বৈষম্যপূর্ণ সমাজে সর্বস্তরের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি ও সাম্য নিশ্চিত করার জন্য বৃহত্তর উৎপাদন-উপাদানের সামাজিকীকরণ ভিন্ন অন্য কোনো পথ ছিল না। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের রাষ্ট্রযন্ত্রও চরম সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করেছিল এবং এরই ফলে বাংলাদেশের বৃহৎ শিল্প ও বৈদেশিক বাণিজ্যের জাতীয়করণ করা হয়। লক্ষণীয় যে এ দেশের অন্যতম খাত– কৃষিখাত, যা থেকে জাতীয় আয়ের প্রায় ৪০ শতাংশ আসে ক্ষুদ্র শিল্প এবং সেবামূলক খাতের একটি বড় অংশ বেসরকারি মালিকানায় রেখে দেওয়া হয়। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক সৃষ্টিশীলতা সীমিত করার জন্য সমাজতন্ত্রের কথা বলা হয়। বৃহত্তর স্বার্থান্বেষী বিশেষ অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর কর্মকাণ্ডকে খর্ব করার জন্য সমাজতন্ত্র কায়েমের কথা বলা হয়। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এই সৎ উদ্দেশ্য সফল হয়নি বিভিন্ন কারণে। ঢালাওভাবে বৃহৎ শিল্পের জাতীয়করণ উৎপাদনশীলতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল এবং জাতীয়করণকৃত শিল্পে দক্ষ শ্রমিকের অভাবে বহু শিল্প প্রতিষ্ঠানই ব্যবস্থাপকদের লুণ্ঠনের ক্ষেত্রে রূপান্তরিত হয়। তবু এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, স্বাধীনতা-উত্তর সময়সীমায় সৃষ্ট শূন্যতায় এ দেশের রাষ্ট্রীয় শিল্পখাত একটি গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছিল।

নব্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশটির অন্যতম প্রয়োজন ছিল এর অর্থনীতির জন্য একটি মধ্যমেয়াদী দিক-দর্শন। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয়। দেশের বরেণ্য অর্থনীতিবিদ, বিশেষজ্ঞবৃন্দ এবং একদল অত্যন্ত মেধাবী ও অঙ্গীকারাবদ্ধ কর্মকর্তা দল এ কমিশনে যোগ দেন। এ সংগঠনকে রাষ্ট্রীয়ভাবে একটি বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয় এবং এ কমিশনের ওপরই দায়িত্ব বর্তায় বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়নের। এটা অত্যন্ত গর্বের বিষয় যে, তাদেরকে দেওয়া সম্মানের প্রতি পূর্ণ মর্যাদা রেখে পরিকল্পনা কমিশন ১৯৭৩ সালেই বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৭৩-৭৮) প্রণয়ন করেন। রাষ্ট্রীয় সংবিধানের মতো এ পরিকল্পনা গ্রন্থটিও ছিল এ দেশের প্রধান অর্থনৈতিক দলিল। এ গ্রন্থে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পরিকল্পিত অর্থনীতির গুরুত্ব শুধু তুলে ধরা হয়নি, বরং এ জাতীয় একটি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য যে ধরনের একটি অঙ্গীকারাবদ্ধ ও নিঃস্বার্থ রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও প্রশাসনযন্ত্রের প্রয়োজন হবে, সেদিকেও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল।

উন্নয়নের অর্থায়নের ক্ষেত্রে যতটা সম্ভব নিজস্ব উদ্যোগ ও উৎসের ওপরই সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়, কিন্তু রাজনৈতিক দিক

থেকে জননন্দিত নয়, এমন সব সংস্কার গ্রহণ করতেও সরকার দ্বিধা করেনি। তৎকালীন অর্থমন্ত্রী দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছিলেন, যেসব দেশ আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল, তাদের কাছ থেকে কোনো রকমের সাহায্য গ্রহণ করা হবে না। একটি স্বনির্ভর ও গতিশীল অর্থনীতি গড়ে তোলাই ছিল রাষ্ট্রযন্ত্রের মূল লক্ষ্য। কৃষিক্ষেত্রে ভূমি-সংস্কার ভিন্ন একটি বলিষ্ঠ সমবায় প্রথা গড়ে তোলার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছিল। কৃষকদের জমির মালিকানা রাষ্ট্র কর্তৃক গ্রহণ না করে কৃষি কাজের ক্ষেত্রে একটি যৌথ সমবায়-পদ্ধতি সূচনা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এ উদ্যোগ আমাদের কৃষি ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনতে পারতো।

তিনি বরাবরই দারিদ্র্যকে চিহ্নিত করে তা বিমোচনের জন্যে কর্মসূচির কথা বলতেন। দারিদ্র্য বিমোচনের উদ্যোগকে তিনি প্রায়ই ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের পর দারিদ্র্য নামক আরেকটি শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে বলতেন।

১৯৭৩ সালে বিজয় দিবসের আগের দিন বেতার ও টেলিভিশনে ১৫ ডিসেম্বরে বলেন–

> "পাকিস্তানী শত্রু আত্মসমর্পণ করেছে। কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে আরও একটি শক্তিশালী শত্রু। আর তা হচ্ছে অভাব, দারিদ্র্য, ক্ষুধা, রোগ, অশিক্ষা, বেকারত্ব ও দুর্নীতি। এই যুদ্ধে জয় সহজ নয়। আমাদের এবারের সংগ্রাম অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের সংগ্রাম। আমি যে সুখী, সমৃদ্ধিশালী, শোষণমুক্ত সমাজের স্বপ্ন দেখেছি, সংগ্রাম করেছি এবং দুঃখ-নির্যাতন বরণ করেছি, সেই বাংলাদেশ এখনও আমার স্বপ্নই রয়ে গেছে। গরীব কৃষক ও শ্রমিকের মুখে যতদিন না হাসি ফুটবে ততদিন আমার মনে শান্তি নেই। এই স্বাধীনতা আমার কাছে প্রকৃত স্বাধীনতা হয়ে উঠবে। যেদিন বাংলাদেশের কৃষক, মজুর ও দুঃখি মানুষের সকল দুঃখের অবসান হবে।"

নিন্দুকদের নিন্দায় তিনি আত্মবিশ্বাস হারাননি। তাঁর দৃঢ় আত্মবিশ্বাস ছিল যে, জনসংখ্যার তুলনায় এদেশের সম্পদ যতই সীমিত থাকুক এবং কৃষি ব্যবস্থায় মান্দাতার আমলের চাষপদ্ধতি বিদ্যমান থাকলেও অসুবিধা নেই। দেশ যখন স্বাধীন হয়েছে, আমাদের মনোবল অটুট রেখে বিশাল এ উর্বর ও পতিত জমিতে আধুনিক কারিগরী প্রযুক্তি প্রয়োগ করে পরিকল্পিত চাষাবাদ ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনয়ন সম্ভব।

ড. অনুপম সেনের 'বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও সমাজ– সামাজিক অর্থনীতির স্বরূপ' গ্রন্থের ৯৪ পৃষ্ঠায় বর্ণনা পাওয়া যায়–

"কারও কারও মতে বাংলাদেশের সম্পদ এত সীমিত যে, তার পক্ষে অর্থনীতি উন্নয়ন একক প্রচেষ্টায় অসম্ভব। এ বক্তব্য যথার্থ নয়। কারণ বাংলাদেশের জমির উর্বরা শক্তি অসাধারণ। মাথাপিছু চাষ যোগ্য জমির পরিমাণ খুব কম নয়। বর্তমানে একর প্রতি উৎপাদন বাড়াবার ব্যবস্থা গ্রহণ করেই আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারি। উপরন্তু এসব জমিকে ফসলি জমিতে রুপান্তরিত করাও সম্ভব। তখন কৃষি পণ্য রপ্তানিকারক দেশ হিসাবে আমরা পরিগণিত হবো এবং কৃষি উদ্বৃত্ত শিল্পে নিয়োগ করে স্বনির্ভর শিল্পায়নের পথে অগ্রসর হতে পারবো।"

অনুপম সেনের 'বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও সমাজ– সামাজিক অর্থনীতির স্বরূপ' গ্রন্থের পৃষ্ঠা নং ৭০-৭১

১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের পর রাষ্ট্র স্বত্বকেই দোষারোপ করা হয়েছিল বাংলাদেশের সর্ববিধ অর্থনৈতিক দূরাবস্থার জন্য। তখন থেকেই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, বণিক সংগঠন, এমনকি কয়েকদিন আগে দেশের প্রধানমন্ত্রীও (১০ই জুলাই ১৯৮৮) ৭২-এর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র নীতিকেই দায়ী করেছেন। শিল্প ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অনগ্রসরতার জন্য কিন্তু এই বক্তব্য যথার্থ বা সত্য নয়। বাংলাদেশ সরকার অর্থ মন্ত্রলায়, অর্থ বিভাগও অর্থনৈতিক উপদেষ্টা উইং থেকে বাংলার অর্থনীতির গতি প্রকৃতি যে চিত্র প্রতি বছর প্রকাশকরা হয তা থেকে দেখা যাচ্ছে– ১৯৭২/৭৩ সালে ২৮৯.৫ কোটি টাকার শিল্প সামগ্রী উৎপাদিত হয়েছিল হয়েছিল ১৯৭৪/৭৫ সালে এই অংকে ৫৪৮১ কোটি টাকায় (৭২/৭৩ এর স্থির কৃত মূল্যে) উন্নীত হয়। অর্থাৎ দু'বছরে উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯৮৫/৮৬ সালে সেটাই বেড়ে দাঁড়ায় ৮২৮.২ কোটি টাকায় (৭২/৭৩-এর স্থিরকৃত মূল্যে) এর থেকে প্রতীয়মান হয়, যেখানে মাত্র দুবছরে (১৯৭২/৭৩ থেকে ১৯৭৪/৭৫) শিল্প উৎপাদন ২৫৮.৬ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছিল সেখানে পরবর্তী দীর্ঘ এগার বছরে সেই বৃদ্ধির পরিমান ছিল মাত্র ২৮০.১ কোটি টাকা। প্রশ্ন আসতে পারে– এই দুই বছরে ১৯৭২/৭৩ থেকে ৭৪/৭৫) শিল্পখাতে উৎপাদন দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেলেও রাষ্ট্রায়ত্ব কারখানা সমুহরে লোকসান হয়তো এই অংকে প্রতিফলিত হয়নি। যে লোকসান অন্য খাত থেকে এনে মেটানো হয়েছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে ১৯৭৩/৭৪, ১৯৭৪/৭৫ ও ১৯৭৫/৭৬ সালে দেশজ উৎপাদ বৃদ্ধির সার্বিক হারও কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদি সব খাতে মিলিয়ে) যথাক্রমে ১২.৬, ৩.৫ ও ৯.৬ শতাংশ মাথা পিছু আয় বৃদ্ধির হারও ছিল সবচেয়ে বেশি। ১৯৭৩/৭৪/৭৫/৭৬ সালে যথাক্রমে ৮.৫ ও ৬.৯ শতাংশ। কিন্তু ১৯৭৬/৭৭/৭৯/৮০ ও ১৯৮০/৮২ সালে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির পরিবর্তে কমে

যায় যথাক্রমে ৩.৭-১.২ ও ১.৫ শতাংশ হ্রাস পেয়ে। ঋণাত্মক হয়ে দাঁড়ায় অর্থাৎ মাথাপিছু আয় পূর্ববর্তী বছর থেকে পূর্বোক্ত হারে কমে আসে।"

কৃষিতে যথাযথ উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে পারলে গ্রামীণ কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়। গ্রামীণ অর্ধশিক্ষিত বেকার জনগোষ্ঠীর কৃষিতে আত্মনিয়োগ করে আত্মনির্ভরশীল হতে পারলে একদিকে বেকারত্ব হ্রাস, অন্যদিকে খাদ্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হয়। কিন্তু শহরাঞ্চলে কতিপয় লোকের কর্মসংস্থান এবং শিল্পকারখানা সম্প্রসারণের অজুহাতে কিছু ধনাঢ্য লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি করলেই দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন হয় না। সামাজিকভাবে শহর ছাড়াও গ্রামীণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে সুপরিকল্পিতভাবে ব্যবস্থা নেওয়াই ছিল বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক দর্শন। বঙ্গবন্ধুর এই অর্থনৈতিক দর্শন বাস্তবায়নের প্রাক্কালেই শুরু হয় দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র। ১৯৭৪ সালের বন্যার সাথে সাথেই দুর্ভিক্ষ শুরু হয়। সে দুর্ভিক্ষে বহু লোক খাদ্যাভাবে মৃত্যুবরণ করে।

"১৯৭৪/৭৫ সালে এ বাংলাদেশে খাদ্য আমদানি পরিমান কম ছিল না। আগেই ব্যাখ্যা করেছি এই দুর্ভিক্ষের অন্যতম প্রধান কারণ উচ্চ মুদ্রাস্ফীতির ফলে গ্রামীণ ভূমিহীন, কৃষক, দরিদ্র কৃষক প্রকৃতির ক্রয়ক্ষমতার অধিক হ্রাস। অবশ্য বিশ্ব ঘাটতির জন্য বাড়তি খাদ্য আমদানি হয়তো তখন বাংলাদেশের পক্ষে সম্ভব হয়নি, যা সম্ভব হয়েছিল ১৯৭৯-৮০ সালের দূর্ভিক্ষের বছর।" [ড. অনুপম সেন, পৃষ্ঠা নং ৭৯]

গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান অপ্রতুল থাকলে তাদের ক্রয়ক্ষমতাও হ্রাস পায়। ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পেলে কি অবস্থা হয় তা উপরোল্লিখিত ড. অনুপম সেনের লিখিত তথ্য থেকে পাওয়া যায়।

আমাদের দারিদ্র্য নিরসনের জন্য দুইটি ভিন্ন ধরনের কার্যক্রম প্রয়োজন। প্রথমত, দীর্ঘমেয়াদি সংস্কার, শিক্ষা পণ্যের আমদানি সংকোচন ও উন্নয়নের উপকাঠামো নির্মাণ। দ্বিতীয়, স্বল্পমেয়াদি কার্যক্রম হিসাবে পল্লির অতি দরিদ্র জন সাধারণের জীবনের কিছু কিছু মৌলিক প্রয়োজনীয়তা সামগ্রী যেমন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, বিশুদ্ধ পানি, প্রাথমিক স্বাস্থ্য বিষয়ক সহায়তা, স্বাস্থ্যসম্মত অনারম্বর বাসস্থান, শান্তি-শৃঙ্খলা ও পল্লি শিল্পে নির্মাণ কার্যে কর্মসংস্থান।

সাবেক প্রধান বিচারপতি এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান-এর লিখিত প্রবন্ধ 'বাজার ও অদৃশ্য হস্ত'–

"অনেকের মতে, উন্নয়শীল দেশসমূহের রাজনীতি, রীতিনীতি, প্রথা ও প্রতিষ্ঠান, বাজার অর্থনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তাই তাদের জন্য ভিন্ন ধরনের তত্ত্ব রয়েছে।"

দেশ ও জাতি ভেদে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ভিন্ন রকমের তত্ত্ব প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা বঙ্গবন্ধু অনেক আগেই উপলব্ধি করেছিলেন। আবহাওয়া, জলবায়ু ষড়ঋতুর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বাংলাদেশের সামগ্রিক অবস্থা বিবেচনা করে ভিন্ন রকমের তত্ত্বই প্রয়োগ করার চিন্তা-ভাবনা করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচনের জন্যে বঙ্গবন্ধু ঃ
দ্বিতীয় বিপ্লবের রাজনৈতিক দর্শন

বাংলাদেশের শতকরা ৮৫ ভাগ জনসংখ্যা প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে কৃষি পেশার সাথে জড়িত থাকলেও জমির একর প্রতি ফলন অত্যন্ত কম হয়। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা, খরা, পোকার আক্রমণ, ভালো বীজের অভাব, সেচের অভাব, অষুধের অভাব, আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির অভাব, কৃষি বিষয়ে অশিক্ষা ইত্যাদি কারণে কৃষি উৎপাদন কম হয়। তাছাড়া এভাবে প্রতি বছর চাষাবাদ করার ফলে মাটির উৎপাদনক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে। এর ওপর রয়েছে অত্যাধিক জনসংখ্যার চাপ। শিক্ষার অভাব ও ধর্মীয় কুসংস্কারের শিকার হয়ে এদেশের মানুষ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে উৎসাহিত নয়। যার ফলে অভাবী দেশের ওপর ঐ অত্যাধিক জনসংখ্যার চাপ পড়ে খাদ্য সমস্যাকে আরও তীব্রতর করে তুলেছে। অপরদিকে জমির উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস, প্রাকৃতিক নানান দুর্যোগ, পোকামাকড়ের আক্রমণ, ব্যাপকহারে খাদ্য চোরাচালান ও গুদামজাতকরণের ফলে খাদ্যশস্যের সরবরাহ হ্রাস পেয়ে খাদ্য-ঘাটতি ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। ফলে প্রতি বছর বাংলাদেশে প্রায় ২৫ লক্ষ টন খাদ্যশস্য ঘাটতি থেকেই যায়।

আমাদের দেশে প্রতি বছর ৩% চক্রবৃদ্ধি হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিল্প-কারখানা ও অন্যান্য কুটির শিল্পের অপ্রতুলতার কারণে কাজের সুযোগ না থাকায় প্রতি বছর এই বাড়তি জনসংখ্যাকে শুধুমাত্র কৃষির ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। কিন্তু কৃষিক্ষেত্রের তুলনায় কৃষিজীবীদের সংখ্যা অধিক হওয়ার ফলে গ্রামবাংলায় বেকারের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। একটি সমীক্ষার মতে, গ্রামবাংলায় প্রায় দু'কোটি লোক বেকারত্বের অভিশাপে জর্জরিত হচ্ছে।

সামন্ততান্ত্রিক বা জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ হলেও এদেশে আধাসামন্তবাদী ব্যবস্থা বিদ্যমান। পাকিস্তান আমলে ভূমিস্বত্বের যৎসামান্য সংস্কার করা হলেও বৃহত্তর মালিকানায় জমি রয়েছে মাত্র ২৩%, অথচ মাত্র ৮% লোকের দখলে রয়েছে ৭৭% জমি। বাকি শতকরা ৬০ ভাগেরও ওপরে ভূমিহীন ক্ষেতমজুর রয়েছে। এই হলো বাংলাদেশের ভূমিস্বত্বের ব্যবস্থা। এর ফলে প্রকৃত কৃষকরা যারা ভূমিহীন (ক্ষেতমজুর ও ভাগচাষী) কৃষক, মালিকানাস্বত্বহীন এই বৃহত্তর কৃষকসমাজ কৃষি কাজে কোনোই উৎসাহ পায় না। এদের রক্ত জল করা শ্রমের বদৌলতে বৃহৎ কৃষক ও জোতদাররা লাভবান হচ্ছে। তারা (কৃষকরা) শোষিত হচ্ছে। সুতরাং এই অসংগতিপূর্ণ ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার ফলে কৃষি উৎপাদন কম হচ্ছে।

বাংলারা গ্রামীণ আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে সৎ নিষ্ঠাবান ও যোগ্য নেতৃত্বের দারুণ অভাব। গ্রামবাংলার অধিকাংশ লোক নিরক্ষর এবং তারা দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থান করছে। গ্রামীণ সমাজ ধনিক (বৃহৎ কৃষক, মহাজন, ফড়িয়া, দালাল) ও দরিদ্র কৃষক-মজদুর এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এই ধনিক শ্রেণী যারা অর্ধশিক্ষিত, কিন্তু গ্রামীণ রাজনীতিতে খুবই ধুরন্ধর ও কুটিল। এরা নিজেদের স্বার্থোদ্ধারের লক্ষ্যে এই বিরাট দরিদ্র শ্রেণীকে নানা প্রকার বিভেদের মধ্যে জড়িয়ে তাদের শোষণ করে চলেছে। সুতরাং এখানে সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে উঠতে পারে না। সামাজিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের নেতৃত্বে এই ধনিকশ্রেণি থেকে আগত ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, মাতবর, মেম্বার, মামলাবাজ, দাঙ্গাবাজ, টাউট বাটপার শ্রেণীর সমাগম এতই প্রকট যে, তাদের কূটকৌশলে বৃহত্তর দরিদ্র কৃষক সমাজ আবদ্ধ হয়ে ধুঁকে ধুঁকে মরছে।

শিক্ষার অভাবই গ্রামীণ অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের অন্যতম মূল কারণ। গ্রামের ধনিকদের মধ্যে অল্পসংখ্যক বাদে কৃষিকাজের সাথে জড়িত লোকেরা একেবারেই নিরক্ষর। ফলে তারা ভূমি তথা কৃষি উন্নয়নের ব্যাপারে একেবারেই অজ্ঞ উদাসীন। সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষার অভাবে আমাদের কৃষি উন্নয়ন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

গ্রামবাংলার কৃষক সাধারণের সঞ্চয়ের ক্ষমতা নেই বললেই চলে। খেয়ে-পরে বাঁচাই এখানে দুষ্কর। ফলে সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজি বা মূলধন সৃষ্টির অভাবে আমাদের কৃষিউন্নয়নের অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে না।

গ্রামবাংলার অর্থনৈতিক মৌলিক কাঠামো ও সামাজিক ব্যবস্থা সামন্তবাদী শোষণভিত্তিক কর্মকাণ্ডের ফলে অত্যন্ত সেকেলে চিন্তাধারায় আচ্ছন্ন। এ ব্যতীত যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার তেমন অগ্রগতি সাধিত হয়নি। এ সব সমস্যা গ্রামীণ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডকে ব্যাহত করছে।

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ধর্মীয় ও বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের ক্রিয়াকলাপের ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক পরিবেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অনেক পথ ও চেতনাকে ব্যাহত করছে। দরিদ্র অজ্ঞ অশিক্ষিত জনসাধারণের ধর্মীয় ও সামাজিক প্রথার সুযোগ গ্রহণ করে আলেম, পুরোহিত ও অন্যান্য শোষক প্রতারক শ্রেণী শোষণ অবিচার অন্যায়কে ধর্মের নামে জায়েজ করে নিজেদের সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধার করে থাকে। এই ধর্মীয় ও শোষকশ্রেণি বৃহত্তর শ্রমজীবী মানুষকে ধর্মান্ধতার বেড়াজালে আবদ্ধ করে অদৃষ্টবাদী, রক্ষণশীল মনোবৃত্তি ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন পরিবেশের জন্ম দিয়েছে। পরিবেশ মানুষের ইহজাগতিক উন্নয়নমূলক কার্যকলাপের উৎসাহ ও উদ্দীপনার ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করছে। দেশের সামগ্রীক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক তৎপরতায় একটা মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে।

এ ব্যতীত রয়েছে, উপর্যুপরি প্রাকৃতিক নৈসর্গিক বিপর্যয়। বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ঝড়, খরা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি কারণে প্রতিবছর আমাদের দেশে বিপুল পরিমাণ শস্যের মারাত্মক ক্ষতি হয়। বাংলার চির অভিশাপ বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে আজো পর্যন্ত তেমন কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। এর ফলে গোটা বাংলার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। পাকিস্তান সরকারের হিংসাত্মক ও আক্রমণাত্মক কার্যকলাপের প্রতিশোধ গ্রহণ কল্পে ভারত ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ করে। সেই ফারাক্কা বাঁধ বর্তমানে বাংলাদেশের গ্রামীণ তথা সামগ্রীক অর্থনীতির ওপর হুমকি সৃষ্টি করেছে। ঐ বাঁধের প্রভাবে পদ্মা-যমুনা ও অন্যান্য নদনদীর জলের প্রবাহ কমে যাওয়ার ফলে নদী ও শাখানদী খালসমূহ ভরাট হয়ে যাচ্ছে, সেচ ব্যবস্থা ব্যাহত হচ্ছে। এ ব্যাপারে বঙ্গবন্ধু সরকার ভারত সরকারের সাথে একটা ফলপ্রসূ স্থায়ী মীমাংসায় উপনীত হয়েছিলেন। কিন্তু ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর থেকে বর্তমান পর্যন্ত বিভিন্ন সরকার নিজেদের নতজানু পররাষ্ট্রনীতির কারণে ভারতের সাথে ফারাক্কা ও অন্যান্য সমস্যার কোনো সমাধান করতে পারেনি। ফলে গোটা অর্থনীতি ও সীমান্ত সমস্যার ক্ষেত্রে মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

উপর্যুক্ত কারণসমূহই হচ্ছে মোটামুটি গ্রামবাংলার অর্থনীতির অব্যবস্থার কারণ। এগুলো বঙ্গবন্ধু হৃদয় দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন বলেই তিনি দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নকেই অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিহ্নিত করেছিলেন। তিনি জানতেন শতকরা ৯০ ভাগ লোকই গ্রামের মধ্যে বসবাস করে এবং বাংলার গোটা অর্থনীতি মূলত কৃষিভিত্তিক। গ্রামবাংলার মেহনতী দরিদ্র সাধারণই বাংলাদেশকে বাঁচিয়ে রেখেছে। অথচ তারাই হচ্ছে

অত্যাচারিত লাঞ্ছিত শোষিত। সুতরাং এই বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নই ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। তিনি জানতেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবী মেহনতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জিত না-হলে বাংলার স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব সংহত ও সুদৃঢ় হবে না।

এ কারণেই বঙ্গবন্ধু গ্রামবাংলার তথা গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিশেষ করে বাংলার প্রাণ কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়ন ঘটিয়ে বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলার লক্ষ্যে 'বাধ্যতামূলক বহুমুখী গ্রাম-সমবায় প্রকল্প' চালু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।

বাধ্যতামূলক বহুমুখি গ্রাম-সমবায় প্রকল্প

বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত গ্রামীণ অর্থনীতিভিত্তিক। কারণ, মোট জনসংখ্যার ৯০ ভাগ লোক গ্রামে বসবাস করে এবং কৃষিকাজের ওপরই তারা প্রায় সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। তাছাড়া মোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ৬৫ ভাগ অর্জিত হয় কৃষি থেকে। বঙ্গবন্ধুর আর্থসামাজিক ব্যবস্থা তাই সংগতকারণেই গ্রামীণ কৃষিকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। কৃষি অর্থনীতির আওতায় খাদ্যে স্বনির্ভরতা অর্জন ও ভূমিসংস্কারের সাধন করাই বঙ্গবন্ধুর আর্থসামাজিক দর্শনের মূল ভিত্তি। আধাসামন্তবাদী ভূমিব্যবস্থার অবসান বা কৃষিক্ষেত্রে শোষণকে উৎপাটিত করার লক্ষ্যে– স্বল্পতম সময়ের মধ্যে কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্যে এবং সকল কর্মক্ষম গ্রামীণ জনতার সমবেত শ্রমশক্তিকে উৎপাদনক্ষেত্রে বিনিয়োজিত করে এবং উৎপাদনোপকরণ সমূহকে পূর্ণভাবে কৃষিকাজে নিয়োজিত করে গ্রামবাংলার দরিদ্র দীনদুখী শোষিত কৃষক জনতার মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু 'বাধ্যতামূলক বহুমুখি গ্রাম-সমবায়' কর্মসূচি গ্রহণ করেন।

বঙ্গবন্ধু অতঃপর দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করলেন– 'কো-অপারেটিভ আমি প্রতিটি গ্রামে করতে চাই। এটা সোজাসুজি বাঙালি কো-অপারেটিভ এবং এটা হবে কম্পালসারী মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ।'

গ্রামীণ কৃষিনির্ভর সমাজ ব্যবস্থা– যেখানে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সৃষ্টি হয়েছে অবিচার, অত্যাচার, বর্ধিত হয়েছে অন্যায় জুলুম শোষণ প্রতারণা, বাসা বেঁধে আছে শঠতা, চালাকি, ফাঁকিবাজি, মতলববাজি। সেই ঘুণে ধরা অভিশপ্ত শোষণভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলে নতুন করে গড়তে হবে। বঙ্গবন্ধু বললেন– 'নিউ সিস্টেম করতে হবে এবং একটা, দুইটা, তিনটা গ্রাম নিয়ে কো-

অপারেটিভ করতে হবে এবং এটা হবে বাধ্যতামূলক কো-অপারেটিভ। এতে কোনো কিন্তু-টিন্তু নেই। এটাকে পুরোপুরি সাকসেসফুল করতে হবে। একাজ, যদি ডিস্ট্রিক্টে একটা কো-অপারেটিভ মানুষ দেখে যে, এই দেশের মানুষের এই উপকার হয়েছে, তাহলে আপনার আর করতে হবে না। মানুষ নিজেরাই এসে বলবে, আমাদের এটা করে দাও। পাঁচ বছরের পরিকল্পনায় ৬৫ হাজার গ্রামে আমরা কো-অপারেটিভ গড়ে তুলবো। আমার বাংলাদেশে শোষণহীন সমাজ গড়তে হবে। সে-জন্যে আমরা নতুন ল্যান্ড সিস্টেমে আসতে যাচ্ছি। সে জন্যে একমাত্র উপায় আছে যে, আমরা যে আজকে মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ করতে যাচ্ছি, এটা যদি গ্রো করতে পারি আস্তে আস্তে এবং এটাকে যদি আমরা ডিস্ট্রিক্ট, থানা কাউন্সিলের মাধ্যমে নিয়ে আসতে পারি, তাহলে দেশের মঙ্গল হতে পারে বলে বিশ্বাস করি।' বঙ্গবন্ধুর এই সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনায় গ্রামকেই প্রশাসনিক ও উৎপাদন ইউনিট হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে শোষণহীন গ্রামবাংলার মাধ্যমে তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে উঠবে।

বঙ্গবন্ধুর এই বৈপ্লবিক চিন্তাধারার তাৎপর্য সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে হলে বাংলার ভূমি, ভূমিবিন্যাস, উৎপাদন পদ্ধতি ও সামাজিক কাঠামোর পটভূমি সম্পর্কে একটু বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে।

বাংলাদেশের ভূমিব্যবস্থার ইতিহাস– নির্মম শোষণ ও বঞ্চনার ইতিহাস। অতীতে এদেশের ওপর দিয়ে রাজতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র, অভিজাততন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র প্রভৃতির ঝড়-ঝাপটা বয়ে গেছে। রাজা রাজড়ারা রাজকোষ ভর্তি করার উপায় হিসেবে ভূমিকে ব্যবহার করেছে। তাদের অর্থলিপ্সা চরিতার্থ করার জন্যে সৃষ্টি হয়েছে সামন্ততন্ত্র ও অভিজাতশ্রেণি। এরাই শোষকদের বা রাজতন্ত্রের ছত্রছায়ায় কৃষকদের শোষণ করেছে। সর্বসান্ত্ব নিঃস্ব রিক্ত সর্বহারা হয়েছে কৃষক সমাজ। মোগল পাঠান আমলেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। শেরশাহ্ ও আকবর বাদশাহ ভূমিজরিপ, ভূমিকর এবং ভূমির শ্রেণীবিন্যাস করলেও তা দরিদ্র কৃষক সমাজকে মুক্তির পথ দেখাতে পারেনি। ১৭৭২ সালের পাঁচশালা, ১৭৭০ সালের ভূমি বন্দোবস্ত আইন পাশ করা হলেও তা ফটকাবাজদের কবলে পড়ে স্ফীত নিলাম ডাকের মূল্য ও লাভ আদায়ের লক্ষ্যে প্রজাদের ওপর সীমাহীন নির্যাতন নিপীড়ন ও অতিমাত্রায় শোষণকার্য চলতে থাকে, যার অনিবার্য পরিণতি হিসেবে ১৭৭৬ সালে মহাদুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয়। ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালীসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে পরবর্তীকালে জনমনে তথা কৃষক সমাজে ব্যাপক বিক্ষোভ ও অসন্তোষ সৃষ্টি হলে তা নিরসনের জন্যে ১৮৮৫ সালে বঙ্গবীয় প্রজাস্বত্ব আইন পাশ হয়। কিন্তু তাতে জমিদারি প্রথার অভিশাপ মোচন আন্দোলন দানা বেঁধে উঠলে ১৯৪০ সালে 'ফ্লাড কমিশনে'র সুপারিশ

মোতাবেক জমিদারি প্রথা বিলোপ ও ভূমির ওপর প্রজাদের অধিকার সংরক্ষণের জন্যে প্রজাসাধারণকে সরাসরি সরকারের অধীনে আনার প্রস্তাব পেশ করা হয়। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ফলে উক্ত সুপারিশ শিকেয় উঠে থাকে। ১৯৫০ সালে পূর্ব পাকিস্তান সরকার জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ ও প্রজাস্বত্ব আইন পাশ করে। কিন্তু আইনের ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে আধাসামন্তবাদী ব্যবস্থাকেই প্রকারান্তরে জিইয়ে রাখা হয়েছে, ফলে কৃষকসাধারণের সুখসমৃদ্ধি বিধান এখানে গৌণ হয়ে পড়েছে। তাদের জীবনের দারিদ্র্য শোষণ উৎপীড়ন দূর হলো না। ভূমি পূর্বের মতোই মুষ্টিমেয় ধনিক জোতদারদের স্বার্থে সবচেয়ে শক্তিশালী দূর্গ হিসেবে পরিগণিত হলো।

বঙ্গবন্ধু সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি কার্যকর করার জন্যে জনবহুল, ক্ষুদ্রায়তন কৃষি অর্থনীতিভিত্তিক বাংলাদেশে দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকদের মুক্তির লক্ষ্যে স্বাধীনতা উত্তরকালে ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা ও বকেয়া খাজনা-ঋণ মওকুফ করে দেন। ভূমিহীন কৃষকদের কৃষিভূমি লাভের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ভূমিমালিকানার সর্বোচ্চ সীমা ১০০ বিঘায় নির্ধারণ করেন। পরে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন– 'সর্বোচ্চ ভূমিমালিকানার সীমা ৫০ বিঘায় নির্ধারণ করার ব্যবস্থা করে সমস্ত কৃষিজমিকে সর্বোচ্চ সীমাকে আরো নিচে নামিয়ে আনবো যাতে আমার দরিদ্র ভূমিহীন কৃষকরাও কিছু জমির মালিকানা পায়।' এ লক্ষ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে বিনা খাজনা ও বিনা সেলামীতে ভূমিহীনদের মধ্যে উদ্বৃত্ত ও সরকারি খাস জমি বন্দোবস্ত দেয়ার ব্যবস্থাও করা হয়।

বাংলাদেশে কৃষিভূমির পরিমাণ ৩ কোটি ৫৩ লক্ষ একর। এর মধ্যে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ২ কোটি ৯১ লক্ষ একর। মোট কৃষকের ৬৫% ভূমিহীন। ২৭% কৃষকের হাতে জমি রয়েছে মোট কৃষিজমির ২৩%। আর বাকি ৮% বৃহৎ কৃষক জোতদারদের হাতে রয়েছে মোট কৃষি জমির ৭৭% ভাগ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের কৃষিজমির সিংহভাগ রয়েছে অকৃষকদের হাতে, আর প্রকৃত কৃষকরা ভূমি থেকে হয়ে আছে বঞ্চিত, ফলে কৃষকদের এক বিরাট অংশ বেকার হয়ে পড়ে আছে।

এই বিপুল জনসমষ্টিকে উৎপাদনের সাথে সরাসরি জড়াতে না পারলে জাতীয় উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি অর্জন করা কোনো প্রকারেই সম্ভব নয়। এই অসম্ভবকে সম্ভব করার দায়িত্ব সর্বপ্রথম গ্রহণ করলেন বঙ্গবন্ধু। ব্যক্তিগত স্বার্থের সাথে সামাজিক সমষ্টিগত স্বার্থকে একত্রিত করে তিনি নবচেতনার বৈপ্লবিক পদক্ষেপ নিলেন গ্রাম সমবায় প্রকল্পের মাধ্যমে। ভূমিব্যবস্থাকে ব্যক্তিমালিকানার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করে অর্থাৎ ব্যক্তিমালিকানাকে সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ না করেও তিনি কৃষিভূমিকে

বাধ্যতামূলক সমবায়ী মালিকানা অর্থাৎ সামাজিক মালিকানায় নিয়ে এসে ঘোষণা করলেন– 'জমি নেবো না। জমি থাকবে। ক্ষেতখামারে কাজ না করলে কেউ জমির উপর থাকতে পারবেন না। সেখানে প্রোডাকশন বাড়াতে হবে। লেট আস স্টার্ট। ওয়ান্স উই আর সাকসেসফুল এবাউট দিস মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি, দেশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করা যাবে।'

প্রচলিত সমবায়ের ভেতর মানুষ মানুষকে শোষণ বঞ্চনা করার যে অলিখিত রীতিনীতি ও পদ্ধতি গড়ে উঠেছে তা সম্যকভাবে উপলব্ধি করে বঙ্গবন্ধু এই শোষণের চোরাপথকে চিরতরে বন্ধ করার ব্যবস্থা করলেন। তিনি বললেন– 'জমির মালিকের জমি থাকবে, কিন্তু তার ফসলের অংশ সবাই পাবে। যে মানুষ কাজ করতে পারে তাকে এই কো-অপারেটিভের সদস্য হতে হবে। এগুলি বহুমুখি কো-অপারেটিভ হবে। পয়সা যাবে তাদের কাছে, টেস্ট রিলিফের টাকা যাবে তাদের কাছে, ওয়ার্কস প্রোগ্রাম যাবে তাদের কাছে। আমি আজকে ঘোষণা করছি, পাঁচ বছরের প্লানে প্রত্যেকটি গ্রামে পাঁচশত থেকে একহাজার ফ্যামিলি পর্যন্ত নিয়ে কম্পালসারী কো-অপারেটিভ হবে। আপনার জমির ফসল আপনি পাবেন, অংশ যাবে কো-অপারেটিভের হাতে, অংশ যাবে গভর্নমেন্টের হাতে।'

'বাধ্যতামূলক বহুমুখি গ্রাম-সমবায় প্রকল্পের' কতিপয় মৌলিক বৈশিষ্ট্য–

পাঁচশত থেকে এক হাজার পরিবার সমন্বয়ে গ্রাম সমবায় গঠন।

এই সব পরিবারের সমস্ত কৃষিজমি সমবায়ের অধীনে ন্যস্তকরণ।

প্রতিটি গ্রাম-সমবায় পরিচালনার জন্যে সমবায় সভ্যদের ভোটে একটি নির্বাচিত পরিষদ গঠন। (প্রত্যেক কর্মক্ষম ভূমিহীন কৃষক-মজদুর, মালিক-কৃষক বাধ্যতামূলক সমবায়ের সভ্য হবে।)

মালিক-কৃষক ও ভূমিহীন কৃষক-মজদুর সমবায়ের কাজের জন্যে নগদ পারিশ্রমিক পাবেন।

সমবায় ক্ষেতখামারে ও অন্যান্যভাবে উৎপাদিত ফসল সমান তিনভাগে ভাগ করে ভূমিমালিক, ভূমিহীন কৃষক-মজদুর বা সমবায় ও সরকারের মধ্যে বিতরণকরণ। (সরকারের প্রাপ্য অংশ স্থানীয় ধর্মগোলায় রাখতে হবে।)

সরকার সমবায়ের কৃষি উৎপাদন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে যাবতীয় উপকরণ বা সাজসরঞ্জাম স্বল্পমূল্যে বা ঋণে বা বিনামূল্যে সমবায়কে প্রদান করবে।

সমবায় সভ্যদের যৌথ চাঁদা বা শেয়ারে গঠিত মূলধনে ও সরকারের মূলধন ও ঋণে প্রতিটি সমবায়ের অধীনে নানা কুটির শিল্প ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে।

সরকার ধর্মগোলায় রক্ষিত সম্পদের মধ্য থেকে একটি অংশ নিয়ে নেবে, বাকি অংশ সমবায়ের নানা দুর্যোগ ও প্রয়োজন মোকাবিলার জন্যে জমা থাকবে।

সরকার গ্রাম-সমবায় এলাকার আইন-শৃঙ্খলা, রাস্তাঘাট, অন্যান্য যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ, সেচ, সার, বীজ, কীটনাশক অষুধ, স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ যাবতীয় উন্নয়নমূলক কাজ করবে।

সমবায় তার সভ্যদের প্রদানকৃত শেয়ার মূলধন ও সরকারের ঋণ বা অংশ গ্রহণের ভিত্তিতে যে কোনো ব্যবসা-বাণিজ্য ও ছোটো ছোটো কল-কারখানা স্বাধীনভাবে পরিচালনা করতে পারবে।

প্রতিটি গ্রাম সমবায় উৎপাদন ও প্রশাসনিক ইউনিটরূপে গড়ে উঠবে।

কয়েকটি গ্রাম সমবায় সমন্বয়ে একটি করে 'আঞ্চলিক সমবায় কার্যালয়' গড়ে উঠতে পারে তবে থানা পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হবে গ্রাম সমবায়সমূহের কেন্দ্রীয় কার্যালয়।

ক. আঞ্চলিক ও কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের কর্মকর্তারা গ্রাম সমবায়ের পরিচালনা পরিষদ সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হবেন। তবে উভয় কার্যালয়ে সরকারের তরফ থেকে একজন ও জাতীয় দলের থেকে একজন প্রতিনিধি সার্বক্ষণিকভাবে পরিদর্শক হিসেবে থাকবেন। তবে এদের ভোটাধিকার থাকবে না।

মূলত প্রতিটি গ্রাম সমবায় স্থানীয়ভাবে 'সমবায় সরকার' হিসেবে পরিগণিত হবে। সমবায়ের যাবতীয় নিরাপত্তা শৃঙ্খলা ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের দায়-দায়িত্ব সমবায় সরকারের ওপর ন্যস্ত থাকবে।

সমবায় তথা বিভিন্ন সমবায়ের মধ্যকার দ্বন্দ্ব-বিবাদ মীমাংসার জন্যে আঞ্চলিক ও কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে 'সমবায় ট্রাইবুনাল' গঠিত হবে।

এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠবে বাংলাদেশের গ্রামীণ আর্থসামাজিক ব্যবস্থার বুনিয়াদ। এর ফলে আধাসামন্তবাদী ভূমি ও আর্থব্যবস্থার শোষণ প্রতারণার অবসান ঘটবে। ভূমিহীন কৃষক মজদুর ও অন্যান্য দরিদ্র জনসাধারণ পাবে তাদে জীবনের সার্বিক নিরাপত্তা।

উপর্যুক্ত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজের সকল মানুষের মধ্যে জাগ্রত হবে ভ্রাতৃত্ববোধ ও সহমর্মিতাবোধ। ভূমিহীন কৃষক মজদুর ও ক্ষুদে কৃষকরা এ ব্যবস্থায় উৎপাদন কার্যে নিঃসন্দেহে বিপুলভাবে উৎসাহিত হবে। জমিতে সামাজীকরণ চাষাবাদের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। কেননা, বিক্ষিপ্তভাবে টুকরা জমিতে ধরা যাক যেখানে লাঙল লাগে দশখানা, সেখানে সামাজীকৃত বিরাট খামারে ঐ দশখানা লাঙলের বেশি লাগবে না। এব্যতীত বিরাট খামারে বৈজ্ঞানিক বা যান্ত্রিক চাষাবাদের সুযোগ সৃষ্টি হবে। ফলে সব মিলিয়ে বিরাট বিরাট খামারভিত্তিক

চাষাবাদের কারণে এবং বিরাট শ্রমশক্তির যৌথ প্রচেষ্টায় উৎপাদিত হবে বিপুল সম্পদ।

এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু বললেন– 'আমার দেশের এক একর জমিতে যে ফসল হয় জাপানের এক একর জমিতে তার তিনগুণ বেশি ফসল হয়। কিন্তু আমার জমি দুনিয়ার সেরা জমি, আমি কেন সেই জমিতে দ্বিগুণ ফসল ফলাতে পারবো না?' এ জন্যেই তিনি বাধ্যতামূলক বহুমুখি গ্রাম-সমবায় আন্দোলনের ডাক দিলেন। সূচনা করলেন গ্রামীণ অর্থব্যবস্থার ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক কার্যক্রম, উৎপাদন বৃদ্ধির বিপ্লব। এ ব্যতীত গ্রামের শিক্ষা, গ্রামের স্বাস্থ্য, গ্রামের বিচার, গ্রামের আইন শৃঙ্খলা, গ্রামের বাসস্থান, অর্থাৎ গোটা গ্রামীণ আর্থসামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ সবকিছুই থাকবে গ্রাম সমবায়ের হাতে। এই ব্যবস্থা বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে গ্রামীণ জীবনের কায়েমী স্বার্থের দুর্গ মাতবর-মোড়ল-মেম্বার-চেয়ারম্যান-জোতদার-মহাজন-সুদখোর-ফড়িয়া-দালাল ও ধর্মীয় টাউট-বাটপারদের রাজত্বের অবসান ঘটবে। এতদিনকার আর্থিক ও সামাজিক দিক থেকে অবহেলিত লাঞ্ছিত শোষিত দরিদ্র শ্রমজীবী ব্যাপক জনগোষ্ঠীর নেতৃত্বে নতুন সাম্যভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে এবং একটি সচ্ছল সুখী সমৃদ্ধশালী গ্রামীণ জীবনব্যবস্থায় নবদিগন্তের সূত্রপাত ঘটবে এবং প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠিত হবে– এ বিষয়ে সন্দেহের কোনোই অবকাশ নেই।

গ্রাম-সমবায়ের উক্ত ধারা তথা উৎপাদনের বিপ্লব অবিরামগতিতে চলতে থাকলে এমন একদিন আসবে যখন জমির মালিকানাস্বত্বের প্রতি কারো লোভ-লালসা থাকবে না। কারণ, একজন মানুষের জীবনে যা কিছু প্রয়োজন তা-ই যদি অনায়াসে সে পেয়ে যায় তাহলে তার মালিকানাস্বত্বাধিকার তারই কাছে হবে গৌণ। এ পর্যায়ে সমাজ অগ্রসর হওয়ার পরই সরকার সমস্ত ভূমিব্যবস্থা বা উৎপাদনের যাবতীয় উপায়সমূহকে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নিয়ে আসবে।

বঙ্গবন্ধুর কাছে সাংবাদিকরা জানতে চেয়েছিল– 'গ্রামীণ বৃহৎ ধনিক কৃষক জোতদার পরিবার থেকেই মূলত বৃহৎ ছোট-বড় লাভজনক শিল্প কারখানার মালিক, বণিক, সামরিক-বেসামরিক আমলা, রাজনীতিক আইনজীবী তথা তথাকথিত সম্ভ্রান্ত শ্রেণির আগমন ঘটেছে, যারা সম্পদে বৈভবে ও যাবতীয় ক্ষমতায় বলিয়ান, যারা বর্তমানে ধনতান্ত্রিক শোষণবাদী সমাজ কাঠামোকে জিইয়ে রেখেছে, তারা তো নিশ্চয়ই বসে থাকবে না। এদের সম্পর্কে আপনি কি কিছু চিন্তাভাবনা করছেন?

বঙ্গবন্ধুর জবাব– 'আমি বিশ্বাস করি, তারা আমাকে বুঝবেন। তাদের বুঝবার সুযোগ দিয়েছি। তাদের মেন্টালিটি বদলাবার সুযোগ দিয়েছি। সেই সুযোগ তারা

যদি সদ্ব্যবহার না করে তাহলে তাদেরকে রাজনৈতিকভাবে উচ্ছেদ করার ব্যবস্থা রেখেছি। তবে আমি বলপ্রয়োগের নীতিতে বিশ্বাস করি না। তারাও এদেশের, এ সমাজের, আমার বাংলার মানুষের বাবা-নানা-আত্মীয়-ভাই-ব্রাদার। তাদের সামান্য ত্যাগের বিনিময়ে যদি বাংলার দুখী মানুষ দু'বেলা পেটপুরে খেতে পায়, বস্ত্র পায়, আশ্রয় পায়, কাজ পায়, অন্যান্য কিছু কিছু পায় তাহলে এর চেয়ে বড় আনন্দের আর কী আছে। তবু যদি এরা তা না করে, ষড়যন্ত্র করে এই প্রোগ্রাম বানচাল করতে চেষ্টা করে, তাহলে আমাকে দুঃজনক বিকল্প পথ অবশ্যই নিতে হবে। ...মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের দিয়ে রক্ষিবাহিনী সৃষ্টি করেছি। এরপর মুক্তিযোদ্ধাদের ডেকে বলবো, আসো, তোমরা দেশ স্বাধীন করেছো, তোমরা দেশ চালাও, সমাজতন্ত্র করো। ...গত তিন বছরে আমার কয়েক হাজার মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা করা হয়েছে, জেলে পুরা হয়েছে, চাকরিচ্যুত করা হয়েছে, হাইজ্যাকার বানানো হয়েছে, অপমানিত করা হয়েছে, এ সবকিছু করা হয়েছে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি ও সাম্রাজ্যবাদের ইংগিতে, তাদের এজেন্টদের দিয়ে, যারা সমাজের বিভিন্ন স্থানে ছদ্মবেশ ধারণ করে আছে। ...আমি যদি এই মুক্তিযোদ্ধাদের আবার বলি, তোমরা তোমাদের অধিকার আদায় করে নাও, বদমায়েশদের শায়েস্তা করো তাহলে দেখবে, বিপ্লব ঘটে গেছে, ঐ চক্র খড়কুটোর মতো ভেসে যাচ্ছে।'

গ্রাম সমবায়ের কর্মসূচি বাস্তবায়িত হলে কী কী ফল অর্জিত হতে পারতো বা পারে সে বিষয়ে পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

১৯৭৫ সালের ২১ জুলাই বঙ্গভবনে নব নিযুক্ত জেলা গভর্নরদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কৃষদের জন্য গভর্নরদের দায়িত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু উল্লেখ করেন–

> "ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কের জন্য পাম্প পেলাম না, এটা পেলাম না– এসব বলে বসে না থেকে জনগণকে মবিলাইজ করুন যেখানে খাল কাটলে পানি হবে সেখানে সেচের পানি দিন। সেই পানি দিয়ে ফসল ফলান। মবিলাইজ দি পিপল। পাম্প যদি পাওয়া যায় ভালো। যদি না পাওয়া যায় তবে স্বনির্ভর হন। বাধ বেধে পানি আটকান। সেই পানি দিয়ে ফসল ফলান। আমাদের দেশে আগে কি পাম্প ছিল? দরকার কুয়া কেটে পানি আনুন। আমাদের পাঁচ হাত, সাত হাত, আট হাত কুয়া কাটলেই পানি উঠে। সেখানে অসুবিধা কি আছে– আর এখন থেকে সে সমস্ত সার থানায় যাবে। তা যেন রেগুলারলি গরীব দুঃখীরা পায়। খবর পেলাম ঠাকুর গাঁয়ে কোল্ড স্টোরেজ করা হয়েছে। এক বছর আগে সেটা করা হয়েছে। কিন্তু পাওয়ার নাই। খবর নিয়ে জানলাম পাওয়ার পেতে এক বছর লাগবে। কারণ খাম্বা নেই। খাম্বা নাকি বিদেশ থেকে

আনতে হবে। মিনিস্টার সাহেবকে বললাম, খাম্বা-টাম্বা আমি বুঝি না। বাশ তো আছে। এখানে দাঁড়াও। খাম্বা কাটো, দা লাগাও। দেড় মাস দুই মাসের মধ্যে কাজ হয়ে যাবে। এটা লাগাও। কি করে লাগাবে সেটা বুঝি-টুজি না। দিল লেগে গেল। কিন্তু আমার কাছে যদি না আসতো এক বছরের আগে খাম্বা পেত না। খাম্বা কোত্থেকে আসে? পাওয়ার গেল। আলু রাখলো। আলু রাখার জায়গা নেই। এই মেন্টালিটি কেন হয়? খাম্বা বাংলাদেশের গাছে গাছে হয়। আমি প্রতিটি থানায় পাওয়ার দিতে চাই।"

এমন আন্তরিকতা দিয়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া যে, "প্রতি থানায় পাওয়ার বা বিদ্যুৎ দিতে চাই"– এটা একমাত্র বঙ্গবন্ধুর পক্ষেই সম্ভব ছিল। আর কারও পক্ষে কখনো সম্ভব ছিল না। এদেশে অন্য যে সব রাজনীতিবিদ জনগণের জন্য যত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এবং বর্তমানে দিয়ে থাকে তার সবই শুধুমাত্র ভোটের সময়। তারপর সব প্রতিশ্রুতি হারিয়ে যায় দুর্নীতি আর নিজের পকেট ভারী করার মধ্যে।

পঁচাত্তর পরবর্তী সরকারগুলো বঙ্গবন্ধুর এই নীতিকে নানা অপব্যাখ্যার মাধ্যমে মানুষকে ভুল বুঝিয়ে তা বাদ দিয়ে অন্য কৌশল অবলম্বন শুরু করলেন। কিছু ইসলামের দোহাই দিয়ে, কিছু গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে। তাদের অসম বণ্টন ব্যবস্থা, সমাজের ধনী, জোতদার এবং পাকিস্তানি শিল্পপতিদের যারা এই দেশে সম্পদ রেখেছিলেন তা বিক্রি করে যাবার সুযোগ করে দেবার জন্য যা যা দরকার তাই করেছে। এই অসম বণ্টন ব্যবস্থায় দীর্ঘ কয়েক দশকেও আনুপাতিক হারে ভূমিহীনের সংখ্যা হ্রাস হলো না, দারিদ্র্য বিমোচন হলো না।

কিন্তু দীর্ঘ চল্লিশ বছরে গ্রামের ভূমিহীনদের সংখ্যা আজও হ্রাস হয়নি, দারিদ্র্য বিমোচন হয়নি, জীবন মানের উন্নতি হয়নি। হয়েছে শহরের মানুষের অর্থ-বিত্তের বৃদ্ধি। বিলাসিতা বৃদ্ধি পেয়েছে, অপচয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। সোজাকথা দৃশ্যত ধন-দৌলত, অর্থ-বিত্ত চোখে পড়লেও স্থায়ী ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়নি। জনসংখ্যানুযায়ী শ্রম বাজারের ক্ষেত্রও প্রসারিত হয়নি। সুতরাং শহরের কতিপয় ধনী লোকের আয় এবং গ্রামের বিদেশ থেকে আসা অস্থায়ী রেমিটেন্স অর্থ যা স্থায়ী নয় তা দিয়ে উপার্জিত আয়কে জনসংখ্যার হিসাবে অনুপাত করলে মাথা পিছু আয় বৃদ্ধি পেতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দারিদ্র্য বিমোচন বা সামগ্রিক জনগণের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়। তা রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ এবং সচেতন নাগরিকগণ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন।

কথাগুলি বারবার ফিরে আসে যে একটি রাষ্ট্রের বৃহৎ জনগোষ্ঠী বা কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী বাস করে গ্রামে। বিশেষ করে তখনকার পূর্ব বাংলা, পূর্বপাকিস্তান, শেষে

স্বাধীন বাংলাদেশ। এর বেশির ভাগ মানুষ বা জনগণ গ্রামে বাস করে। শতকরা হার দিয়ে হিসাব ঠিক রাখা যাবে না। কারণ প্রতিনিয়ত মানুষ আসা যাওয়া করছে। গ্রামে আসার সংখ্যা কম; বরং গ্রাম থেকে শহরে যাওয়ার সংখ্যাই বেশি। তবে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ গ্রামবাংলার অধিবাসী। এরাই যুগে যুগে পরাধীনতার আমলে নির্যাতিত, নিষ্পেষিত হয়েছে। এরাই স্বাধীনতা যুদ্ধে অবদান রেখেছে বেশি। এদের ভাগ্য বদলের জন্য বঙ্গবন্ধু ও তার রাজনৈতিক সংগঠন আওয়ামী লীগ সংগ্রাম করেছে।

সুতরাং গ্রামাঞ্চলের জনগোষ্ঠীর ন্যূনতম দারিদ্র্য হ্রাস করা যায় বিশেষ করে ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে কর্মক্ষম কৃষককে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে, জমির বণ্টন ব্যবস্থায় ভূমিহীনদের মাধ্যমে জমি চাষ করাতে পারলে।

এদিকে ভূমির ব্যবহার অন্যদিকে কর্মক্ষম লোকের কাজের ব্যবস্থা করা। একদিকে অনাবাদি পতিত খাস জমি ও ব্যক্তিমালিকানাধীন পতিত জমি চাষের আওতায় আনা অন্যদিকে বিপুল সংখ্যক গ্রামীণ কৃষি শ্রমিকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। সরল অঙ্কের মতো সরল সোজা কথা বা সোজা ব্যবস্থাই সবারই বোধগম্য। এর মধ্যে অর্থনীতিবিদ, পণ্ডিত, রাজনীতিবিদ, ভূমি বিশেষজ্ঞ– তাদের মতামত, গবেষণা ও সিদ্ধান্ত হয়তো আরও সুদূর প্রসারি হবে।

রিজওয়ানুল ইসলামের 'উন্নয়নের অর্থনীতি' গ্রন্থের ১০৩-৪ নং পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন–

"কৃষির উন্নতির মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাস করা অনুন্নত দেশসমূহে সাধারণভাবে গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্যের হার বেশি দেখা যায়। বিশ্বব্যাংকের এক হিসাব অনুযায়ী মাথা পিছু দৈনিক ১০৮ ডলার দারিদ্র্য রেখা ধরলে উন্নয়নশীল দেশের দারিদ্র্য শতকরা ৭৫ ভাগই গ্রামে বাস করে। যদিও তাদের জনসংখ্যার মাত্র ৫৮% গ্রামের অধিবাসী (World Bank report 2007)। বিশ্বব্যাংকের এই প্রতিবেদন অনুযায়ী সার্বিক দারিদ্র্য হ্রাসে গ্রামীণ দারিদ্র্য হ্রাসের অবদান অন্তত ৪৫% থেকে ৫৫%। আর চীনকে বাদ দিলে এই সংখ্যাটি উঠে যায় ৮০%। এর অর্থ এই যে, গ্রামীণ দারিদ্র্য দ্রুত হ্রাস করতে পারলে সার্বিক দারিদ্র্য দ্রুত হ্রাস পায়।"

আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত যে, গ্রামের মানুষের দারিদ্র্য বিমোচন করতে পারলে সার্বিকভাবে রাষ্ট্রীয় দারিদ্র্য দ্রুত হ্রাস করা সম্ভব। জনসংখ্যার বৃহত্তর একটি অংশ গ্রামাঞ্চলে বাস করে। শহরে শিক্ষিত মানুষের কর্মসংস্থান করার চেয়ে গ্রমীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান এবং কাজের ক্ষেত্র সৃষ্টি করা সহজেই সম্ভব। এ চিন্তা থেকেই বঙ্গবন্ধু গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান হ্রাস করতে প্রথম

পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এ পদক্ষেপের কর্মসূচি হিসাবে ভূমি সংস্কার করে ভূমিহীনদের মাঝে চাষযোগ্য পতিত ও খাসজমি বিতরণ করে গ্রামীণ দরিদ্র মানুষদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার কৌশল গ্রহণ করেন। এর ফলে কিছুটা হলেও ধনী-দরিদ্রের মাঝে সমতা আনয়ন করা সম্ভব।

দ্বিতীয় পদক্ষেপ হিসাবে ১৯৭৫ সালে বেসরকারি বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করে শিল্পায়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সৃষ্টির চেষ্টা শুরু করেছিলেন। তিনি প্রকৃতপক্ষে যে কাজটি করতে চেয়েছিলেন তাহলো, সামগ্রিকভাবে একটি দেশের দারিদ্র্য বিমোচন করা, বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো জনবহুল কৃষি প্রধান দেশে যেখানে কৃষি কার্যের মাধ্যমে মানুষেরা জীবিকা নির্বাহ করে। নিঃস্ব চাষী যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ যা সত্তরের দশকে এখনকার চেয়ে অনেক বেশি মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল ছিলেন। কৃষি কাজে অংশগ্রহণের কথা এখনকার চেয়ে বেশি ছিল। প্রায় ৯০% মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল ছিল। জাতীয় আয়ের সূচকে কৃষির অবদান বেশি ছিল।

সুতরাং এদেশের জলবায়ু আবহাওয়া প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর নির্ভর করে। প্রথমেই প্রায় ৯০% জনগণের সম্পৃক্ততার ক্ষেত্রটিকে ঢেলে সাজিয়ে একদিকে আধুনিক কারিগরী প্রযুক্তি ব্যবহার করে, কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধি করে, ঘাটতি পূরণ করে, উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্র আয় করা। অন্যদিকে সংস্কারের মাধ্যমে খামার পদ্ধতির মাধ্যমে ভূমিহীন, দরিদ্র কৃষকদের কৃষিতে উৎপাদনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের জমি প্রদান করে আধুনিক কৃষি উৎপাদনে সক্ষম করতে কারিগরি ও আধুনিক চাষ পদ্ধতির প্রশিক্ষণ পদান করে ধীরে ধীরে কৌশলে একটি নীতিমালার মাধ্যমে গ্রামের ভূমিহীনদের সংখ্যা হ্রাস করা। বেকার কৃষি শ্রমিকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। যাতে করে গ্রামীণ জনপদের মানুষের ক্রয়-ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ও অর্থনীতিবিদ ড. ফরাসউদ্দিন-এর সম্পাদিত গ্রন্থ 'ধন্য সেই পুরুষ, বঙ্গবন্ধুর বাংলার– কৃষি ও কৃষকের দেশ, বেতার বাংলা সংকলন জুন ২০০০'

> "যেখানে ১৯৬৮-৬৯ সালের ১১ হাজার শক্তি চালিত পাম্পের স্থলে ১৯৭৪-৭৫ সাল এসে দাঁড়ায় এই সংখ্যা ৩৬ হাজারে। এর ফলে সেচের আওতায় জমির পরিমান এক তৃতীয়াংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৬ লক্ষ একরে উন্নীত হয়। বিশ্ব বাজারে রাসায়নিক সারের ব্যাপক মূল্য বৃদ্ধির অভিশাপ থেকে বাংলার কৃষককে ভর্তুকির মাধ্যমে রক্ষা করণ। ১৯৭২ সালে ইউরিয়া, পটাশ, টি.এস.পি, সারের মন প্রতি মূল্য ছিল যথাক্রমে ২০ টাকা, ১৫ টাকা ও ১০ টাকা।

> গঙ্গা নদীর প্রবাহ থেকে অধিক প্রাপ্তি, সেচ ব্যবস্থার প্রসার, উন্নত বীজ, সার ও কীটনাশক ব্যবহার, অতিরিক্ত খাস জমি প্রাপ্তি এবং মূল্য সমর্থন মূলক সচেতন ও কৃষক দরদী নীতির ফলে কৃষির ক্ষেত্রে অগ্রগতি ধারা সূচিত হয়েছিল। তারই ফলে আজ কৃষির ক্ষেত্রে শক্তিশালী ধারা সৃষ্টি হয়েছে।"

অপ্রিয় হলেও সত্যি কথা গ্রামের কর্মক্ষম মানুষ জীবিকার সন্ধানে গ্রাম ছেড়ে ঢাকা শহরে আসা শুরু করেছে। গ্রামে পর্যাপ্ত কাজ না থাকায় দলে দলে শহরের দিকে আসছে এখানে এসে পেশা পরিবর্তন করে রিক্সা, ভ্যান, ঠেলাগাড়ি এবং নির্মাণ শ্রমিকের মতো পেশায় তারা জড়িত হচ্ছে। এতে করে শহরে জনসংখ্যার চাপ বাড়ছে, বাসস্থানের অভাবে ক্রমাগত বস্তি সৃষ্টি হচ্ছে। এই বস্তিগুলিত সকল অপকর্মের তীর্থস্থানে পরিণত হচ্ছে। অথচ গ্রামের বেকার জনসাধারণের পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারলে গ্রামের মানুষ গ্রামেই থেকে যেতো। এতে করে আইন-শৃঙ্খলার উন্নতি হতো এবং গ্রামের মানুষের দারিদ্র্য হ্রাস পেতো।

এই সোজা সরল কথাটি বুঝতে অর্থনীতিবিদ হতে হবে না, দক্ষ রাজনীতিবিদও হতে হবে না। সচেতন একজন নিরক্ষর লোকেরও বুঝতে অসুবিধা হয় না। বঙ্গবন্ধু মৃত্যুর পর (১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্টের পর) সরকারগুলি তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পদক্ষেপ হিসাবে কৃষি উন্নয়ন ছিল গৌণ। কৃষকদের জন্য ভূমি সংস্কার ও বণ্টন পদ্ধতি যথাযথভাবে না হওয়ায় একদিকে ধনীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে কম অন্য দিকে দারিদ্র্য ও ভূমিহীনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে বেশি।

এখনকার মতো গতানুগতিক কৃষিনীতি বাস্তবায়নে যা পরিলক্ষিত হচ্ছে তাতে করে অনেক জোতদারের জমি পতিত পড়ে থাকে। গ্রামে অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি আছেন। তাদের গ্রামে যথেষ্ট ফসলি জমি থাকা সত্ত্বেও তারা ঢাকা শহরে অভিজাত এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। বংশের ওয়ারিসসূত্রে পাওয়া জমি পতিত পড়ে আছে। বিশেষ করে সিলেট অঞ্চলের লন্ডনে বসবাসরত অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তির জমি পতিত পড়ে রয়েছে। সংবাদপত্র, মিডিয়ার তথ্য থেকে এসব জানা যায়। এভাবে শত শত একর জমি পতিত পড়ে আছে। অন্যদিকে দিন দিন ভূমিহীন মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বঙ্গবন্ধুর ১৯৭৫-সালে যৌথ খামার পদ্ধতি, কৌশল প্রয়োগ থাকলে, বাস্তবায়ন করতে পারলে আর যাই হোক দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর গ্রামে বসবাসকারী মানুষের দারিদ্র্য হ্রাস পেতো। গ্রামে পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি হতো। এভাবে ভূমিহীনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেত না। দলে দলে শহরের দিকে ছুটে আসতো না। বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য বিদেশ থেকে আমদানি করতে গিয়ে শত শত কোটি টাকা

বিদেশীদের হাতে দেওয়ার প্রয়োজন পড়তো না। বরং খাদ্য-শস্য দেশের চাহিদা মিটিয়ে রপ্তানি করা সম্ভব হতো। পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি হতো। আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ হতো। প্রচুর ফসল উৎপাদন হতো।

এতে করে আর যাই হোক, গ্রামীণ জনপদে দেশের শতকরা ৮০ জন মানুষের মাঝে আজকের মতো হাহাকার থাকতো না। যেহেতু পরিকল্পনাটি দীর্ঘমেয়াদি ছিল, সেহেতু বাস্তবায়িত হবার সম্ভাবনা ছিল বেশি। কারণ, তখন এখকার চাইতে তথ্যপ্রবাহ উন্নত ছিল না। অর্ধশিক্ষিত নিরক্ষর মানুষের বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ছিল না। ঢাকা শহরে আসার যোগাযোগ ব্যবস্থাও উন্নত ছিল না। তখন পর্যন্ত গ্রাম বাংলার মানুষ কৃষিখাতে নিয়োজিত ছিল এখনকার চাইতে বেশি।

হয়তো বা বাস্তবে কাজ করতে গিয়ে ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করা যেত আরও। অন্যান্য পদ্ধতি গ্রহণ করা যেত। যেহেতু গবেষকদের, বিশেষজ্ঞদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, তারাও স্ব-স্ব ক্ষেত্রে গবেষণা করে নতুন নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে পারতেন।

এভাবে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হলে কৃষকদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের সুব্যবস্থা করা। উনার প্রাথমিক ভাবনাটাই যথাযথ। জীবনের দীর্ঘদিনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা থেকে উপলব্ধি করেছেন যে, শুধুমাত্র শহরে বসবাসকারী কিছু শিক্ষিত লোকের সুবিধাদি চিন্তা করে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি তথা তাদের পারিবারিক জীবনমানের উন্নতি ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এনে দিলেই রাষ্ট্রের দারিদ্র্য বিমোচন হয় না।

এখনকার প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে তৎকালীন সময়ের বিচারে এই ধরনের পদক্ষেপ, অর্থ বরাদ্দ এবং বাস্তবায়নের জন্য জোর তৎপরতাই প্রমাণ করে যে, তিনি এদেশের কৃষক এবং ভূমিহীনদের জন্য এবং তাদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে জীবনমানের উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। দলীয় আদর্শ ও উদ্দেশ্য এবং ব্যক্তিগত ভাবনা স্বপ্নের মিশেল ঘটিয়ে এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য নিরসন এবং ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথে গোটা জাতিকে অংশগ্রহণ করানোর লক্ষ্যে সংগ্রাম করেছেন।

কৃষির উন্নতির জন্যে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের বিকল্প নেই তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। কৃষি গবেষণার ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ ছিল ওনার। কৃষি গবেষণা ছাড়া যে কৃষির উন্নতি সম্ভব নয় বঙ্গবন্ধু তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে এদেশে কৃষির গবেষণাধর্মী কাজ পরিচালনার জন্য তেমন কোনো সমন্বিত উদ্যোগ ছিল না। তিনিই ১৯৭৩ সালে প্রথম কৃষি গবেষণা কাউন্সিল গঠন করেন।

সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশটিতে শত সমস্যা থাকা সত্ত্বেও কারিগরি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে অধিক ফসল ফলানোর জন্যই তিনি কৃষি বিজ্ঞানী সৃষ্টির লক্ষ্যে এবং তাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মেধার বিকাশ ঘটিয়ে কিভাবে কৃষির এবং কৃষকদের উন্নতি করা যায়, সেজন্যই তিনি সর্বদা ভাবতেন।

গ্রামীণ জনসাধারণের জীবনমানের উন্নয়নের জন্য সারা জীবন সংগ্রাম করেছেন, কাজ করেছেন বঙ্গবন্ধু। আজ যখন ক্ষমতায় থেকে দায়িত্ব নিয়েছেন তখনও ভুলে যাননি যে, এদেশের বঞ্চিত অবহেলিত গ্রাম-বাংলার কৃষকদের কিভাবে দারিদ্র্য বিমোচন করা যায়।

অধ্যাপক আবদুল মান্নানের 'গ্রামীণ দরিদ্র' গ্রন্থের ২০ পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়–

"তিনি পথ দেখিয়েছেন সমবায়ের মাধ্যমে গ্রামীণ দারিদ্র্য হ্রাসের। সমবায়ের উদ্যোগের কথা তিনি গুরুত্ব সহ উল্লেখ করেন এইভাবে "বাংলাদেশে ক্ষুদ্র কৃষকের সংখ্যাই বেশি। নিজেদের মধ্যে ঐক্য, সংহতি ও সহযোগিতা ব্যতিত এসব কৃষক প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকতে পারে না। উপরন্তু আধুনিক চাষ পদ্ধতি প্রয়োগ কৃষি ঋণ প্রাপ্তি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সম্পদের সুষম বন্টনের জন্যে সমবায়িক উদ্যোগের বিকল্প নেই। সমবায়িক উদ্যোগের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করা যেতে পারে এবং অন্যদিকে সম্পদের কিছুটা সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা যেতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশের গ্রাম এলাকায় মানুষের শিক্ষা ও সচেতনতার অভাব, রক্ষণশীলতা, প্রতিকুল সামাজিক কাঠামো, প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাব, দূর্বল অবকাঠামো ইত্যাদি কারণে গ্রাম এলাকায় সমবায় কর্মকাণ্ডের বিকাশ ঘটেনি। উপরন্তু রয়েছে উদ্যম, সদিচ্ছা ও নেতৃত্বের অভাব। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সমবায় যথেষ্ট সফলতা লাভ করেছে।"

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এদেশের কৃষকসমাজকে যে, হৃদয় দিয়ে ভালোবাসতেন এবং তাদের জীবন-মানের পরিবর্তনের কথা সর্বদাই ভাবতেন। এদেশের দরিদ্র মানুষ বিশেষ করে নিরীহ কৃষক শ্রমিকদের যে কতটুকু ভালোবাসতেন এবং তাদেরকে সৎ ও ন্যায়বান বলে ভাবতেন তা ওনার বক্তৃতায় প্রতিফলিত হয়।

১৯৭৫ সালে এক জনসভায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেই ফেললেন, "করাপশান আমার বাংলার কৃষক করে না। করাপশান কোনো শ্রমিক করে না, কোনো ভূমিহীন করে না। করে আমাদের মত শিক্ষিত সচেতন লোকজন।"

এ কথার মাধ্যমে বোঝা যায় বঙ্গবন্ধু কৃষক ও দরিদ্র জনগণকে কতটা দরদ

দিয়ে ভালোবাসতেন এবং সত্য বলতে তিনি কখনোই পিছ পা হতেন না, তা যদি নিজের উপরও পড়ে।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কাল রাত্রিতে দেশি-বিদেশি চক্রান্তে বিপথগামী কিছু সেনাবাহিনীর হাতে সপরিবারে বঙ্গবন্ধু শহীদ হন। ১৫ আগস্ট শুধু তিনি এবং তাঁর পরিবারই শহীদ হননি, হত্যা করা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের মূল দর্শনকে। হত্য করা হয়েছিল বাঙালির দীর্ঘদিনের সংগ্রামের আবেদনকে। ভারতবর্ষের এই নদীমাতৃক বঙ্গাঞ্চলের ভাষা, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকে সমূলে উৎপাটিত করতে চেয়েছিল ঘাতকরা। এই সংগ্রামী শহীদ মহামানবের তরে শ্রদ্ধাঞ্জলি হিসাবে কবি ও দার্শনিক আল্লামা ইকবালের কবিতার ভাষায় আমরাও উচ্চকিত কণ্ঠে বলি–

"আন শহিদানে-মুহব্বতে রা-ইমাম
(জীবনদানকারী শহীদের তুমি ইমাম।)

.....